॥ কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

১৯৫১

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতি-বক্তৃতা

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

অমৃতের পুত্রগণ, যারা দিব্যধামে আছ, শোনো। জ্যোতির্ময় মহান
রুষকে আমি জেনেছি।
নি সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপারে বিরাজমান।

ন তত্রো সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

থানে সূর্য দীপ্তি পায় না, না বা চন্দ্রতারা। বিদ্যুৎও সেখানে ম্লান।
র অগ্নিই বা কোথায়!
ন প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান। তাঁর আলোতেই সমস্ত বিভাসিত।

॥ ভূমিকা ॥

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ। যিনি দেখেন জানেন প্রকাশ করেন তিনিই কবি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছেন, জেনেছেন, প্রকাশ করেছেন। তিনি সর্বদর্শী, সর্বানন্দী, সর্বানুভূ।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তত্ত্বের দিক থেকে যেমন গভীর, কাব্যের দিক থেকে তেমনি সুন্দর। তত্ত্বের তাৎপর্য না বুঝি কাব্যের আনন্দটুকু আহরণ করি। তত্ত্বের অর্থোপলব্ধিতে সমাহিত না হতে পারি কাব্যরসাস্বাদে বিমোহিত হই।

সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দময়ের সত্তা দিয়ে জেনেছেন, সীমাহীন সরলের ভাষায় বলেছেন সুষমান্বিত করে। বিহিত অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণ কবি।

গ্রামের পাঠশালায় পড়েছিলেন কিছুকাল, শুধু নাম দস্তখৎ করতে পারতেন, এক ছত্র রচনা করেননি নিজের হাতে, তাঁরই কাব্যরূপ উদ্ঘাটন করবার জন্যে আহ্বান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫১ সালের শরৎচন্দ্র-স্মৃতি-বক্তৃতার বিষয়ই হল "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ"। সংসারে অনেক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে এ একটা। সেই বক্তৃতামালার গ্রন্থনই এই গ্রন্থ। স্বাধীনভাবে এ বই প্রকাশিত করবার অনুমতি দিয়েছেন বলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

পূজার শেষে যেন প্রসাদী ফুল হতে পারি বনের ফুলের এই শুধু নিবেদন॥

— অচিন্ত্যকুমার

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

'আমাকে রসে-বশে রাখিস, মা। আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে।'

এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা।

এই হচ্ছে নিত্যকালের কবির প্রার্থনা। রস চাই, সঙ্গে-সঙ্গে বশও চাই। আবেগ চাই, সেই সঙ্গে চাই বন্ধন, সংযম, শৃঙ্খল। ভাবের সঙ্গে চাই রূপ, সীমা, সৌষ্ঠব। নিবিড়তার সঙ্গে পরিমিতি।

নদীর আরেক নাম রোধবতী। তার বেগ আছে, সেই সঙ্গে আবার রোধ আছে তীর আছে। তট আছে বলেই সে তটিনী। যদি তার তীরের বন্ধন না থাকত সে হত বন্যা। আর যদি তার তরঙ্গ-রঙ্গ না থাকত সে হত পল্বল। রস যদি অ-বশ হয়, তাহলে যা—বশ যদি বিরস হয় তা হলেও তাই। ফল একই, অর্থাৎ কোনোটাই কবিতা হয় না। একটি তৈলস্নিগ্ধ পলতেতে আগুনকে বন্দী করতে পারলেই সে মসৃণ দীপশিখা হয়ে ওঠে, নইলে হয় সে স্ফুলিঙ্গ, নয় সে দাবানল। দীপশিখাটিই কবিতা।

রসে গাঢ় বশে দৃঢ়—শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। রসে সিক্ত বশে শক্ত—কবি শ্রীরামকৃষ্ণ।

উদার অর্থে, কবিতা কাকে বলে?

অল্প কথায়, কবিতা হচ্ছে একটা প্রকাশ, প্রস্ফুটন। অন্তরের ভাবকে রসে জ্বাল দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। ছন্দ বা মিল, যতি বা

ঝঙ্কার—এ সব বসন-ভূষণ মাত্র, প্রাণবস্তু নয়। বৃক্ষের বল্কল-পল্লব মাত্র, নয় পুষ্পবস্তু। প্রাণের আসল দীপ্তিটি চর্মে নয়, চক্ষে। দেখ কতদূরে পর্যন্ত সে তাকায়, অন্তরের কোন সুগহন অন্ধকার পর্যন্ত। দেখ একটি চকিত নেত্রপাতে কোন অতলতলের অন্ধকার তা আলোকিত করে!

শ্রীরামকৃষ্ণের কবিতার কাঠামোটি গদ্য। গদ্যে যে কবিতা হয় এতে আর দ্বৈধ নেই। আর, সে-গদ্য রোদ্দুরে ঝলসে-ওঠা ছুরির ফলার মতো ঝকঝকে। তীরের মত তীক্ষ্ণলক্ষ্য। দূরবেধী। যা মাত্র ব্যক্ত তার সীমা পেরিয়ে একটি অব্যক্তের প্রতি ইশারা। গোচর পেরিয়ে গভীরের দিকে। যা মাত্র স্পষ্ট তার কায়ার ঊর্ধ্বে একটি ছায়াময় রহস্যরাজ্যের প্রতি নির্দেশ। বিদিত ছেড়ে অবিদিতের দিকে। মৃন্ময় ছেড়ে চিন্ময়ের।

কণাটি হয়তো শিশিরের, কিন্তু উৎস আকাশ। বিন্দুটি অশ্রুর কিন্তু বেদনা ভুবনপ্লাবী। ডাকটি একাক্ষর 'মা', কিন্তু আর্তি দিগন্ত পর্যন্ত। অঙ্কুরটি ছোট কিন্তু তার মধ্যে দীর্ঘজট বট প্রচ্ছন্ন। বাক্যটি লঘু কিন্তু তার মধ্যে ভাবের বিস্ফোরণ। নিরীহ শুকনো কাঠ, কিন্তু আসলে অগ্নি-মন্থ। শ্বেত-শান্ত একটি শঙ্খ, তাতে স্তব্ধ হয়ে আছে সমুদ্রের আহ্বান।

আর এইখানেই তো কাব্যের প্রকাশ। অল্পের মধ্যে অতিশয়ের সংবাদ। প্রত্যক্ষের মধ্যে পরোক্ষের পরিচয়। নিকটের মধ্যে সুদূরের উপস্থিতি। নিরর্থকের মধ্যে অমূল্যের আবিষ্কার।

যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি' ততক্ষণ পর্যন্ত গদ্য। যেই 'তুমি' এল অমনি হল কবিতার জন্ম। যতক্ষণ আমি ততক্ষণ বন্ধ। যেই তুমি এলে অমনি ছন্দ বেজে উঠল।

আমি তোমার 'সহিত' হলাম।

॥ ২ ॥

তাই যার সত্যিকার সাহিত্য, সেই নিত্যিকার কবি।

সাহিত্য মানে কি? সাহিত্য মানে সহিত-ত্ব। সাহিত্যের মধ্যে যে তত্ত্বটি নিহিত আছে সেটি হচ্ছে 'সহিতে'র তত্ত্ব, মানে; মিলিত হওয়া সংযুক্ত হওয়ার তত্ত্ব। কিন্তু কার সঙ্গে মিলন? কার সঙ্গে সংযোগ?

উত্তর বিশেষ কঠিন নয়।

সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে, সমস্ত সংসারসৃষ্টির সঙ্গে, সমস্ত প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে। যা কিছু দৃশ্য জ্ঞেয় স্পৃশ্য গ্রাহ্য ভোগ্য আস্বাদ্য—সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে। গম্য ও গোচর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের সঙ্গে। শুধু স্বসংবেদ্য জিনিসের সঙ্গেই নয়, মানে, আত্মসুখ বা অ[illegible] বা আত্মরতির সঙ্গেই নয়, এই অন্তরঙ্গতা পরসংবেদ্য জিনিসের সঙ্গেও। তার মানে, আমার আশে-পাশের প্রতিবেশী মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা উত্থান-পতন বঞ্চনা-বিক্ষোভের সঙ্গে। এই সংসর্গ প্রতিটি ধূলি-কণা প্রতিটি মুহূর্তকণা সংসারসমুদ্র ঘটনা-তরঙ্গের প্রতিটি ফেণকণার সঙ্গে। বিশ্বসৃষ্টিতে কিছুই যেমন পরিত্যক্ত হয়নি, উপেক্ষিত হয়নি, সাহিত্যেও তেমনি সমগ্রের জন্যে সমুদয়ের জন্যে উদার নিমন্ত্রণ প্রসারিত। ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য মেধ্য-অমেধ্য সকলের জন্যে সমান ছায়াসত্র। অভিজাত-অপজাত কুলীন-অকুলীন পাঙক্তেয়-অপাঙক্তেয় সকলের জন্যে নিরপেক্ষ গণতন্ত্র। যেমন সৃষ্টিতে তেমনি সাহিত্যেও পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজ, কামের সঙ্গে প্রেম, বাসনার সঙ্গে বৈরাগ্য। মোটকথা, জীবনের বীণায় যত সুর ওঠে, কড়িতে আর কোমলে, ধৈবতে আর গান্ধারে—সমস্ত সুরের সম্পূর্ণতা এই সাহিত্যে। সাহিত্য কিছুই বর্জন করে না, অস্বীকার করে না, পরিহার করে না, প্রত্যাখ্যান করে না—না ব্যক্তিতে না সমাজে। খণ্ডকালের সমস্ত খণ্ডতা, সমস্ত ক্রমবাহিতার দিকে সে চোখ রাখে। ঘটনার সঙ্গে সে পা মিলিয়ে চলে, সমাজ সম্বন্ধে সে সক্রিয়-সচেতন হয়, ইতিহাস সম্বন্ধে সে জাগ্রতদৃষ্টি উদ্যতমুষ্টি হয়ে ওঠে। সে শুধু কালিতে কলম ডুবিয়ে লেখে না, সে লেখে স্বেদে ক্লেদে শোণিতে কলম ডুবিয়ে। যারা লেখনিক তারা সৈনিক, আর এই অমোঘ লেখনীই তাদের হাতের অব্যর্থ অস্ত্র। শাণিত শায়ক।

কিন্তু এইখানেই কি সাহিত্যের শেষ? এইটুকুই কি সাহিত্যের পরিধি?

না, আরো আছে। সৈনিকের পরে আছে আবার একটি সন্ন্যাসীর পরিচ্ছেদ। ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে, আরো একটি ইন্দ্রজাল। বস্তুবাদের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মচেতনার সংবাদ। ইদানীন্তনের ওপারে চিরন্তনের ইঙ্গিত। খণ্ড-কালের উপরে একটি নিত্যধামের অস্তিত্ব। সীমান্বিতা পৃথিবীর ওপারে অন্তহীন নীলাম্বর।

তাই আবার 'সহিতত্ব চাই ইন্দ্রিয়াতীতের সঙ্গে, চিরন্তনের সঙ্গে,

সনাতনের সঙ্গে। নিত্যধ্রুবনির্বিকল্পের সঙ্গে। শুধু ভূমিকে আশ্রয় করে থাকলেই চলবে না, আশ্রয় করতে হবে ভূমাকে। শুধু গম্য ও গ্রাহ্যকে নিয়ে থাকলেই চলবে না, যেতে হবে গোপনের দিকে গভীরের দিকে, গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠের দিকে। ইদানীন্তনের সঙ্গে মেশাতে হবে চিরন্তন। যা ইদানীন্তন তা হচ্ছে সংবাদ, যা চিরন্তন তা-ই সত্য। আর, সাহিত্য শুধু সংবাদ নয়, শুধু সত্যও নয়—দুয়ে মিলে সাহিত্য হচ্ছে সত্যের সংবাদ। এই সত্যের সংবাদটি যিনি সুন্দরের থালায় পরিবেশন করবেন তিনিই কবি।

আরো একটু বিশদ হই।

পৃথিবীতে অনেক কান্না, সেটা হচ্ছে সংবাদ, কিন্তু সমস্ত কান্না ছাপিয়ে শুনতে পাচ্ছি একটি হাসির শব্দ, সেইটিই হচ্ছে সত্য। তাই সাহিত্য শুধু কান্নাতেই ক্ষান্ত হবে না, আনবে সেই হাসির ইশারা—যে আনন্দময়ের থেকে এই হাসি উৎসারিত আনবে সেই আনন্দময়ের স্পর্শ। পৃথিবীতে এত মৃত্যু সেটা হচ্ছে সংবাদ, কিন্তু সমস্ত পূতিগন্ধ ছাপিয়ে আমাদের ঘ্রাণে ভেসে আসছে একটি প্রগাঢ় পুষ্পসৌরভ, সেইটিই হচ্ছে সত্য। তাই সাহিত্য শুধু এই ক্লিন্ন পূতিগন্ধেই নিমগ্ন থাকবে না, আনবে একটি পবিত্রগাত্র সুগন্ধময়ের সান্নিধ্য। পৃথিবীতে আছে অনেক ক্ষুধা আর বঞ্চনা, সেটা হচ্ছে সংবাদ, কিন্তু সেই ক্ষুধা ও বঞ্চনার ঊর্ধ্বে দেখতে পাচ্ছি একটি সুধাময় অতলস্পর্শ তৃপ্তি, সেইটিই হচ্ছে সত্য। তাই সাহিত্য শুধু ক্ষুধা আর বঞ্চনার হাহাকারই হবে না, দেখাবে একটি অনির্বচনীয় প্রসন্নতা, সহজলভ্যের মধ্যে দেখাবে একটি দুর্লভ আবির্ভাব। ক্ষণকালের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে খুলে দেবে সে নিত্যকালের সিংহদ্বার। মানুষকে সে একবেলার কাঙালী ভোজের আসরে ডাক দিয়ে ফিরবে না, তাকে সে ডাক দেবে অনন্তকালের অমৃতভোজের নিমন্ত্রণে।

সংবাদপত্রে মানুষের চেহারা পরাভূতের চেহারা, প্রবঞ্চিতের চেহারা। সাহিত্যেই মানুষ চিরজয়ী, আদিত্যবর্ণ অমৃতপুত্র। সাহিত্যেই তার সত্য পরিচয়, অবিকৃত কুলকীর্তি। তাই সাহিত্য হবে না শুধু বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কার, সাহিত্য হবে পূজার মন্ত্র, সুন্দরের পূজায় আনন্দ-মন্ত্র। তাই সাহিত্য অর্থ, শেষ পর্যন্ত, সেই আনন্দময়ের সহযোগ।

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।

এই বিশ্বসৃষ্টিটা মানুষের কাছে লেখা ঈশ্বরের একটি প্রেমপত্র। আর

মানুষের সাহিত্য হচ্ছে তার প্রত্যুত্তর। এই বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বরের সুর-সম্ভাষণ, সাহিত্য হচ্ছে তার প্রতিধ্বনি। এই বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বরের কান্তিগৌরব, সাহিত্য হচ্ছে তার প্রতিচ্ছায়া।

আমি যেমন আমার লেখার স্রষ্টা তেমনি এই বিশ্বরচনার কি কেউ স্রষ্টা নেই? আমি গ্রন্থকার হয়ে মানব না এই বিশ্বরচকের গ্রন্থকর্তৃত্ব? আমি আছি আর তিনি নেই?

॥ ৩ ॥

তিনি আছেন।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ।

কবি হচ্ছেন বেদবিৎ, বিদ্বান, কোবিদ, বিপশ্চিৎ। কবি হচ্ছেন ক্রান্ত-দর্শী। যিনি শেষ পর্যন্ত দেখেন। অতিক্রম করেও দেখেন।

কবির আরেক অর্থ সবিতা। জনয়িতা, রচয়িতা। যার থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম। সমস্ত কিছুর যাত্রা। সমস্ত কিছুর ভূমিকা।

আদিকবি ঈশ্বর।

তাকিয়ে দেখ একবার চার দিকে, নক্ষত্রখচিত আকাশ, কাননকুন্তলা পৃথিবী, গহনভয়াল অরণ্য, উদার-উদ্বেল উদধি। দেখ কেমন বিরাট তোমাকে বেষ্টন করে রয়েছে। একদিকে তুষারকিরীটী বিশাল পর্বত, অন্য দিকে কল্লোলিনীবল্লভ সমুদ্র। দেখ কেমন শ্যামল শস্যাঢ্য প্রান্তর, আবার দেখ দলিতাঞ্জন ঘননীল মেঘপুঞ্জ। দেখতে পাচ্ছ না একটি বিচিত্র বিন্যাস, একটি নিপুণ গঠনসজ্জা? কত গাছ কত ছায়া, কত ফুল কত রঙ, কত পাখি কত ডাক, কত জল কত সুর—দেখতে পাচ্ছ না একটি অনবদ্য ছন্দ, একটি অবিচ্যুত শৃঙ্খলা? ঋতুর পদপাতে দেখেছ কখনো বিন্দুমাত্র যতি-পাত? চার দিকে পাচ্ছ না কি একটি প্রেম-প্রসন্ন রস-প্রকাশ? হচ্ছে না কি একটি গভীর অর্থবোধ?

সেই অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণও কবি।

যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকে সকলের চেয়ে সহজ করে তিনি দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন সুন্দর করে। রসাত্মক বাক্যের সহযোগে। সুষমান্বিত বিন্যাসে। অক্ষুণ্ণ একটি অর্থের দ্যোতনায়।

কিন্তু রামকৃষ্ণ গোড়াতেই বলেছেন, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা।' যতক্ষণ পেটে অন্ন নেই ততক্ষণ সংসারে রস নেই, আর যতক্ষণ রস নেই ততক্ষণ ঈশ্বরও নেই। যতক্ষণ মানুষ রসহীন ততক্ষণ সে জড়পিণ্ড, ততক্ষণ সে যন্ত্রায়িত। যতক্ষণ তার পেটে রুটি নেই ততক্ষণই চাঁদ ঝলসানো রুটি; যতক্ষণ তার মাঠে ধান নেই ততক্ষণই চাঁদ কাস্তে। অজন্মা বা অভাবের সমস্যা চিরকালিক নয়। অভাবের শেষ আছে কিন্তু ভাবের শেষ নেই। রোষ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু রস অফুরন্ত। খিদে জুড়োয় কিন্তু চাঁদ ফুরোয় না।

আমি ক্ষুধার্ত, বঞ্চিত, পীড়িত, পরাভূত এই কি আমার চিরকালের পরিচয়? আমি ঈর্ষী ঘৃণী অসন্তুষ্ট, এই কি আমার আত্ম-নির্ণয়? আমি দৈন্যদীর্ণ সংকীর্ণ অশান্ত উদ্ধত—এতেই কি আমার তৃপ্তি? নিজের মাঝে খুঁজে পাব না বৃহতের সত্তা, ইয়ত্তাহীন আয়তন? নিজেকে কোনো-দিন ভাবব না অপরূপ বলে?

তাই দৈন্যদুঃখদুরিত একচেটে নয়। খিদে একদিন মেটে। সেদিন আবার মনে হয় খিদে মিটলেই তৃষ্ণা যায় না। অন্ন পেলে জোটে আবার অন্য ক্ষুধা। পরমান্নের লোভ। মনে হয় সে প্রসাদের পাত্র এই সমস্ত সৃষ্টি, তারাকণা থেকে ধূলিকণা। মনে হয় এ অমৃতে আমার জন্মগত অধিকার। আমি শুধু অন্নাধীন নই আমি পরমান্নভোজী।

তাই 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'-র পরেই অন্য চিন্তা পরাৎপরা। তখন, সেদিন, চাঁদকে মনে হয় শিশুর হাসি, প্রিয়ার মুখ, মা'র স্নেহধারা। রাত্রিকে মনে হয় শ্রীসৌন্দর্যসুধানদী। শুধু রুটি নয়, রুচি চাই—যে রুচি-র মানে হচ্ছে দীপ্তি দ্যুতি কান্তি প্রীতি, লালিত্য লাবণ্য! তখন এই শুধু বলতে ইচ্ছে করে :

'মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদমুখ।
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক॥'

ঠিকই তো, যতক্ষণ 'অন্নচিন্তা চমৎকারা,' রামকৃষ্ণ ঠিকই বলেছেন, ততক্ষণ 'কালিদাস বুদ্ধিহারা।' কিন্তু ভাত খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে কালিদাস যখন তার বুদ্ধি ফিরে পাবে তখন সে আবার চমৎকৃত হবে। তখন সে বুদ্ধির সীমা ছেড়ে চলে এসেছে অনুভবের অসীমায়। প্রমিতি ছেড়ে

অপরিমিতিতে। তর্কের ধূলিজাল ছেড়ে বিশ্বাসের শ্যামলতায়। সন্ধান ছেড়ে সিদ্ধান্তে। প্রমা ছেড়ে প্রেমে।

যখন ভালোবাসার আলো আসে তখন বুদ্ধির মোমবাতিকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে হয়।

তখন রামকৃষ্ণের মতই দেখি, 'চাঁদামামা সকলের মামা।'

ঈশ্বর সকলের ঈশ্বর। সকলের আপন। সকলের একলার।

অল্পযায়ী বুদ্ধির আলোটি নিবিয়ে দিলেই আসবে সেই স্পর্শানুভবের জ্যোৎস্না। ঘর ভরে দেবে। সংসারাঙ্গন ভরে দেবে। দিকদেশমণ্ডল শুচি হবে স্নিগ্ধ হবে তার ধারাস্নানে।

রসো বৈ সঃ। তিনি সর্বব্যাপী পরমানন্দ। সর্বত্র তাঁর প্রসারিত প্রসন্নতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছেন। আমাদের অমরত্বের, বিজয়-বীরত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যদি কবি নন তো কে কবি!

॥ ৪ ॥

গাঁয়ের পাঠশালায় পড়েছিলেন কদিন। নিজের নাম সই করতে পারতেন। সাত টাকা মাইনেয় কালী-ঘরের পুজুরী ছিলেন। মাইনে নেবার সময় খাজাঞ্চির খাতায় দস্তখৎ করতেন। তাও বা কদিন।

বাঙলা দেশে শূর-সূরীদের রাজত্ব তখন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ মজুমদার। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহেন্দ্র সরকার। যে এসেছে সে-ই তাঁর বাক্যের কাব্যামৃত আস্বাদ করে গেছে। পান করেছে, স্নান করেছে সেই সুধা-সাগরে।

রামকৃষ্ণ নিজেও অবাক, কি করে এত কথা জুটছে আমার ঝুলিতে? পুরাণ-পুঁথি পড়িনি, শাস্ত্রের নিশ্বাস আমার জানা নেই। কি করে সমানে-সমানে আলাপ করব ওদের সঙ্গে? তবু ভয় নেই, দ্বিধা নেই, কুণ্ঠা নেই এতটুকু। সে ভাবটুকুও বলছেন উপমা করে : 'মা আমার পেছনে থেকে রাশ ঠেলে দেন।'

ধান মাপবার সময় একজন মাপে আরেক জন রাশ ঠেলে দেয়। হাটে কোথাও দেখেছিলেন কয়ালের কারবার। মনে করে রেখেছেন।

'মা'র যদি একবার কটাক্ষ হয় তা হলে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে?'

কথাটি কটাক্ষ, কৃপা নয়। কটাক্ষ মানে অপাঙ্গ দৃষ্টি। কবিতার দিক থেকে কৃপার চেয়ে অনেক জোরদার।

উপমা রামকৃষ্ণস্য। উপমা কালিদাসস্য ছিল। সেটা বদলে গেছে। সর্বাঙ্গশোভনা বপুষ্টমা উপমা। শুধু বাইরের ব্যাপার নিয়ে নয়, ঘরের বিষয় নিয়ে। বৈচিত্র্যের সঙ্গে এত সুষমা আর কোথায় দেখেছি! কোথায় এত সূক্ষ্মতা, চারুতা, প্রসাদরম্যতা! শুধু কল্পনা নয়, পর্যবেক্ষণ। নির্বাচনে এত বৈশিষ্ট্য। ঘরোয়া জিনিস, অথচ টাটকা। সোজা কথা, অথচ শক্তিশালী। শাদামাঠা ছবি অথচ বর্ণাঢ্য।

ব্রহ্ম কি? কে বলতে পারে? কে পেরেছে বলতে?

কিন্তু এক কথায় বলা যায়। তাই বলেছেন রামকৃষ্ণ।

'ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

আর সব কিছুরই সংজ্ঞানির্ণয় হয়েছে, হয়েছে অনেক ব্যাখ্যা-বক্তৃতা। শুধু ব্রহ্মই কারু মুখ থেকে বেরিয়ে আসেনি। কেউ বলতে পারেনি সে কেমন, সে কি, সে কেন? তাকে বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তবু চারদিকে বাক্যের ছড়াছড়ি। সে অনুচার্য, অনির্বচনীয়। কেউ বলবে সে অবাঙমনসগোচর। সে নির্বিকার নিরাধার। সর্বাত্ম সর্বসাক্ষী। কত কথা, কত গুণকীর্তন। তবু তার ইতি নেই। সমাপ্তিতে নেই। সে স্ব-প্রকাশ হয়েও অ-প্রকাশনীয়।

বহুভাষে বর্ণনা করতে চেয়েছে অনেকে। যে অবর্ণনীয় তাকে নিয়ে অনেক বর্ণলিপি। রামকৃষ্ণ তাকে এক কথায় ব্যক্ত করেছেন। যে অপরিমেয় তার একটি পর্যাপ্ত অর্থ দিয়েছেন। 'ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।' ব্রহ্ম কোনো দিন এঁটো হয়নি। কোনো রসনা স্পর্শ করতে পারেনি তাকে। কারু সাধ্য নেই যে দন্তস্ফুট করে।

বিদ্যাসাগরকে একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ:

'এক বাপের দুই ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্যে ছেলে দুটিকে আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বছর পর শিক্ষা সমাপ্ত করে তারা গুরু-গৃহ থেকে ফিরে এল। বড় ছেলেকে জিগগেস করলেন বাপ, ব্রহ্ম কেমন

বল দেখি। বেদ থেকে নানা শ্লোক আওড়ে বড় ছেলে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে লাগল। যখন ছোট ছেলেকে জিগগেস করলেন বাপ, সে কিছুই বললে না, হেঁটমুখে চুপ করে রইল। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না।'

ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে আর কার এত সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী উক্তি আছে যা এতখানি অর্থ ধরে!

কিন্তু ব্রহ্ম তো লাভের বস্তু, উপলব্ধির বিষয়। যে তাকে দেখেছে, জেনেছে, পেয়েছে, সেও কি তাকে বর্ণনা করতে পারবে না?

সেও না। কেননা সে তখন 'লবণ পুত্তলিকা'।

অপূর্ব একটি ছবি এঁকেছেন রামকৃষ্ণ।

'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খবর দেবে?'

প্রেম মিশে গেল প্রেমের সঙ্গে। চোখের জল চোখের জলের সঙ্গে। তখন আর পৃথকত্ব কোথায়? বিরহ-বিপ্রয়োগ কোথায়? তখন আর আমি-তুমি নেই। তখন একমাত্র তিনি।

এই কথাটিই আবার অন্য ভাবে বলেছেন : 'আগেকার লোক বলতো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না।'

তীরে দাঁড়িয়েই দর্শন-স্পর্শন করো। সমুদ্রে নেমেছ কি তলিয়ে গেছ।

ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না, কিন্তু তার সঙ্গস্পর্শের আনন্দের একটু আভাস দাও।

রামকৃষ্ণ আবার একটি প্রতীক অবলম্বন করলেন। বললেন, 'যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ঘি কেমন খেলে? তাকে এখন কি করে বোঝাবো? হদ্দ বলতে পারো, কেমন ঘি, না যেমন ঘি।'

বলেই একটি গল্প ফাঁদলেন : 'একটি মেয়েকে তার সঙ্গিনী এসে জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রে তোর স্বামী এল, তার সঙ্গে তোর কেমন আনন্দ হল? মেয়েটি বললে, ভাই, এ বলে বোঝানো যায় না। তোর যখন স্বামী হবে তখন তুই জানতে পাবি।'

ঈশ্বরের আনন্দটি বোঝাবার জন্যে মানুষের দেহী কল্পনার চরম

আনন্দকেই বেছেছেন রামকৃষ্ণ। খাদ্যের মধ্যেও নিয়েছেন ঘি, চরম সার-বস্তু। সংস্কারমুক্ত উদার কবিত্বের ব্যঞ্জনা এইখানে।

যে ব্রহ্মময় সে পূর্ণ। আর, যে ভরপুর সে আর কথা কয় না। যতক্ষণ প্রাপ্তি না হয় ততক্ষণই কোলাহল। যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। শিবনাথ শাস্ত্রী যতক্ষণ সভায় আসেনি ততক্ষণই তাকে দেখবার জন্যে হট্টগোল, যেই সে এল অমনি তাকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেল।

এই পূর্ণতার কথা স্তব্ধতার কথাটি বলেছেন নানা উপমায়।

'ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘিয়ের শব্দ নেই। তেমনি, যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু খেতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। আবার, পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভকভক শব্দ করে। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না।'

তপ্ত ঘিয়ের শব্দ, ভ্রমরের ঝঙ্কার আর পূর্ণায়মান কলসীর কলরব। তিনটি বিচিত্র ধ্বনি শুনছি কান পেতে।

কিন্তু সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দেবার জন্যে আবার যখন নেমে আসে তখন কথা কয়। কি রকম শব্দ হয় তখন?

'যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে তখন আর-একবার ছ্যাঁক-কল-কল করে। মধু খেয়ে মাতাল হবার পর কখনো আবার গুনগুন করে মৌমাছি। ভরা কলসী থেকে যদি আরেক কলসীতে ঢালাঢালি হয় তা হলে আরেকবার শব্দ ওঠে!'

বেদ-পুরাণে যে বলেছে ব্রহ্মের কথা, সে কেমনতরো জানো? উপমা গাঁথলেন রামকৃষ্ণ : 'একজন সাগর দেখে আসার পর যদি তাকে জিগগেস করা হয়, সাগর কিরকম, তখন সে যদি বলে, ও কী হিল্লোল-কল্লোল দেখলুম, ব্রহ্মের কথাও সেই প্রকার।'

॥ ৫ ॥

এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

ব্রহ্ম অস্তি-নাস্তির মধ্যে থেকেও অস্তি-নাস্তির বাইরে। নেতি-নেতি করে এগুতে হয় তার দিকে।

ব্রহ্ম কি মাটি? না। ব্রহ্ম কি আকাশ? না। ব্রহ্ম কি সূর্য? না।

ব্রহ্ম কি সমুদ্র? না। এমনি 'না'-র সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে এগিয়ে যাও পরমতম অন্তিমতম 'হাঁ'-র ছাদের দিকে।

এমনি বর্জন করতে-করতে অর্জন করো।

এটি বোঝাবার জন্যে সুমধুর একটি দৃষ্টান্ত নিলেন রামকৃষ্ণ। একটি ঘরোয়া ছবি। অনবদ্য কবিতা।

'একটি মেয়ের স্বামী এসেছে। সঙ্গে সমবয়স্ক কয়েকজন ছোকরা। বাইরের ঘরে বসে গল্প করছে। বাইরে থেকে জানলা দিয়ে মেয়ে আর তার সমবয়সী সখীরা তাদের দেখছে। সখীরা বরকে চেনে না। একজনকে দেখিয়ে সখীরা বলছে মেয়েটিকে, ঐ কি তোর বর? মেয়েটি হেসে বলছে, না। আরেকজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি? উঁহু। আবার আরেকজনকে দেখছে। আবার অস্বীকার। এমনি জনে-জনে। শেষকালে ঠিক-ঠিক বরকে লক্ষ্য করে বলছে, তবে ঐটিই তোর বর? তখন সে মেয়ে হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না, শুধু একটু ফিক করে হেসে চুপ করে থাকে। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেইখানে চুপ।'

নেতি-নেতি করে যেখানে মনের শান্তি হয় সেইখানে ঈশ্বর। যেখানে আর প্রশ্ন নেই, সাক্ষী-প্রমাণ নেই, যেখানে মীমাংসার মৌন, সেখানে ঈশ্বর। এ সম্বন্ধে আরেকটি কাহিনী গেঁথেছেন রামকৃষ্ণ। উজ্জ্বল একটি কল্পনার অলকা।

'সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। বন্ধুকে নিয়ে একজন গিয়েছে রাজদর্শনে। প্রথম দেউড়িতে গিয়ে দেখে একজন ঐশ্বর্যবান পুরুষ অনেক লোকলস্কর নিয়ে বসে আছে। খুব জাঁকজমক। লোকটি তার সঙ্গীকে জিগগেস করলে, এই কি রাজা? সঙ্গী ঈষৎ হেসে বললে, না।

প্রথম দেউড়ি পার হয়ে দ্বিতীয় দেউড়ি। সেখানেও পূর্ববৎ। যত এগিয়ে যায়, দেখে, ততই ঐশ্বর্য। একে-একে সাত দেউড়ি পার হয়ে গেল। তখন যাকে দেখলে তার ঐশ্বর্যের আর তুলনা নেই। তখন লোকটি দাঁড়িয়ে রইল অবাক হয়ে। সঙ্গীকে আর প্রশ্ন করতে হল না। বুঝলো, এই রাজা। সন্দেহের আর অবকাশ নেই এক তিল।'

আর সকলকে চিনতে দেরি হয়, ঈশ্বরকে চিনতে দেরি হয় না। আর সকলকে চিনিয়ে দিতে হয়, ঈশ্বরকে চিনিয়ে দিতে হয় না। বিরহানলের প্রদীপটি যখন জ্বলে তখনই আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মুখচন্দ্রিকা ঘটে।

'নেতি-নেতি'র আরো একটি গল্প আছে রামকৃষ্ণের :

'চোরেরা খেতে ফসল চুরি করতে আসে। তাই মানুষের চেহারা করে খড়ের ছবি টাঙিয়ে রেখেছে মাঝখানে। তাই দেখে চোরেরা ভয় পেয়েছে। কোনোমতে ঢুকতে পারছে না। তখন এক চোর গুটিগুটি পায়ে কাছে গিয়ে দেখে এলো খড়ের ছবি। বললে, ভয় নেই, মানুষ নয়, খড়। তবু চোরেরা আসতে চায় না। বলে, বুক দুর-দুর করছে। তখন আগের চোরটা খড়ের ছবিটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বলতে লাগল, নেতি, নেতি। এ কিছু নয়, এ কিছু নয়।'

তেমনি বস্তু এসে দাঁড়ায় পথের সামনে। যখন লোভ হয় তখন ভয়ও হয়। কিন্তু একবার বলো সাহস করে, আমি বস্তু চাই না, উপকরণ চাই না, আমি সত্যকে চাই। আমি ত্যাগের পথ দিয়ে সত্যের সন্ধানে চলেছি। কলির কালরাত্রি থেকে চলেছি সত্যের সুপ্রভাতে। সত্যের কল্যাণালয়ে। মৃত্যুই কলন বা কলি। মৃত্যুই ভয়মিশ্রিত। সত্যই অভয়, সত্যই অমৃত, সত্যই ব্রহ্ম।

যা তিনকালে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, যার ধ্বংস নেই উৎপত্তি নেই, বিকার নেই, পরিবর্তন নেই, চলেছি তারই অভিসারে। দীপাধার চাই না, চাই সেই দীপবহ্নিকে। মেদমজ্জা মাংসচর্ম চাই না, যিনি প্রাণরূপে প্রতীয়মান তাঁকে চাই।

কত কি চোখের সামনে দাঁড়াবে এসে ছদ্মবেশে। বলবে, আমার দিকে তাকাও। বলব, তাঁকে যখন দেখব তখন শুধু একদিকে দেখব না। দরকার হবে না কোনো ঘোষণার। শিশুকে বলে দিতে হবে না এইটিই তার মা। তার মা সুপ্রকাশ, সন্নিহিত। 'আবিঃ সন্নিহিতং'। যা আছে, যা প্রকাশ পাচ্ছে তাই সত্য। 'অস্তীতি ভাতীতি চ সত্যং'। হে ছদ্মধারী, তুমি নও, তুমি নেই, তুমি নেতি।

॥ ৬ ॥

কিন্তু নেতি-নেতি করে যেখানে এসে পৌঁছুব সেখান থেকে আবার ইতিকে দেখতে হবে। আত্মাকে ধরে তাকাতে হবে আবার পঞ্চভূতের দিকে। সেই কথাটিই আবার বলেছেন রসায়িত করে :

'ছাদে উঠতে হবে, সব সিঁড়ি একে-একে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সিঁড়ি কিছু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপর পেঁছে দেখা যায় যে জিনিসে ছাদ তৈরি—ইট চুন সুরকি—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈরি। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই আবার জীবজগৎ, তিনিই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। যিনি আত্মা তিনিই আবার পঞ্চভূত।'

এই ভাবটির আরেকটি রূপ দিয়েছেন :

'সা রে গা মা পা ধা নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। নি-থেকে আবার সা-তে নেমে আসতে হয়। ব্রহ্ম থেকে আবার জীবে।'

শুধু একের মধ্যে নয়, প্রত্যেকের মধ্যে, সকলের মধ্যেই তাঁকে দেখতে হবে। কিন্তু সেই এককে না জেনে অনেককে চিনব কি করে? তাই জ্ঞানের শিখর থেকে নেমে আসতে হবে প্রেমের নির্ঝরিণীতে। সমতল নিম্ন-ভূমিতে। সর্বানুভূ রয়েছেন বিরাজমান এ বোধ না জন্মালে সর্বভূতে তাঁকে দেখবো কি করে? যিনি আপ্তিতে আছেন তিনি ব্যাপ্তিতেও আছেন। যত বিস্তৃত করে তাঁকে দেখব ততই আমার আনন্দের পাত্রটি গভীর হবে। তাঁকে যদি সর্বত্রই না দেখি তবে বিশ্ববোধের মহাঙ্গন ছেড়ে চলে এলাম ক্ষুদ্রবুদ্ধির অন্ধকূপে। আমার জ্ঞানস্বরূপ কি বিজনবাসী একচর?

কিন্তু তাঁকে জানি এমন সাধ্য কই?

চিনির পাহাড়ে পিঁপড়ে গিয়েছিল বেড়াতে। তার গল্প ফাঁদলেন রামকৃষ্ণ।

'চিনির পাহাড়ে এক পিঁপড়ে গিয়েছিল। একদানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবারে এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব।'

ঈশ্বর চিনির পাহাড়, আমরা পিঁপড়ে। অতুলন উপমা। তিনি রস-স্বরূপ আমরা রসপিপাসু। কিন্তু সেই রসের সরসীর কি তল পাব, না, কূল পাব? আর, অনন্তকে জানারই বা আমার কী দরকার!

দরকারও নেই। তাই এ নিয়ে আরেকটি কবিতা গাঁথলেন রামকৃষ্ণ :

'যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে এ মাপবার আমার কী দরকার? আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসেবে আমার লাভ কী!'

আবার তেমনি : 'বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। কত ডাল কত পাতা এ সব হিসেবের দরকার নেই।'

একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে যদি তাঁকে মনে পড়ে যায়, যদি জীবনের কোনো একটি নির্জন স্থানে এসে তাঁর উপর ভালোবাসা আসে, তা হলেই হল। ভালোবাসাই আলো জেবলে পথ দেখিয়ে দেবে। আসল হচ্ছে ভালোবাসা। বিচার করে কি হবে? বিচার করে কি পথ পাব? আমরা যখন ভালোবাসি তখন কি বিচার করে ভালোবাসি?

সেই তো নিরন্তর প্রার্থনা। প্রেম-বারি বর্ষণ করো। ঢালো তোমার অমৃতবিন্দু। লতা-পাতা তৃণ-গুল্মে বনরাজি সব শুকিয়ে গেল। পিপাসায় মরে গেল আমার আত্মাবল্লী, জল দাও।

এই বিচারের কথাই বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বলেছেন এক কথায় :

'আমি চিনি হতে চাই না, আমি চিনি খেতে ভালোবাসি। আমার এমন কখনো ইচ্ছে হয় না যে বলি, আমি ব্রহ্ম। আমি বলি তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস। আমি তাঁর নামগুণগান করব এই আমার সাধ।'

কত সহজ করে বলেছেন কথাটি। আরো সহজ করেছেন এ কটি কথায় :

'বেশি বিচার করতে গেলেই সব গুলিয়ে যায়। এ দেশের পুকুরের জল উপর-উপর খাও, বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশি নিচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়।'

তাই বিচার নয়, বিশ্বাস। তর্ক নয়, প্রেম।

বলেছেন, 'বিচার যেখানে থেমে যায় সেইখানে ব্রহ্ম'—তারপর একটি অভিনব উপমা : 'কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না।'

এই ভাবটিকেই আবার আটপৌরে চেহারা দিয়েছেন : 'বিচার বন্ধ হলেই দর্শন। তখনই মানুষ অবাক, সমাধিস্থ। থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে—এ গল্প সে গল্প। যাই পর্দা উঠে যায়, সব গল্প-টল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে তাইতেই তখন মগ্ন হয়ে থাকে।'

তোমাকে যখন দেখি তখন শুধু চেয়ে থাকি তোমার মুখের দিকে। তুমি কী সুন্দর এই কথাটুকুও আর বলতে হয় না। সেটুকুও অনাবশ্যক হয়ে যায়। তুমি সুন্দর বলেই তো আমার চোখ খুলল। তুমি সুন্দর বলেই তো এত আলো জ্বলল দিনে-রাত্রে!

ঘৃতের দীপ জেবলে মন্দিরের অন্ধকারে দেবতাকে দেখেছি। আজ অন্তরের স্থিরধামে প্রেমের পুণ্য আলোতে তোমাকে দেখি।

প্রেমেই সকল চাওয়ার সকল পাওয়ার শান্তি।

॥ ৭ ॥

এখন, এই ব্রহ্মের স্বরূপটি কি? উপমার পর উপমা দিয়েছেন রামকৃষ্ণ।

'ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের সামনে কেউ ভাগবৎ পড়ে, কেউ বা দলিল জাল করে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

যেমন সূর্য। শিষ্টের উপর যেমন আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও তেমনি আলো দিচ্ছে। সূর্য নির্বিকার।

যেমন আগুন। আগুনে যে রঙের বড়ি দেবে সেই রঙ দেখা যাবে। লাল বড়ি দিলে লাল, নীল বড়ি দিলে নীল। আগুন নির্গুণ।

যেমন বায়ু। ভালোমন্দ সব গন্ধই সে নিয়ে আসে। বাতাস উদাসীন।

যেমন সাপ। সাপের মুখে বিষ আছে। সর্বদা সেই বিষ মুখ দিয়ে খাচ্ছে, ঢোঁক গিলছে, কিন্তু সাপ নিজে মরে না। যাকে কামড়ায় সেই মরে।'

ব্যাসদেবের একটি গল্প বললেন এইখানে।

গল্পে রামকৃষ্ণের দুর্লভ কৃতিত্ব। শুধু বিষয়ের মূল্যে নয়, বলবার কৌশলে। একটি ছত্রকেও ফেলা যায় না সে বর্ণনা থেকে। শেষ লাইনটি না আসা পর্যন্ত তাঁর গল্পের শেষ নেই। গল্পের প্রাণ যে-বিস্ময় থেকে বিচ্ছুরিত সেই আশ্চর্য চমকটি হীরের আলোর মত ঠিকরে পড়ছে। সেই চমকটুকুতেই তীক্ষ্ম হয়েছে সংকেত। রামকৃষ্ণ শুধু কবি নন, তিনি শিল্পী। তিনি শুধু প্রাণদাতা নন, তিনি রূপকার।

'যমুনা পার হবেন ব্যাসদেব। দধি-দুধের ভাঁড় নিয়ে গোপীরা উপস্থিত। তারাও পার হবে নদী। কিন্তু নৌকো নেই।

ব্যাস বললেন, আমার খিদে পেয়েছে। খিদে পেয়েছে তো ভাবনা কি। গোপীরা তাঁকে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াতে লাগল। সব ভাঁড় প্রায় উজাড়।

তবু দেখা নেই নৌকোর।

তখন ব্যাস বললেন যমুনাকে, যমুনে, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তোমার জল দু-ভাগ হয়ে যাবে আর মাঝের রাস্তা দিয়ে আমরা সোজা চলে যাব। যেই কথা সেই কাজ। যমুনা দু-ভাগ হয়ে গেল।

গোপীরা তো অবাক। অবাক হয়ে হবে কি! মাঝখানে ঠিক ওপারে যাবার পথ হয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে পার হয়ে গেল সকলে।'

গোপীরা কিছু বললে না। বুঝলে, আমি খাইনি মানে, আত্মা আবার খাবে কি। আত্মা নির্লিপ্ত—সাত দেউড়ির পার। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, জন্ম-মৃত্যু নেই। রামকৃষ্ণ বললেন, 'সে অজর অমর সুমেরুবৎ।'

বাংলায় একটি নিরুক্ত-সূক্তি।

আরেকবার খুঁজবে ব্রহ্মকে? 'সে পেঁয়াজের খোসা। পেঁয়াজের প্রথমে লাল খোসা ছাড়ালে, তারপর শাদা পুরু খোসা। বরাবর এমনি ছাড়িয়ে যাচ্ছ। ছাড়াতে-ছাড়াতে ভিতরে আর কিছু খুঁজে পাচ্ছ না।'

আরেকবার দেখবে ব্রহ্মকে? সর্বভূতে সর্বানুভূকে?

'ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ মাঝেরই খোল।'

এই ব্রহ্মের স্বরূপ যে বুঝেছে, যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কেমন অবস্থা? তার দেহ আর আত্মা আলাদা হয়ে গেছে।

'যেমন,' উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ, 'যেমন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আর খোল আলাদা হয়ে যায়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়-নড় করে। কাঁচা শুপুরি বা কাঁচা বাদামের মধ্যে শুপুরি-বাদাম ছাল থেকে তফাৎ করা যায় না। কিন্তু পাকা অবস্থায় শুপুরি-বাদাম আর তার ছাল আলাদা হয়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস যায় শুকিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞান হলে শুকিয়ে যায় বিষয় রস।'

আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়-নড় করে। ভাষার তেজ আর প্রসাদ-গুণ একসঙ্গে। তার সঙ্গে অর্থের বিদ্যুতি।

আমি কবে নির্লিপ্ত হব? কুমুদ জলে থেকেও জলে নেই, তার যোগ চাঁদের সঙ্গে। তেমনি কবে তোমার সঙ্গে যুক্ত হব? আমি যদি তোমার সঙ্গে লিপ্ত হই, তুমি কি পারবে নির্লিপ্ত থাকতে? আমি যদি তোমার অমৃতসমুদ্রে স্নান করি তুমি কি নামবে না আমার হৃদয়ের সরোবরে?

॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম তো নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, তবে কাজ করছে কে? চালাচ্ছে কে জগৎসংসার? চালাচ্ছে শক্তি।

নিত্য আর লীলা। সংসারজুড়ে তারই নৃত্যলীলা।

অগ্নি আর তার দাহিকা। বিদ্যুৎ আর তার দীপিকা। জল আর তার শৈত্য। সূর্য আর তার দীধিতি।

পুরুষ আর প্রকৃতি।

এ রূপটিকে কত ভাবেই প্রকাশ করেছেন রামকৃষ্ণ :

'কাঠামো আর দুর্গাপ্রতিমা।'

সাপ আর তার তির্যক গতি। জল আর তার ঢেউ। বাবু আর তার গিন্নি।

সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, তির্যকগতি হয়ে এঁকে-বেঁকে চললেও সাপ। জল স্থির থাকলেও জল, হেললে-দুললেও জল। যতক্ষণ স্থির ততক্ষণ পুরুষ-ভাব। তার মানে প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে। আর যেই নড়া-চড়া, চলা-ফেরা তখুনি প্রকৃতি পুরুষের থেকে আলাদা হয়ে কাজ করছে।

পুরুষ অকর্তা। প্রকৃতির কাজ সাক্ষীস্বরূপ হয়ে দেখছেন। প্রকৃতিরও সাধ্য নেই পুরুষ ছাড়া কাজ করে।

'ওই যে গো দেখনি বে-বাড়িতে? কর্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে-বসে আলবোলায় তামাক টানছে। গিন্নি কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে বাড়িময় ছুটোছুটি করছে। একবার এখানে, একবার ওখানে। একাজটা হল কিনা ও কাজটা করলে কিনা সব দেখছে-শুনছে। বাড়িতে যত মেয়ে-ছেলে আসছে, আদর-অভ্যর্থনা করছে। আর মাঝে-মাঝে কর্তার কাছে এসে হাত-মুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্ছে, এটা এই রকম করা হল, ওটা ঐ রকম। আর ঐটি যা ভেবেছিলে করা হল না। কর্তা তামাক টানতে-টানতে সব শুনছে আর হুঁ-হুঁ করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্ছে। সেই রকম আর-কি!'

কত কঠিন একটি তত্ত্ব, অথচ কত সহজ, কত রসাল করে এঁকেছেন। কত হৃদয়গম্য করে। শিব-শক্তির তত্ত্ব। শিব যে শব হয়ে পড়ে আছেন তার মানে ত্যক্তকর্মা হয়ে আছেন, আর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন মহাকালী। কালঘরণী, শিবাসনা। কর্তীহর্ত্রী বিধাতৃকা। কিন্তু এটুকুই লক্ষ্য করবার যা কাজ সে করছে, পুরুষের সঙ্গে যোগযুক্তাত্মা হয়ে। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিও তাই। যোগমায়া মানেই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। ঐ যে বঙ্কিম ভাব তাও ঐ যোগের জন্যে।

কাপড়ে হলুদ মেখে ছুটোছুটি করছে! একটি হালকা তুলির টানে একটি জীবন্তোজ্জ্বল চিত্র।

পুরুষ আর প্রকৃতি। কবি আর তার কল্পনাশক্তি। সেই কল্পনা নানা রূপে বিকশিত হচ্ছে কবিতায়। কোনোটা বড় কবিতা, কোনোটা বা ছোট। কোনোটাও বা অলক্ষ্য।

জল কোথাও সাগর, কোথাও দিঘি, কোথাও বা ধানের শিষে ক্ষুদ্র একটি শিশিরকণা। ফুল কোথাও পদ্ম, কোথাও গোলাপ, কোথাও বা ঘেঁটু। কোথাও শঙ্খ কোথাও শম্বুক কোথাও বা শুক্তি। বিভু রূপে সর্ব-ভূতে তাঁর বিভূতি।

সেইটিই বলেছেন কাব্যায়িত করে :

'কোনোখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনোখানে বা একটা মশাল। সূর্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশি প্রকাশ। আবার জল চাইতে আর্শিতে বেশি প্রকাশ। তাঁর লীলার সব বিচিত্রতা। কোথাও শক্তি কম, কোথাও বা বেশি। তা না হলে একজন লোক দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ পালায় মোটে একজনের থেকেই।'

তাই যে হারে যে জেতে সব তাঁরই খেলায় তাঁরই হার-জিত। যার রোগ তারই চিকিৎসা। সাপ হয়ে যে খায় রোজা হয়েই সে ঝাড়ে।

তাই আমার যেটুকু ক্ষুদ্রশক্তি সেইটুকুও তোমারই আভা। আমার যে-টুকু ভালোবাসা সেটুকু তোমারই পেলবতা। তুমি আকাশব্যাপিনী বর্ষা হয়েই নেই, তুমি আছ আমার নিঃসঙ্গ অশ্রুতে। তুমি তোমার এই ভুবনজোড়া রাজপ্রাসাদেই নও, তুমি আছ আমার শূন্য মন্দিরে।

কিন্তু যাই বলো ব্রহ্ম আর শক্তি, নিত্য আর লীলা এক।

একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'এক রাজা এক যোগীর কাছে এক কথায় জ্ঞান চেয়েছিল। একদিন এক জাদুকর এসে উপস্থিত। বলছে, রাজা, এই দেখ এই দেখ। রাজা দেখল জাদুকর দুটো আঙুল ঘোরাচ্ছে। অবাক হয়ে তাই দেখছে রাজা। খানিক পরে দেখলে দুটো আঙুল এক আঙুল হয়ে গেছে। সেই একটা আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে জাদুকর ফের বলছে, রাজা, এই দেখ, এই দেখ।'

রাজা তাই দেখল। পেল এক কথার জ্ঞান। অর্থাৎ একের জ্ঞান। তাই আবার বলেছেন রামকৃষ্ণ, 'এক জানার নামই জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান।'

এক বই আর দুই নেই, কিছু নেই। প্রথমে দুই বোধহয়—শিব আর শক্তি, নিত্য আর লীলা। কিন্তু জ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না। তখন অভেদ, তখন একীভাব। তখন অদ্বৈত। একই আসল। ব্রহ্ম হচ্ছে সেই এক। শক্তি হচ্ছে সেই একের পিঠে শূন্য।

সংখ্যার প্রতীকেই বোঝালেন ব্রহ্ম-শক্তিকে। বললেন, 'একের পিঠে অনেক শূন্য দিলেই সংখ্যা বেড়ে যায়। এককে পুঁছে ফেল, শূন্যের আর মূল্য নেই।'

সেই 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে' থাকতে বলেছেন রামকৃষ্ণ। মানিক ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিচ্ছি আমরা। কিন্তু যদি শূন্য গ্রন্থিও পড়ে, তা হলেও যেন বিশ্বাস করি ঐ শূন্যতার মধ্যেও তিনি আছেন। শূন্যের যা আকার, পূর্ণেরও সেই আকার। যা শূন্য ভুবন তাই পূর্ণভবন। তিনি গলার হার হয়ে গলায় আছেন, চোখের মণি হয়ে চোখে, হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে হৃদয়ে। বাইরে কোথায় তাঁকে খুঁজে বেড়াব? কোন বিদেশে? এক ভিন্ন দুই নেই। এক ভিন্ন পৃথক নেই। তিনিও যা আমিও তা। সৃষ্টির সিংহাসনে আমিও তাঁর সঙ্গে বসেছি একাসনে।

কিন্তু বসব কখন? বসব ভালোবাসার অংশী হয়ে।

গভীর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন রামকৃষ্ণ : 'মনিব চাকরকে খুব ভালোবাসে। চাকরকে একদিন ধরে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। চাকর তো কিছুতেই বসবে না, মনিব তাকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলে, আরে বোস, তুইও যা, আমিও তাই। কিন্তু ভাবো চাকর যদি সেধে নিজের থেকে বসতে যায় চেয়ারে, তবে মনিব কি করে? তাকে দেয় বসতে?'

॥ ৯ ॥

সেই শক্তির নাম মহামায়া।

ব্রহ্মের চেয়ে মহামায়ার জোর বেশি।

কি রকম?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'জজের চেয়ে প্যায়দার বেশি ক্ষমতা।'

পেয়াদা যদি পরোয়ানা জারি করে না আনে, সাধ্য কি জজসাহেব মামলার বিচার করেন? জজসাহেব ব্রহ্ম, পেয়াদা শক্তি।

জগৎসংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে মহামায়া। মুগ্ধ করে রেখে, তার খেলা খেলিয়ে নিচ্ছে। সৃষ্টি-সংহারের খেলা। মহামায়াই আবরণ, অবরোধ। সে দ্বার ছেড়ে না দিলে যাওয়া যায় না অন্দরে। যে জ্ঞানী সে মায়াকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। যে ভক্ত সে স্তব করে। বলে, মা, তুমি পথ ছেড়ে দাও। তুমি পথ না ছাড়লে ব্রহ্মকে দেখি কি করে?

লক্ষ্মণ এমনি স্তব করেছিল সীতার। সীতা সরে দাঁড়াতেই লক্ষ্মণের রামদর্শন হল।

'তাঁর মায়াতেই তিনি ঢাকা রয়েছেন।' বিচিত্র উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'যেন পানা-ঢাকা পুকুর। পানা-ঢাকা পুকুরে ঢিল মারলে খানিকটা জল দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই পানা নাচতে-নাচতে এসে জলকে ঢেকে দেয়। তবে যদি পানাকে সরিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে বাঁশ ঠেলে পানা আর ভিড়তে পায় না। তেমনি মায়াকে সরিয়ে জ্ঞানভক্তির বেড়া দিতে পারলে মায়া আর ভিতরে আসতে পারে না।'

একখানি তুচ্ছ গামছা, তার কী শক্তি! চোখের কাছে আড়াল দিলে প্রদীপের আলো আর দেখা যায় না। এমন যে সূর্য তাকে ঠেকানো যায় চোখের কাছে হাত তুলে।

আড়ালটি সরাও। তোমার অবগুণ্ঠনটি উন্মোচন করো। তোমার অবগুণ্ঠনটি না তুললে তোমার মুখখানি দেখি কি করে। কি করে দেখি তোমার সেই ধরা-পড়ার হাসি! তোমার সেই আনন্দের কটাক্ষ!

কত ছোট-খাটো আবরণ রচনা করেছি তোমাকে যাতে দেখতে না পাই। কত তুচ্ছ দেয়াল তুলে দিয়েছি তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ব্যবধানের ভঙ্গুর কত বেড়া বেঁধেছি চারপাশে। মোহ আর অহঙ্কার, আত্মাদর আর পরশ্রীকাতরতা। কে বা পর আর কারই বা শ্রী! চার দিকে সব ধূলির আচ্ছাদন। এ সব ধূলির আচ্ছাদন ধূলিসাৎ করে দাও। কু-আশার কুয়াশা দাও সরিয়ে। তোমাকে একবার দেখি। নত-হয়ে-পড়া মাকে যেমন শিশু দেখে, নত-হয়ে-পড়া সূর্যকে যেমন দেখে পদ্ম, তেমনি তোমাকে দেখি! বিশাল আকাশ হয়ে অমৃতের ভারে তুমি আমার উপর নত হয়ে পড়েছ। অন্তরীক্ষ ভরা অনন্ত চক্ষুতে দেখি তোমার সেই স্নেহ-স্থির মাতৃদৃষ্টি।

যে জ্ঞানী সেই বীর। সেই মায়াকে চিনতে পারে। আর মায়াকে যদি একবার চেনা যায় মায়া আপনিই ভয়ে পালায়।

দুটি সরল-সুন্দর গল্প বলেছেন রামকৃষ্ণ :

'এক গুরু শিষ্য বাড়ি যাচ্ছেন, সঙ্গে চাকর নেই। পথের মাঝে একটা লোককে দেখতে পেয়ে বললেন, ওরে, আমার সঙ্গে যাবি? ভালো খেতে পাবি আদরে থাকবি, বেশ তো, চল না। লোকটা ছিল মুচি। আমতা-আমতা করে বললে, ঠাকুর আমি নিচু জাত, কেমন করে আপনার চাকর হই? গুরু তাকে প্রশ্রয় দিলেন, বললেন, কোনো ভয় নেই, কাউকে তুই নিজের পরিচয় দিস না, কি, কারু সঙ্গে আলাপ করিস না। নিশ্চিন্ত হয়ে রাজী হল মুচি। সন্ধের সময় শিষ্যবাড়িতে বসে গুরু সন্ধ্যা করছে, এমন সময় আরেক ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত। সামনে চাকর দেখতে পেয়ে বললেন, আমার জুতো জোড়াটা এনে দে তো। চাকর কথা কইল না। আবার তাড়া দিলেন ব্রাহ্মণ। তাতেও চাকর চুপ করে রইল। কি রে, কথা কচ্ছিস না কেন? ওঠ্! তবু চাকর নড়ল না। তখন ধমকে উঠলেন ব্রাহ্মণ, আরে বেটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনছিস না? তুই কী জাত? মুচি নাকি? চাকর তখন ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগল। কাঁপতে-কাঁপতে গুরুর দিকে চেয়ে বললে, ঠাকুর মশাই গো! ঠাকুর মশাই গো! আমায় চিনেছে। আমি পালাই!'

মায়া পালিয়ে গেল। প্রশ্রয় দিয়ে গুরু তাকে রেখেছিল স্ববশে, নিজেকেও বিস্মৃতির বিভ্রমে। তুই তোর জাত গোপন করে থাক, আমিও জানতে যাব না তুই কে। কিন্তু সহসা চলে এলেন জিজ্ঞাসু। জ্ঞানীকে দেখেই মায়া সঙ্কুচিত হল। যতই সে জড়সড় হয় ততই জ্ঞানী তেড়ে আসে। প্রশ্ন করে বসে, তোর জাত কি? লক্ষণা কি? তুই কি মায়া? যেই স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল অমনি মায়া লজ্জায় চম্পট দিলে।

'হরিদাস বাঘের ছাল পরে ছেলেদের ভয় দেখাচ্ছে। একজন বীর ছেলে বললে, তোকে আমি চিনেছি। তুই আমাদের হরে।'

হরিদাস নয়, হরে। একেবারে নস্যাৎ করে দিলে।

হরিদাস নিশ্চয়ই বয়স্ক ব্যক্তি। বালকের পক্ষে তাকে অন্তত বলা উচিত ছিল, তুমি আমাদের হরিদাস। তাহলে বোধহয় সম্ভ্রম দেখানো হত তাকে। কিন্তু তাকে একেবারে লোপ করে দেওয়া হল—তুই মিথ্যা, তুই মায়া।

মায়া কি সহজে যায়? সংস্কার দোষে মায়া আবার লেগে থাকে। মায়ার সংসারে থেকে-থেকে মায়াকেই সত্য মনে হয়। ছায়াছবি দেখে লোকে আবার কাঁদে।

এই নিয়েও গল্প আছে রামকৃষ্ণের :

‘এক রাজার ছেলে পূর্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। একদিন খেলা করবার সময় সমবয়সীরা বলছে, এখন অন্য খেলা থাক। আমি উপুড় হয়ে শুই, তোরা আমার পিঠে হুস-হুস করে কাপড় কাচ।’

তুমি আমার মনোহরণ করবার জন্যে কত জিনিসই তৈরি করেছ। কত রঙচঙে খেলনা। কত সুন্দর পুতুল। দু বেলা মেলার থেকে কিনে আনছি হর-রকমের সওদা-সুলুপ। জিনিস দিয়ে ঘর ভরাছি প্রাণপণে। যতই জিনিস বাড়াচ্ছি ততই কমাচ্ছি তোমাকে। যতই স্তূপীকৃত করছি ততই তুমি সঙ্কুচিত হচ্ছ। তোমার জায়গা জিনিসে মেরে দিচ্ছে। জিনিসের চাপে পড়ে তুমি সরতে-সরতে চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দা, পরে বারান্দা পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছ রাস্তায়। কোথায় আমি বেরুব, না, তুমি বেরিয়ে গেলে!

আমি জিনিস, তুমি জায়গা। জিনিস ফেলে দিয়ে কবে আমি জায়গা হব! কবে বুঝব তুমিই সব আর সব আমার অভিমান! তুমিই সোনা আর সব আমার অহঙ্কারের রাঙতা!

ছোট্ট একটি গল্প বললেন এখানে :

‘এক মাতাল দুর্গা-প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজ-গোজ দেখে বলছে, মা, যতই সাজো আর গোজো, দিন দুই-তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দেবে।’

তেমনি মাতাল হও ঈশ্বর-প্রেমে। দেখবে সব কাঠ আর খড় মাটি আর শোলা। বড়জোর জরি আর চুমকি। ডাকের গয়না-পরা দুদিনের প্রতিমা।

উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : ‘তালগাছই সত্য। তার ফল-হওয়া আর ফল-খসা দুদিনের। বাজিকরই সত্য। বাজিকরের ভেলকি দুদণ্ডের।’

॥ ১০ ॥

কিন্তু এই ঈশ্বরের চেহারাটি কি রকম? সাকার, না নিরাকার?
ঈশ্বর দু রকমই। তিনি সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন।
ভক্তের কাছে তিনি সাকার, জ্ঞানীর কাছে নিরাকার।
নিরাকার মানে নীরাকার। সাকার মানে তুষারাকার।

এ ভাবটি কত বিচিত্রভাবে প্রকাশ করেছেন রামকৃষ্ণ। প্রকাশ কত রসাশ্রিত হয়েছে :

'যেমন বরফ আর জল। জল জমেই তো বরফ। বরফ গলেই তো জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়। কিন্তু দেখ, জলের রূপ নেই—একটা বিশেষ আকার নেই। কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে নানা রূপ ধরে চাঁই বেঁধে জলে ভাসে, তেমনি ভক্তি-হিম লেগে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরে মূর্তির বিকাশ হয়। জ্ঞানীর কাছে তিনি অব্যক্ত, ভক্তের কাছে তেমনি ব্যক্ত। আবার জ্ঞান-সূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল তেমনি জল। অধঃ-ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ, জলে জল।'

তুমি যেমন ভাবে তেমনি আবার গঠনে। তুমি যেমন রূপে তেমনি আবার অবয়বে। তুমি যেমন মৌনে তেমনি আবার হাহাকারে। তোমার কি ইতি আছে? তুমি যদি আকাশে থাকতে পারো, কেন আধারে থাকতে পারবে না? তুমি সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে আছ, শুধু দাঁড়াতে পারবে না আমার চোখের সমুখে?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঘরের মধ্যে থেকে দেখাও যা, পাশ থেকে দেখাও তাই। দুই দেখাই ঘরকে দেখা।'

তোমাকে যখন দেখিনি অথচ তোমার কথা ভাবতাম, তখন তুমি নিরাকার। তারপর তোমাকে যখন দেখলাম, ধরলাম, তোমার নিশ্বাসের স্পর্শ পেলাম, তখন তুমি সাকার। কিন্তু যখন তোমাকে দেখি তখন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করে দেখতে পারি কই? তখন তুমি সাকার হয়েও নিরাকার। আবার যখন দূরে বসে তোমাকে ভাবি তখন সেই ভাবের মধ্যে কখনো দেখি তোমার অপলক চোখ কখনো বা পদপল্লব দুখানি। তখন আবার তুমি নিরাকারের মধ্যে সাকার।

ঈশ্বর সত্যিই কি রকম তা ঈশ্বরের থেকেই জেনে নিলে হয়!

'সে পাড়াতেই গেলি না, জানবি কি!' একটি অসাধারণ উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'আগে কলকাতায় যাও তবে তো জানবে কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এসিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক! খড়দা বামুন-পাড়া যেতে হলে আগে তো খড়দায় পৌঁছুতে হবে!'

তা না, শুধু ঘোরাঘুরি। তলা না ছুঁয়ে উপর-উপর ভাসা। শিকড়ে না গিয়ে শুধু পাতায়-পাতায় হাওয়া খাওয়া।

এ যেন নায়েব-গোমস্তার থেকে জমিদার-বাড়ির খবর নেওয়া। এক-এক জন এক-এক রকম খবর বলে, একটার সঙ্গে আরেকটা মেলে না—ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াই। যাই না আসলের ঘরে, যাই না সেই সারাৎসারের আসরে।

রামকৃষ্ণ তার সুন্দর দৃষ্টান্ত দিলেন :

'যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয়, তা হলে তার কখানা বাড়ি, কত টাকা, কত কোম্পানির কাগজ—আমার অত খবরে কাজ কী! যো সো করে, স্তব-স্তুতি করেই হোক বা দারোয়ানের ধাক্কাধুক্কি খেয়েই হোক, কোনো মতে বাড়ির ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে একবার আলাপ করে নে। আর, যদি তার টাকা-কড়ি তালুক-মুলুকের খবরই জানতে ইচ্ছে হয়, সরাসরি তাকে জিগগেস করলেই তো হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে রাম, তার পরে রামের ঐশ্বর্য—জগৎ। তাই বাল্মীকি "মরা" মন্ত্র জপ করেছিলেন। "ম" মানে ঈশ্বর আর "রা" মানে জগৎ—তাঁর ঐশ্বর্য।'

তাই কোথায়, কার দুয়ারে আমি যাব তোমার খবর করবার জন্যে। আমি আমার নিজের দুয়ারে বসলাম, আমার অন্তরের দুয়ারে! তুমি ভিতর থেকে বন্ধ দরজায় টোকা মেরে বোঝাচ্ছ তুমি আছ। আমি বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা মেরে বলছি, খুলে দাও দরজা। আশ্চর্য, আমারই ঘরে ঢুকে আমাকে বাইরে রেখে দিব্যি তুমি ঘর বন্ধ করে দিলে! আমারই ঘর-দ্বার, আর, আমিই পর আমিই বার। দরজা খুলে দাও। দেখাও তুমি কেমন দেখতে! তুমি সাকার না নিরাকার! তুমি কি দীপ্তি, না, দীপ? তুমি কি কল্পনা, না, কবিতা?

তুমি কি তত্ত্বের তিনি? না, তুমি কি প্রেমের তুমি? না, তুমি কি অহংকৃতির অহং?

তুমি কি 'ওঁ তৎসৎ', না, 'তত্ত্বমসি', না, 'সোঽহং'?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও, মিষ্টি লাগবেই।'

তুমি আমার মিছরির রুটি। তোমাকে ভাবতেই ভালো লাগে। তুমি সকল ভালোর আসল ভালো। জীবনে কত সংগ্রাম, সমস্ত সংগ্রামের সর্বশেষ উদ্দেশ্য যে শান্তি, তুমি আমার সেই শান্তি। কত দুঃখ, সমস্ত দুঃখের অবসানে যে আনন্দের সঙ্কেত, তুমি আমার সেই সঙ্কেত। কত

বঞ্চনা, সমস্ত বঞ্চনার পরপারে যে সামঞ্জস্যের স্বীকৃতি তুমি আমার সেই স্বীকৃতি। তুমিই আমার সাম্য, তুমিই আমার সন্ধি, তুমিই আমার সত্তা।

তুমি বলে দাও তুমি আমার কে!

রামকৃষ্ণ গল্প বললেন একটি :

'কতকগুলো কানা একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিল এ জানোয়ারটির নাম হাতি। তখন তারা হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখতে লাগল কেমন না জানি দেখতে হাতিকে। কারু হাত পড়ল শুঁড়ে, কারু বা পায়ে, কারু বা কানে, কারু বা পেটে। কেউ বললে, হাতি ঠিক থামের মত, কেউ বললে, গাছের ডালের মত। কেউ বললে, কুলোর মত, কেউ বা বললে, দূর, জলের জালার মত।'

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। যে যেমন বুঝেছে মনে করছে তাই বলছে। হাতির চেহারা নিয়ে মারামারি করছে কানারা। কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ বৈষ্ণব, কেউ অবধূত। কেউ সাকার কেউ নিরাকার। ভাবছে আমিই আসল ফিরিওয়ালা।

এই ভাবটিই আবার সংক্ষেপে বলেছেন একটি সজীব উপমার সাহায্যে :

'সবাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। কিন্তু কারু ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে না। শুধু সূর্যই ঠিক যাচ্ছে। তাই মাঝে-মাঝে সূর্যের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নাও।'

নিরাকারও আছে, সাকারও আছে।

এবার একটি গাছের উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'একডেলে গাছও আছে, আবার পাঁচডেলে গাছও আছে।'

তারপর দিলেন মাছের উপমা :

'নানারকম পূজার তিনি আয়োজন করেছেন—অধিকারীভেদে। বাড়িতে যদি বড় মাছ আসে তাহলে মা নানারকম মাছের ব্যঞ্জন রাঁধেন—যার যা পেটে সয়। কারু জন্যে ঝোল কারু জন্যে ঝাল কারু জন্যে বা মাছের পোলাউ। ভাজা-অম্বল-চচ্চড়ি। যার যেটি ভালো লাগে। শুধু যার যেটি মুখে রোচে নয়, যার যেটি পেটে সয়। তাই কারু কৃষ্ণ, কারু শিব, কারু রাম কারু কালী। কারু বা নিরাকার—ওঁ খং ব্রহ্ম!'

তাই, তুমি তো কত ভয়ঙ্কর, কত ঘোরদর্শন। কত অগ্ন্যুৎপাত, কত তুষারঝড়, কত জলপ্লাবন। কত বিশাল কত ভয়াল কত প্রচণ্ড। কিন্তু

আমার যেমনটি সয় তেমনি করে তুমি এসেছ আমার আস্বাদের জন্যে। কোমল হয়ে মধুর হয়ে শোভন হয়ে এসেছ। এসেছ ভয়ত্রাতা দুঃখহর্তার হাসি নিয়ে। ফেলে রেখে এসেছ তোমার ঐশ্বর্যের সাজ, তোমার প্রতাপের রাজমুকুট। রাখালের ছেলে হয়ে এসেছ তোমার বাঁশিটি নিয়ে। কিংবা প্রবাস থেকে গৃহাগত ছেলের কাছে স্নেহময়ী মা'র মত। যে যেমনটি চায় তার কাছে তেমনটি হয়ে এসেছ। তাই কখনো এসেছ প্রেয়সীর কাছে তার স্বামীর মত। কখনো বা নয়নানন্দ আনন্দ-দুলাল হয়ে।

তুমি কি শুধু এক? তুমি এক হয়েও একের পিঠে বহু শূন্য। এক হয়ে তুমি অনন্ত। তুমি বিচিত্র, তুমি বিবিধ।

এই ভাবটিই আবার অন্যরূপে প্রকাশ করেছেন। এবার বাজনার মধ্য দিয়ে।

'রশুনচৌকিতে দুজনে বাঁশি বাজায়। একজন সানাই আরেকজন পোঁ। দুটো বাঁশিতেই সাতটা করে ফোকর। সাতটা ফোকর থাকতেও একজন কেবল পোঁ ধরে থাকে। আরেকজন নানান রাগ-রাগিণী বাজায়, দেখায় সুরের নানান করতব।'

ঐ পোঁ-টি নিরাকার। আর সানাইটি সাকার।

ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁকে নানাভাবে সম্ভোগ।

তিনি কামধেনু, আমি বৎস। তাঁর দুগ্ধধারা আমার জন্যে। আমি নইলে সেই দুগ্ধ কে পান করবে? সেই দুধ দিয়ে আমি ছাড়া কে করবে পায়সান্ন?

তাই তিনিও আমার সন্ধান করে ফিরছেন। বৎসহারা গাভীরই মত ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমাকে। আমি নেবার জন্যে কাঁদছি তিনি দেবার জন্যে কাঁদছেন। আমি না থাকলে তাঁর প্রেম যে অসম্পূর্ণ থাকে। আমার হৃদয় না পেলে কোথায় তিনি খেলবেন, কোথায় তিনি ফলবেন। তিনি যে কত বিচিত্র কত স্বাদগন্ধবর্ণময় তাই বোঝাবার জন্যে তাঁর এত আয়োজন। তিনি যত বড়ই লেখক হন তিনি চান আমারই মুগ্ধ প্রশংসা। আমার স্তুতি না পেলে তাঁর লেখা যেন দীপ্তি পায় না। তাই তো রাজ্যেশ্বর হয়ে আমার ভাঙা ভবনের দুয়ারে তিনি করাঘাত করেন। বলেন, এ কবিতাটি কেমন লিখেছি দেখ তো!

প্রতিটি দিনের পৃষ্ঠায় নবীনতরো কবিতা। বলেন, তোমার ভাষ্যটি না পেলে আমার ভাষা যে নিরর্থক হয়ে থাকে।

॥ ১১ ॥

তারপর শোনো সেই গিরগিটির গল্প :

'গাছতলায় সুন্দর একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম। কে একজন এসে বললে। তখুনি আরেকজন প্রতিবাদ করে উঠল : লাল কেন হবে? তোমার খানিক আগে সেই গাছতলায় গেছলুম আমি। স্বচক্ষে দেখে এসেছি, সে সবুজ। চাল মারার আর জায়গা পাওনি? বললে তৃতীয়জন। এই দুটো চর্মচক্ষে দেখে এসেছি কাল। সে গিরগিটি লালও নয় সবুজও নয়, দস্তুরমতো নীল। আশ্চর্য, কী বলছে এরা! আমি যে দেখে এলুম হলদে। সবাই পাগল হয়ে গেল নাকি? বললে শেষ জন। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব কি করে? আমি যে দেখে এলুম পাঁশুটে। নানা মুনির নানা মত। নানা দ্রষ্টার নানা দৃষ্টি। শেষে এতে ওতে ঝগড়া বেধে গেল। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? বললে এসে আরেক ব্যক্তি। সব বিবরণ যখন শুনলে, তখন বললে, আমি ঐ গাছতলারই বাসিন্দে। তোমরা প্রত্যেকে যা বলছ, সব সত্য। ও গিরগিটি কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো নীল কখনো ধূসর। আবার কখনো দেখি একেবারে শাদা। রঙের রেখা নেই এতটুকু। একেবারে নির্গুণ।'

তুমি বিচিত্র, আমি বিশেষ। এই বিশেষের মধ্যেই তোমার বিচিত্র লীলা। আমি যদি বিশেষ না হতাম তা হলে তোমাকে বিচিত্র বলে কে অনুভব করত? তেমনি আবার আমাকে বিচিত্র করে তুমি বিশেষ হয়ে ধরা দিয়েছ। আমাকে বন্ধু করে নিজে ধরা দিয়েছ বন্ধু বলে। আমাকে পুত্র করে নিজে ধরা দিয়েছ পিতারূপে। আমাকে দীনসেবক করে ধরা দিয়েছ অমিতপ্রতাপ প্রভু হয়ে।

আমি ভাব নিয়ে কী করব, আমি বস্তু নেব, তোমাকে নেব। আমি তুমি হব।

বললেন রামকৃষ্ণ :

'একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে কাপড় রঙ করবার জন্যে তার কাছে আসে। যে যে-রঙ চায় তাকে সেই রঙে ছুপিয়ে দেয় কাপড়। নীল আর লাল, হলদে আর বেগনি। একজন দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই

আশ্চর্য ব্যাপার। তার দিকে চোখ পড়ল রঙ-ওয়ালার। তার দিকে তাকিয়ে বললে, কি, তোমার কাপড় কোন রঙে ছোপাতে হবে বলো? তখন সেই লোকটি বললে, ভাই তুমি যে রঙে রঙেছ, আমাকে সেই রঙে রঙিয়ে দাও।'

একটি মনোমোহন কবিতা। ইঙ্গিতে তাৎপর্যে নিখুঁত।

ঈশ্বরের রঙ কী? ঈশ্বরের রঙ হচ্ছে প্রেম। আমাকে প্রেমে রঙিন করো। আমি কোনো ঐশ্বর্য কোনো সামর্থ্য চাই না—আমি চাই শুধু প্রেম, প্রেমের দীনতা প্রেমের বিধুরতা। তোমাকে যদি ভালোবাসতে পারি সবাইকে তখন ভালোবাসবো, দেখবো ভালো চোখে। সবায়ের সঙ্গে রঙে-রসে মিশে তোমার সঙ্গেই একাকার হব। হে পূর্ণপ্রবাহ নদী, প্রেমের ঢেউয়ে আমাকে সকলের ঘাটে-ঘাটে ভাসিয়ে নিয়ে যাও।

সাকার থেকে চলেছি নিরাকারে। স্থূল স্থল থেকে চলেছি নীরাকারে।

আকার হচ্ছে একটা সেতু। সেই সেতু পেরিয়ে যাব সেই নির্গুণ নিঃসীম নিরুপমের ঘরে। দ্বিতীয় না হলে ধরি কি করে সেই অপরূপ অদ্বিতীয়কে? এই দ্বিতীয়ই তো মাধ্যম। এই দ্বিতীয়ই তো প্রতিমা।

ঘরোয়া একটি দৃষ্টান্ত দিলেন এইখানে :

'মেয়েরা যদ্দিন স্বামী না পায় ততদিনই পুতুল খেলে। যেই বিয়ে হয়, সত্যিকার স্বামী জোটে অমনি পুতুলগুলি প্যাঁটরায় পুঁটলি বেঁধে তুলে রাখে। ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমার কী দরকার?'

ঈশ্বরের মূল্য কী, কিসে? তাঁর ঐশ্বর্যের ওজনে? আমি সে ভারের পরিমাপ করব কি দিয়ে? তার দরই বা কষব কিসে? কোন হাটে তার যাচাই হবে? কেবা সে যাচনদার?

তোমার মূল্য তোমার ঐশ্বর্যে নয়। তোমার মূল্য আমার আনন্দে। তোমাকে নিয়ে আমি যত আনন্দিত, আমার কাছে তুমি তত মূল্যবান। আনন্দেই তোমাকে সম্বোধন, আনন্দেই তোমার প্রতিধ্বনি। কী করে তোমার ঠিকানা পেতাম যদি অন্তরে আনন্দের আলোটি না থাকত! যদি আনন্দের আলোটি না থাকত, তুমিই বা কী করে চিনতে আমার বাতায়ন!

তাই তোমাকে যে ভাবে যে ভঙ্গিতে, যে রূপে যে রীতিতে দেখে আমার সুখ, সেই-সেই প্রকারে সেই-সেই পদ্ধতিতে তোমারও অবস্থিতি। আমার আনন্দেই তোমার অভিনন্দন।

আরেকটি কবিতা রচনা করলেন রামকৃষ্ণ :

'ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই দেখবে তাঁর আর নাম রূপ নেই। দূরে বলেই কালীকে শ্যামবর্ণ দেখায়। যেমন দূর থেকে দিঘির জল কালো, সমুদ্রের জল সবুজ দেখায়। কাছে গিয়ে হাতে জল তুলে দেখ, কোনো রঙ নেই। দূর থেকে নীল দেখায় আকাশ, কাছে কোনো রঙ নেই। সূর্য দূর থেকে ছোট, কাছে গেলে ধারণার বাইরে। পৌঁছিয়ে একটু দূরে সরে এলেই কালী আমার শ্যামা-মা, কালীকে তখন চৌদ্দপোয়া দেখায়।'

উপাসনায় পরিচ্ছিন্নতা দরকার। তার মানে মূর্তিরূপ পরিচ্ছিন্ন বস্তু কাছে রাখলেই বৃহৎ বস্তুর ধারণা সম্ভব। একটি ঘটকে বড় করে দেখতে হলে তার পাশে একটি ছোট ঘট রাখো। না ছুঁয়ে একটি রেখাকে বড় করতে হলে তার পাশে টানো একটি ছোট লাইন। তেমনি অনন্তকে আন্দাজ করবার চেষ্টায় তার পাশে রাখো একটি সান্ত মূর্তি। মাকে পাশে রেখে বুঝতে চাও সেই জগন্মাতাকে।

দশ আঙুল ভূমি হচ্ছে হৃদয়। সেই ভূমিতে সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষের স্থান হবে কি করে? তাই তাকে ছোট করে নাও। যিনি মহতো মহীয়ান তিনি অণোরণীয়ানও হতে জানেন। তাই তোমার আনন্দের জন্যে তাকে সগুণ করো, সশরীর করো। তিনি অচক্ষু হয়ে দেখেন অকর্ণ হয়ে শোনেন, অপাণিপাদ হয়ে সর্বনৈবেদ্য গ্রহণ করেন।

তারপর যদি একদিন বলেন, দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ, বলে প্রজ্ঞানয়ন খুলে দেন তখন আর রূপ-কূপে ডুবব না, যাব না আর নাম-ধামে, তখন শুধু একটি চিন্মাত্রবিস্তার। একটি চৈতন্যদ্যুতি।

তার আগে করি কদিন পুতুল-খেলা। প্রান্তরে ডাক পড়বার আগে সেরে নি আমাদের প্রাঙ্গণের লুকোচুরি।

॥ ১২ ॥

কি করে মূর্তি থেকে চলে আসব বোধে, সাকার থেকে নিরাকারে, তার একটি উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন রামকৃষ্ণ। হিন্দুর মূর্তিসাধনার অভিনব কাব্যরূপায়ন। যেমন তত্ত্বের দিক দিয়ে তেমনি সাহিত্যের দিক দিয়ে অনন্য।

'মনে করো দশভুজা ভগবতীর মূর্তি। দশপ্রহরণধারিণী দশদিকে

দশ হাত প্রসারিত করে রয়েছেন। এত বড় ঐশ্বর্যশালিনী মূর্তি আর দুটি নেই। চতুর্দিকে ভগবানের এত যে ঐশ্বর্য তার একটা মূর্তি দেব না? তাই করেছি এই ভগবতীর কল্পনা। সিংহবাহনা সৌন্দর্যারূঢ়া দুর্গা। দরদৈন্যদুঃখদুরিতদলনী। কিন্তু ঐখানেই কি বিস্তীর্ণ করে রেখেছি নিজেকে? না, ক্রমে-ক্রমে ঐশ্বর্য কমিয়ে এনেছি, ধ্যানকে সংহত করতে গিয়ে ধ্যেয়কে ছোট করে এনেছি। দশভুজা ষড়ভুজা জগদ্ধাত্রী হয়েছেন। ষড়ভুজাকে করেছি চতুর্ভুজা কালী। কলিদর্পঘ্নী, করুণামৃত-সাগরা। চতুর্ভুজা কালীকে কমিয়ে এনেছি আবার দ্বিভুজ কৃষ্ণে। কৃষ্ণকে নিয়ে এসেছি বালগোপালে। সে কচি শিশু, নিষ্পাপ নির্মল, নির্ভূষণ, ঐশ্বর্যের বালাই নেই একবিন্দু। ছোট হাতখানি তুলে নবনী যাচ্ঞা করছে, মাতৃস্নেহের নবীন নবনী। বালগোপালকে কমিয়ে নিয়ে এসেছি শিবলিঙ্গে। শিবলিঙ্গকে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে, শালগ্রাম শিলায়।'

তারপর? তারপর নিষ্প্রতীক। আর প্রতীক নেই প্রতিমা নেই, প্রত্যক্ষসাক্ষ্য নেই। তখন ভুবনময় একটি অখণ্ড জ্যোতি, একটি অখণ্ড পরিস্পন্দ। তখন তাতে লীন হয়ে গেলাম ধীরে-ধীরে। আদি-অন্ত শূন্য অরূপ সমুদ্রে। তখন আর আমি-তুমি নেই—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্ম-বিভা। একটি ক্ষুদ্র-ক্ষীণ শিলা হয়ে ছিলাম ধরণীর এক কোণে, মিশে গেলাম আয়ত্তাতীত আদিত্যে।

সাকার থেকে চলে গেলাম নিরাকারে।

তারপর?

এইখানেই রামকৃষ্ণের কবিত্বের সম্পূর্ণতা।

'ঐখানেই লীন হয়ে রইলাম না। আবার উন্মীলন হল। আবার চোখ খুললাম। দেখলাম সব কিছুতে ভগবান প্রতিমূর্ত। নিরাকার থেকে আবার এলাম সাকারে, এবার সত্যিকার সাকারে। নিরাকারে ছিল সম-চেতনা, এবারকার সাকারে সমদৃষ্টি। সর্বত্র সমদৃষ্টি স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে। সমস্ত জীবে ব্রহ্মের প্রতিভাস। সমস্ত জীবে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।'

এই জাগরণের বাণীটিই একটি সর্বভাসক দীপ্তমন্ত্র।

'জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা জীবে শ্রদ্ধা জীবে প্রেম।'

'অন্নচিন্তা চমৎকারা'র পর এটিতেই রামকৃষ্ণের সাম্যবাদ সম্পূর্ণতা পেল। শুধু ঔদরিক অভাবের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েই তিনি তৃপ্তি পেলেন

না, প্রত্যেকের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করলেন পরমাত্মার মর্যাদা। মহৎ-বংশোদ্ভবের গরিমাময় কৌলীন্য। কোথাও আপজাত্য নেই, আমরা প্রত্যেকে সেই ব্রহ্মের সন্তান, আমরা সহোদর, একগোত্র, অমৃতত্বে আমাদের সমান অধিকার।

ভূমাই যদি আনন্দ হয়, আনন্দ লাভ করো রামকৃষ্ণের এই উদার বিশ্ববোধে। যেখানে যত মানুষ, সব আমার প্রভুর প্রতিভূ, আমার মিত্রের মিত্র। এই অনুভবটি না পেলে কি করে আমি ভূমাতে এসে পেঁছুতে পারি? যদি সমস্ত জীবকে আমি না পাই আমার আনন্দতীর্থে তা হলে তোমাকে পাওয়া হল কই? শুধু বন্ধ ঘরে তোমার বিগ্রহটি নিয়ে দিন কাটালেই আমার চলবে না। আমাকে তুমি সমগ্রের প্রেমিক করো। আমি সামগ্রীর সুখ চাই না, কিন্তু চাই সামগ্রিক সুখ। চাই আত্যন্তিকী শান্তি। চাই ভূমানন্দ। 'না পূরে অলপ ধনে দারিদ-তিয়াস।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি সমস্ত বেলটিকে চাই।'

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত, ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছন্ন। আমার অন্তরে যে ব্যথা, আর তরুশাখে যে পুষ্পভার সব তাঁরই স্পর্শ। আমার অন্তরে যে কথা আর বিহঙ্গকণ্ঠে যে সুর সব তাঁরই বাণী। তিনি আগুনে আছেন জলে আছেন, হাসিতে আছেন অশ্রুতে আছেন, পুণ্যে আছেন পাপে আছেন, শুচিতে আছেন অশুচিতে আছেন। ভালো-মন্দ এমন কিছু নেই যা তিনি-ছাড়া। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম।

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি সমস্ত বেলটিকেই চাই। শাঁস-বিচি-খোল সমস্ত নিয়েই বেল।'

একটি হৃদয়স্পন্দী কবিতা। নিজেই আবার তার ব্যাখ্যা করলেন সুন্দর করে : 'বেলের শাঁস-বিচি-খোল আলাদা-আলাদা করে রেখেছিল একজন। কিন্তু বেলটা কত ওজনের জানতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে চলবে না। শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যাবে? খোলা-বিচি-শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। খোলা নয়, বিচি নয়—শাঁসটিই সার পদার্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচার করে দেখ যার শাঁস, তারই বিচি, তারই খোলা। আগে নেতি-নেতি। জীব নেতি জগৎ নেতি। ব্রহ্মই শাঁস। শেষে দেখবে যা থেকে ব্রহ্ম তা থেকেই ফের খোলা-বিচি, জীব-জগৎ।'

যেমন ঊর্ণনাভ আর ঊর্ণা। মাকড়সার থেকে লূতাতন্তু, আবার লূতাতন্তুর মধ্যেই মাকড়সা। আকাশের মধ্যে ঘট আবার ঘটের মধ্যেই আকাশ। ব্রহ্মময় হয়ে গেলে সমস্ত তখন আনন্দময় দেখে। দেখে সকলই ঈশ্বরপরবশ, ঈশ্বরসমাশ্রিত।

এই ভাবটি রামকৃষ্ণ ভাষায়িত করেছেন। এটি কি একটি কবিতা নয়?

'অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে, তখন দেখে যে সবই হলদে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে-ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে। আর, নিজেকেও শ্যামবোধ হল। পারার হ্রদে শিশে অনেক দিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরে পোকা ভেবে-ভেবে নিশ্চল হয়ে থাকে আরশুলা। কুমুরে পোকাই হয়ে যায় শেষপর্যন্ত।' পরে বললেন : 'আরশুলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল।'

তখন একমাত্র ব্রহ্ম। অনাদি, নিরতিশয়। অস্তিনাস্তিহীন। অসঙ্গ হলেও সর্বাধার। নির্গুণ হয়েও গুণভোক্তা। অন্তরে-বাহিরে, দূরে-অন্তিকে। অচরং চরমেব। স্থাবর জঙ্গম। আবার অরূপ, অবিজ্ঞেয়। কারণ-স্বরূপে এক কার্যস্বরূপে নানা। ভূত-ভর্তা। জ্যোতির জ্যোতি, প্রকাশকের প্রকাশক। জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তমসঃ পরং।

ব্রহ্ম হচ্ছে সত্তা। প্রকৃতি শক্তি। ব্রহ্ম হচ্ছে মন শক্তি হচ্ছে ইচ্ছা। এই ইচ্ছারই নাম মায়া। দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী এই মায়া।

কী সুন্দর বর্ণনা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'কোথাও কিছু নেই, ধুমধাড়াক্কা। বেশ রোদ রয়েছে, হঠাৎ মেঘ হল, চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। বৃষ্টি হল, বজ্রপাত হল, আবার তখুনি মেঘ গেল কেটে, রোদ উঠল। ব্যস, এর নাম মায়া।'

এটি কি কবির বর্ণনা নয়? রামকৃষ্ণকে কি বলব না আমরা সাহিত্যিক?

॥ ১৩ ॥

রামকৃষ্ণের যেমন উদার বোধ, তেমনি উদার বুদ্ধি।

ধর্মের জগতে তিনি সর্বসমন্বয়ের প্রবর্তক। সেই প্রবর্তনের বাণীটি কি একটি ছন্দে গাঁথা ধ্বনি নয়?

'যত মত তত পথ।'

জল পড়ে পাতা নড়ে—এরই মত একটি সহজ-সরল কবিতা। কিন্তু মন্ত্রের মত জমাট। চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্তিই মন্ত্র। এই সামান্য চারটি ছন্দোবদ্ধ শব্দে কালকল্লোলের চিরন্তন ধ্বনি সংহত হয়ে আছে। একটি হীরকখণ্ডে যেন বিধৃত হয়ে আছে সপ্তসূর্যের প্রদীপ্তি।

তেমনি আবার কবিতায় গেঁথেছেন : 'যেমন ভাব তেমন লাভ।'

এ যেন যেমন সাধ তেমন স্বাদ। এ যেন যেমন ক্ষুধা তেমন সুধা।

এই তত্ত্বটিই রামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করলেন উদাহরণ দিয়ে। সহজ রেখায় ছবি এঁকে।

'তিনি অনন্ত পথও অনন্ত। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। যে কোনো রকমে হোক, ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি কাঠের সিঁড়ি, মই-দড়ি, আবার আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পারো। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। আমার কালীঘাটে যাওয়া নিয়ে কথা। কেউ আসে নৌকায়, কেউ গাড়িতে কেউ পায়ে হেঁটে। নানা নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী পড়ে গিয়ে সমুদ্রে। সমুদ্রে গিয়ে সব একাকার।'

সর্বধর্মসমন্বয়। একক্ষেত্রসম্মিলন। বিশ্বভাবের পর আবার স্ব-ভাব।

এই ভাবটিই আবার বলেছেন অন্য ভাবে :

'রাখালেরা এক-এক বাড়ি থেকে গরু চরাতে নিয়ে যায়। কিন্তু মাঠে গিয়ে সব গরু এক হয়ে যায় মিলে-মিশে। আবার সন্ধ্যার সময় যখন নিজের-নিজের বাড়ি ফেরে তখন আবার আলাদা হয়ে যায়। যার-যার নিজের ঘরে গিয়ে আপনাতে আপনি থাকে।'

তেমনি সব ধর্মের সঙ্গেই মেলামেশা, সবাইকেই ভালোবাসা। তার পরে মাঠ ছেড়ে চলে আসবে অঙ্গনে। নিজের ঘরে গিয়ে পাবে নিজের স্বস্থা, নিজের স্বধাম-শান্তি।

প্রত্যেকে মনে করে আমার পথটাই ঠিক পথ। যেহেতু আমি বলছি, আমিই জিতেছি, আর সব হেরেছে। 'কিন্তু,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'কিন্তু, কে জানে, যে এগিয়ে এসেছে সে হয়তো একটুর জন্যে আটকে গেল। পেছনে যে পড়ে ছিল সেই গেল এগিয়ে। গোলকধাম খেলায় অনেক এগিয়ে এসে শেষে পোয়া আর পড়ল না।'

তার পরেই একটি কবিত্বময় উক্তি করলেন, মনোহর উপমায় :

'হার-জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য বোঝা যায় না। দেখ না ডাব উঁচুতে

থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি। এ দিকে পানিফল জলে থাকে—গরম গুণ। আবার মানুষের শরীর দেখ। যেটা তার মূল, মানে মাথা, সেটাই উপরে চলে গেল।'

কে বুঝবে এই ঈশ্বরের লীলা? যদি বুঝতে চাও, তাঁকেই গিয়ে সরাসরি জিগগেস করো, তোমার এ লীলা কেন? তুমি কেন এত সব রচনা করেছ? কেন এত সব জীব-জগৎ, এত চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র? তিনি ছাড়া আর কে তার ঠিক-ঠিক ব্যাখ্যা দেবে?

'তাঁর খুশি।' এক কথায় বলে দিলেন রামকৃষ্ণ।

উপনিষদের সেই বিখ্যাত বাণীটিরই প্রতিধ্বনি। সবই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ। আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই যাত্রা, আনন্দেই প্রত্যাবর্তন। তাঁর আনন্দটি জেগে রয়েছে ফুলের মধ্যে গন্ধ হয়ে, ফলের মধ্যে রস হয়ে, আমাদের বুকের মধ্যে প্রেম হয়ে। দুঃখ? বলতে চাও, তোমার মত দুঃখী নেই কেউ সংসারে? সংসারে তুমি একাই দুঃখী নও। প্রত্যেকেই দুঃখী। যে ভাবেই সংজ্ঞা দাও না কেন, এই দুঃখ হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হচ্ছে না বলে। আমরা যে সুখ সন্ধান করি তার মানে ঈশ্বরকেই সন্ধান করি। চরমতম সুখ কোথাও আছে এ জ্ঞানটি আছে বলেই সন্ধানে বিরত হই না। এক থালা ভোজ্য পাবার পর আবার আরেক থালার জন্যে হাত বাড়াই। মনে হয় চরম ভোগের থালাটি এখনো পাওয়া হল না। সেই চরম ভোগ-সুখের থালাই ঈশ্বর।

শান্তি চাওয়ার নামই ঈশ্বর চাওয়া। শান্তির আরেক নাম বিরতি। আরেক নাম পূর্ণতা। তাই ঈশ্বর হচ্ছেন—বিরতির স্থির-তীর।

সেই কথাই হচ্ছিল সেদিন নন্দ বোসের বাড়িতে। কথা হচ্ছিল ঈশ্বরের কেন এত সৃষ্টির আয়োজন। কী প্রয়োজন ছিল? কেন এত ক্রীড়াকৌতুক? কী এর রহস্য? একজন ভক্ত ছিলেন কাছে বসে, কেদার চাটুজ্জে, তিনি বললেন, 'যে মিটিং-এ ঈশ্বর সৃষ্টির মতলব করেছিলেন সে মিটিং-এ আমি ছিলাম না। তাই কি করে বলব?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর খুশি।'

সব তাঁর আনন্দ। কেউ বদ্ধ হচ্ছে কেউ মুক্ত হচ্ছে কেউ ডুবছে কেউ উঠছে সব তাঁর খেয়াল। কিন্তু কেউই পৃথক-কেউ নয়। সব তিনি। তিনিই বাঁধা পড়ছেন তিনিই ছাড়া পাচ্ছেন। তিনিই তলিয়ে যাচ্ছেন তিনিই আবার মাথা তুলছেন। সব তিনি। আমি বলে কি কেউ আছে? আছে তো

তার পরিচয় কী, তার বাড়ি-ঘর কোথায়? আমি-র সন্ধান নিতে গিয়ে তিনিই বেরিয়ে পড়বেন শেষ পর্যন্ত। তাই সব আমিই একদিন তিনি-তে গিয়ে উপনীত হবে। একদিন-না-একদিন সকলেই তাঁকে জানতে পাবে, দেখতে পাবে। এক জন্ম পরে হোক বা হাজার জন্ম পরে। কত জন্ম ঘুরে এই আমি-র বাহাদুরি করবার সুযোগ পেয়েছ তার খেয়াল আছে? চূড়ান্ত চূড়ায় গিয়ে উঠতে আরো কত সিঁড়ি ভাঙতে হবে তা কে জানে। তবে এটুকু জানো, সকলেই জানতে পারবে ঈশ্বরকে, তোমার আপনার স্বরূপকে।

এ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ একটি সুন্দর উপমা দিলেন : 'কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়িতে কেউ অভুক্ত থাকে না। তবে কেউ সকাল-সকাল খেতে পায়, কেউ বা দুপুর বেলা, কারু বা সন্ধে পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।'

তবে অনিমন্ত্রিত থাকব না কেউ। কেউ হব না অপাঙক্তেয়।

পরজন্ম আছে তা হলে!

তত্ত্বের কথা যাই হোক, উপমাটি ভারি রমণীয়। বললেন :

'যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি-সরা রৌদ্রে শুকতে দেয়। ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙে দেয় তা হলে তৈরি লাল হাঁড়িগুলো ফেলে দেয় কুমোর। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার নিয়ে কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে আবার চাকে দেয়।'

মাটির বাসনের মত বাসনা যদি ভেঙে যায় ধূলি হয়ে তা হলেই মুক্তি।

জলের বিম্ব হয়ে জলে ছিলাম আবার জল হয়ে জলে মিশে যাব। জলৌকা যেমন এক তৃণ ত্যাগ করে আরেক তৃণ ধরে তেমনি এক দেহ ছেড়ে আরেক দেহ ধরব। ক্রমে-ক্রমে জন্মমরণপ্রবাহের সমুচ্ছেদ হবে। মিলবে অপবর্গ, অভয় পদাশ্রয়। তার নামই শান্তি, বিরতি, মোক্ষ।

পরজন্ম থাক এখন পরবাসে। ইহজন্মের খবর কি?

॥ ১৪ ॥

যাকে দেখা যায় না তারই জন্যে বিরহ। যাকে স্পর্শ করা যায় না সেই আবার জল-স্থল ঘর-বাড়ি দেহ-মন সব ভরে রয়েছে।

যা শীর্ণ হয় তাই শরীর। যা সরে-সরে যায় তাই সংসার।

এক দিকে কাল, আরেক দিকে সংসার। অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল, আর চিরপ্রবহমান সংসারস্রোত। কী ভাবে থাকবে এই সংসারে?

কত ভাবে কত উপমা গেঁথেছেন রামকৃষ্ণ। একেকটি উপমা একেকটি নক্ষত্র।

'নর্তকীর মতন থাকবে।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'নর্তকী যেমন মাথায় বাসন করে নাচে। পশ্চিমের মেয়েদের দেখনি? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে-হাসতে কথা কইতে-কইতে যাচ্ছে।'

'তেমনি ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করবে।'

আকাশকে মাথায় রেখে পৃথিবী যেমন কাজ করছে, ঘুরছে তার অক্ষ-দণ্ডকে আশ্রয় করে।

একটি ছন্দের মধ্য দিয়ে দেখতে চাইলেন সৃষ্টিকে। ছন্দ থেকেই বিশ্ব বিবর্তিত হচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব একটি ছন্দের পরিণাম। একটি ছন্দের প্রস্ফুরণ। গতি এগিয়ে চলেছে কিন্তু চরম লক্ষ্য হচ্ছে স্থিতি। ক্রমশই একটি অপরিবর্তনীয় ভাবের সমীপবর্তী হবার চেষ্টা। ক্রমশই সাম্য, স্থৈর্য, সন্নিধি। একটি ধ্রুব শান্তির দিকে লক্ষ্য।

গান যেমন বারে-বারে মূলে ফিরে আসে তেমনি সমস্ত গতি বারে-বারে ফিরে আসবে শরণাগতিতে। তার শান্তির মন্দিরে। দুরন্ত ক্লান্ত শিশু যেমন তার মা'র অঞ্চল-প্রান্তে।

'থাকো পানকৌটির মত।' বললেন আবার রামকৃষ্ণ। 'পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই গায়ে আর জল থাকে না।'

একটি পাখির সঙ্গে উপমা।

প্রবৃত্তির মধ্যে আছ, কিন্তু তুমি ব্রহ্মময়ীর বেটা, পঙ্ক ছেড়ে উঠে এস নিবৃত্তির গিরিচূড়ে। বারে-বারে পাখা ঝাড়া দাও। বারে-বারে মেঘ আসে, মুছে ফেল সে মেঘের মালিন্য। দেখাও তোমার সেই অগাধ নীল-কান্তি। ঝড় আনো। সমস্ত মেঘবিকার দূর করে দিয়ে দেখাও তোমার সেই সুনীল সরলতা। স্বচ্ছ অনাবরণ।

আরেকটি পাখির উপমা দেখবে?

এ কি কবিতা, না, বিরল চিত্রপট?

'সমুদ্র দিয়ে একটা জাহাজ চলেছে। কখন কে জানে একটা পাখি এসে

উড়ে বসেছিল মাস্তুলে খেয়াল নেই। চারদিকে কূলকিনারা নেই দেখে হঠাৎ তার চটক ভাঙল। তখন মনে হল ডাঙায় ফিরে যাই। যাত্রা করল উত্তরে, কোথায় উত্তর? একটি তরুরেখার দেখা নেই, তাই ফের ফিরে এল মাস্তুলে। ভাবল, দক্ষিণে বোধহয় দাক্ষিণ্য আছে, তাই আবার দক্ষিণমুখে পাখা ঝাপটালো। কোথায় দক্ষিণ! দক্ষিণও প্রতিকূল। কূলের সংকেত নেই কোনোখানে। তাই আবার মাস্তুলে এসে হাঁপ ছাড়ল। তারপর, এবার চলল পূবে। পূবেও পূর্ববৎ। শুধু জলের একটানা শুভ্রতা। শ্যামলিমার লেশ নেই। আবার উড়ে এসে মাস্তুল ধরল। সব দিক হল, পশ্চিম দেখতে দোষ কি। হয়তো সেদিকেই মিলবে রঙিন বৃক্ষ-শাখা। হায়, প্রতীচীও পরাঙমুখ। তখন পাখি আর কি করে! মাস্তুলের উপরেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ল। আর কোনো দিকে চায় না, কোনো দিকে যায় না। ভাবে, সমুদ্রে এই মাস্তুলই আমার স্থির আশ্রয়। সংসার-সমুদ্রে সমস্ত দিক ঘুরে সমস্ত দিক ত্যাগ করে বোসো এসে বৈরাগ্যের একাসনে।'

আরো একটি পাখি আছে। তার নাম হংস। হংসের এক অর্থ পরমাত্মা। আরেক অর্থ প্রাণবায়ু। পরমাত্মাই প্রাণবায়ু।

বললেন, 'জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মত দুধটি নিয়ে জলটি ত্যাগ করো।'

পিঁপড়ের যখন পাখা হয়, তখন সে কি পাখি হয়? সেটা তখন তার অহঙ্কারের পাখা, তাই সে তখন মরে। কিন্তু এমন যখন সে ক্ষুদ্র পিপীলিকা, তখন তার থেকেও শেখবার জিনিস আছে।

তার আগে, তার পায়ে যে নূপুরের শব্দ হয় তা জানো? সে নূপুরের শব্দ শুনেছেন রামকৃষ্ণ। বলেছেন, 'ঈশ্বর উৎকর্ণ হয়ে আছেন। তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরগুঞ্জন শুনতে পান।'

তেমনি তিনি শুনছেন আমার হৃদয়-ঘড়ির টিকটিক। রক্তের রুনু-ঝুনু।

এ হেন যে পিঁপড়ে সে কখনো তুচ্ছ হতে পারে না। সে আমাদের গুরু।

'পিঁপড়ের মত সংসারে থাকো। বালিতে-চিনিতে মিশিয়ে রয়েছে সংসারে। নিত্যে আর অনিত্যে। বালিটুকু ছেড়ে চিনিটুকু নাও।'

একটি মিষ্টতার সঙ্গে ঈশ্বরস্বাদের তুলনা দিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কি শুধু মধুরের বৃষ্টিধারা?

ক্ষুধার দুঃখ ছাড়া ভোজনের সুখ কই? সারা দিন মন যদি উন্মনা না হয়, তবে কিসের মিলনসন্ধ্যা? যদি ঊন না থাকে তবে কিসের পূর্ণ?

না, ঈশ্বর একটি ব্যথার মত। নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা। নিদ্রাহীন নিরঙ্কুশ ব্যথা।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'দাঁতের ব্যথার মত।'

এমন কোনো যন্ত্রণা নয় যে বিছানায় নিশ্চল করে রাখে। হাত-পা সুস্থ, তাই ব্যথা সয়েও কাজ করতে হয়, কিন্তু যাই কাজ করো, সর্বক্ষণ মন পড়ে থাকে ব্যথার দিকে।

তেমনি দু হাতে কর্তব্য করে যাও কিন্তু মন রাখো সেই ব্যথার দিকে। ঈশ্বরের দিকে। এমন ব্যথা নয় যে তোমাকে কাজ থেকে ছুটি দিচ্ছে—অথচ এমন ব্যথা যে তোমাকে একদণ্ডও ভুলে থাকতে দিচ্ছে না। ঈশ্বর তোমাকে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, অথচ নিয়ত জাগ্রত হয়ে আছেন একটি নিরুচ্ছেদ ব্যথার মত।

ব্যথা হয়ে প্রথম মনে করান, পরে মন ভোলান আনন্দ হয়ে। যে ব্যথা সেই উপশম। যে ব্যাধি সেই চিকিৎসা। ব্যথা আর আনন্দের মধ্যে মন হচ্ছে পারাপারের সেতু। এই হাটে ব্যথা তো ঐ হাটে আনন্দ।

ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতাটা তিনি বুঝিয়েছেন আরেকটি তীক্ষ্ণ উপমা দিয়ে :

'সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মতো থাকো।'

নষ্ট স্ত্রী নীরবে হাসিমুখে ভালোমানুষটির মত ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু মন পড়ে রয়েছে উপপতির উপর। কেউ জানতেও পাচ্ছে না তার মনের চঞ্চলতা, তার মনের ঔৎসুক্য। চোখ দুটি তার সমস্তক্ষণ পিপাসু হয়ে রয়েছে কখন তার বন্ধুর সে একটি ইশারা পায়। গায়ের রক্ত উৎকর্ণ হয়ে আছে কখন তার একটি শব্দ শোনে। নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে আছে কখন বাতাসে আসে তার একটি সুবাসের আভাস।

তেমনি সর্বক্ষণ উচাটন হয়ে থাকো। থেকে-থেকে ঈশ্বরের সংকেতটি কুড়িয়ে নাও। বেণু কোথায় কে জানে, তার ধ্বনিটি শোনো। দীপ কোথায় কে জানে, তার আলোটি দেখ। তোমার আশে-পাশে, সংসারের চার দিকে, গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে কত ইশারা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতীক্ষায় চক্ষুষ্মান হও। বৃষ্টিবিন্দুতে দেখ সেই আকাশের প্রতিবিম্ব।

সংসারে অভ্যাগত এই যে একটি নবজাত শিশু—এর মুখের হাসিটি

কার হাসি? প্রথম মমতার স্পর্শে মা'র চোখে যে কোমলবিহ্বল দৃষ্টি, এটি কার দৃষ্টি? তুমি না দেখবে তো তোমার জানলার ওপারে চাঁদ কেন? তুমি যদি না শুনবে তবে সমুদ্র কেন মাথা কুটে মরছে? তুমি ঘরে এসে স্তব্ধ হলেও সে কেন স্তব্ধ হচ্ছে না? কোন অজানা অরণ্যে বিজনে যে একটি ফুল ফুটেছে সে তো তুমি একদিন এসে দেখবে বলেই। এবারের বসন্তটি চলে গেল। ভয় নেই, তুমি যদি দেখ সে আশায় আবার সে আসবে। নিয়ে আসবে তার মুহূর্তের প্রজাপতি। তুমি দেখবে সেই আনন্দে আবার সে ফুল ফোটাবে, রঙ ধরাবে, উঁকিঝুঁকি মারবে। বারে-বারে তাকে ফিরিয়ে দিলেও সে ফেরে না। শুধু অপেক্ষা করে। ঝরা-পাতার কান্নার পর পুঞ্জ-পুঞ্জ কিশলয় হয়ে কচি-কচি আঙুলে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যদি তুমি সাড়া দাও। দিনে-রাত্রে তারায়-তৃণে তোমাকে অসংখ্য চিঠি লেখে, যদি মন-কেমন-করা ভাষায় কখনো একটা উত্তর দিয়ে ফেল।

॥ ১৫ ॥

রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ।'

জোরদার ভাষায় একটি বাস্তব বর্ণনা দিলেন : 'দহে একবার নৌকো পড়লে আর রক্ষে নেই। শেঁকুল কাঁটার মত একটা ছাড়ে তো আরেকটা জড়ায়। গোলকধাঁধায় একবার ঢুকলে বেরুনো মুশকিল। মানুষ যেন ঝলসা-পোড়া হয়ে যায়।'

তবুও মানুষ ঢোকে। জেনে-শুনে চোখ-কান খোলা রেখেই ঢোকে। জানে কোথায় যাচ্ছে তবু ফেরবার উপায় নেই।

'উটের মত।' রামকৃষ্ণ উপমা দিলেন : 'উট কাঁটা ঘাস বড় ভালোবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে তত রক্ত পড়ে দরদর করে। তবু সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না।'

এইটেই মানুষের ট্র্যাজেডি। যদি সে না-বুঝত না-জানত, যদি সে মাত্র একটা কায়িক যন্ত্র হত, তবে হয়তো জমত না এই বিয়োগান্ত নাটিকা। সে জানে-শোনে-বোঝে, তবু আগুনে হাত দেয়, শৃঙ্খল পরে, সুখের আশায় বাসা বাঁধে।

কী সুন্দর বর্ণনা দিলেন।

'পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরবার জন্যে বিলের ধারে বা মাঠে ঘুনি পাতে। ঘুনির মধ্যে জল চিকচিক করে দেখে ছোট মাছগুলির ভারি ফুর্তি। সুখের আশায় ঢোকে গিয়ে সেই ঘুনির মধ্যে। যে পথে ঢুকেছে সে-পথেই বেরিয়ে আসতে পারে ইচ্ছে করলে, কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দে আর অন্য মাছের সঙ্গে খেলায় ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টাও করে না। পরে প্রাণে মরে।'

এই সংসারের চাকচিক্য। নয়নহরণ প্রচ্ছদপট। সার নেই, শুধু সঙের মিছিল। তাই আবার ছন্দ গেঁথেছেন :

'সংসার হচ্ছে আমড়া। আঁটি আর চামড়া।'

তারপর সেই 'কৌপীনকা ওয়াস্তে'-র গল্পটি মনে করো :

'সামান্য কুটির বেঁধে সাধন-ভজন করে এক সাধু। জগতে সম্বলের মধ্যে একটি কাপড় আরেকটি কৌপীন। হয়তো দিনে ভিক্ষায় বেরিয়েছে কিংবা রাতে ঘুমিয়েছে ইঁদুর এসে কৌপীন কেটে দেয়। গৃহস্থের দুয়ারে বস্ত্রখণ্ড ভিক্ষা করতে লাগল সাধু। কাঁহাতক কে কাপড় দেবে, সবাই বললে, ইঁদুর তাড়াবার জন্যে বেড়াল পুষুন। মন্দ কি। সাধু বেড়াল পুষল। কিন্তু বেড়ালকে খাওয়ায় কি? দুধ ভিক্ষা করতে বেরুল সাধু। কিন্তু কাঁহাতক লোকে দুধ দেবে? পরামর্শ দিলে, গাই পুষুন। সেই ভালো। বেড়ালকে দিতে পারবে, নিজেও খেতে পাবে কিছুটা। গাই কিনে আনল সাধু। কিন্তু গরুর আবার খড় দরকার। খড়ের জন্যে আবার ভিক্ষায় বেরুল। কাঁহাতক লোকে খড় দেবে? কুটিরের সামনে পোড়ো জমি আছে তাতে চাষ করুন। বহুৎ আচ্ছা। সাধু চাষ দিয়ে ধান ফলালো। এখন ফসল তোলে কোথায়? মস্ত এক গোলাবাড়ি তৈরি করলে। এমন সময় সাধুর গুরু এসে উপস্থিত। চারদিকের কাণ্ড-কারখানা দেখে তাজ্জব বনে গেল। জিগগেস করলে, এ সব কি? সাধু অপ্রতিভ মুখে বললে, প্রভুজী, সব এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।'

এইখানেই ট্র্যাজেডি। এইখানেই গল্পরচকের রসবোধ। গুরুর মুখ দিয়েই তিরস্কার করানো যেত : তুমি এ সব কী করেছ? তুচ্ছ একটা কৌপীনের জন্যে এত মেহনৎ, এত আয়োজন? না, গুরুকে দিয়ে বলালেন না, সলজ্জমুখ শিষ্যকে দিয়েই বলালেন, প্রভুজী, এক কৌপীনকা ওয়াস্তে। তার মানে যখনই সাধু বেড়াল কিনেছে তখনই জেনেছে, ফাঁদে পা দিলুম। ফাঁস দিলুম গলায়। ফাটকে আটক পড়লুম।

তেমনি আমরাও জেনে-শুনে সংসারের পিঞ্জরে এসে ঢুকছি। একটার পর একটা জিনিস জমা করছি। ভারের পর আবার সম্ভার, সঙ্গের পর আবার অনুষঙ্গ। একটা জিনিসের জন্যে আরেকটা জিনিস। স্তূপের পর স্তূপ। শুধু প্রাণহীন প্রয়োজনের আয়োজন।

কিন্তু যত কিছু দিয়েই না ঘর সাজাই, শূন্য দেখায়, শুকনো দেখায়। সে ঘরে ঈশ্বরকে আনা হয়নি। ঈশ্বরকে আনলে ঘর এমনিতেই পূর্ণ হয়ে থাকত। জিনিস রাখবার আর জায়গা হত না।

সংসারকে আবার বলেছেন, 'কাজলের ঘর। কাজলের ঘরে যতই সেয়ানা হও না কেন, একটু না একটু দাগ লাগবেই।'

তা লাগুক। উপায় নেই। কেননা, রামকৃষ্ণেরই কথায়, 'যে বাটিতে রশুন গুলেছে সে বাটি হাজার ধোও, রশুনের গন্ধ যায় না।' তা না যাক, তবু ধোও। কি দিয়ে ধোবে? চোখের জল দিয়ে। চোখের জল দিয়ে যদি ধোও, মুছে যাবে কাজলের দাগ, দূরে যাবে রশুনের গন্ধ।

মানুষের মন কী!

রামকৃষ্ণ বললেন, 'মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলি।'

এমন একটি ব্যঞ্জনাময় উপমা নেই আর বাংলা ভাষায়। ঐ পুঁটলিটির মধ্যে বিস্ময়রসের রহস্য ভরা।

নিজেই বুঝিয়ে দিলেন। 'সরষের পুঁটলি যদি একবার ছড়িয়ে যায় তবে তা কুড়োনো ভার হয়ে ওঠে। তেমনি মন যতই কামে-কাঞ্চনে ছড়িয়ে যাবে ততই তাকে গুটোনো শক্ত হবে।'

তাই পুঁটলির ফাঁসটা সম্পূর্ণ খুলে দিও না। মনের কিছু সঞ্চয় পুঁটলির মধ্যে জমা রাখো। দেখছ না বালকের মন? পুঁটলির গ্রন্থি তার আঁট, কোনো কিছুতেই তাই তার আঁট নেই। তার মন সে ছড়িয়ে দেয়নি, দেয়নি বিলিয়ে।

কিন্তু উপায় কী? যখন থাকতেই হবে সংসারে, তখন কী ভাবে থাকবে?

'কচ্ছপের মতন থাকো। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু ডিম থাকে আড়াতে। যেখানে ডিম সেখানেই তার মন পড়ে থাকে।'

আরো একটি সুন্দর উপমা দিলেন অন্য উপাদানে। এবারে একটি মনিব-বাড়ির ঝিয়ের উপমা।

'ঝি মনিবের বাড়িতে চাকরি করছে মন দিয়ে। মনিবের বাড়িকেই

আমার বাড়ি বলছে। কিন্তু মন পড়ে আছে তার দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলে হরিকে মানুষ করছে, আর বলছে, আমার হরি। হরি আমার ভারি দুষ্টু হয়েছে, হরি আমার মিষ্টি খেতে একদম ভালোবাসে না। মুখে আমার হরি বলছে বটে, কিন্তু মনে বলছে ও আমার কেউ নয়। ওর মন পড়ে আছে দেশের বাড়িতে যেখানে হয়তো আছে ওর নিজের পেটের ছেলে।'

এ পৃথিবী পান্থনিবাস। রেলস্টেশনের যাত্রীখানা। কিংবা ধরো চাঁদনিবাজার। কাজ শেষ হলেই দেশে যাব। বাজার থেকে সওদা করে নিচ্ছি। কিন্তু যা সওদা করছি তা কি দেশে যাবার পাথেয়?

বিদেশভ্রমণে গেলাম, কিন্তু মন ঠিক আছে, বাড়ি ফিরব। প্রবাসবাসই আমার স্ববাস নয়। মন পড়ে আছে কতক্ষণে মাকে গিয়ে দেখব, দেখব আমার আর সব প্রিয়জন। পাব ফিরে আমার স্বাভাবিক পরিবেশ। ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকেই যাই, অলি-গলি যেখানেই ঘোরাফেরা করি মন খাঁটি করে রেখেছি কোথায় আমার বাড়ি-ঘর। কিন্তু এই যে দু-দিনের জন্যে এসেছি এই পৃথিবী-প্রবাসে, হাটে ঘুরে-ঘুরে ভুষিমাল সওদা করছি, এর পর কোথায় যাব? সমস্ত গমনাগমনের অবস্থাতেই একটা গন্তব্যের কল্পনা আছে, শুধু এই মর্তযাত্রার পরিশেষেই কোনো আশ্রয়-আচ্ছাদন নেই? জংশন-স্টেশনে যখন গাড়ি বদল করব তখন সে-গাড়ি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? যেখানে আমাদের নিয়ে যাবে সেখানেই কি আমাদের আসল বাড়ি নয়? সেখানেই কি আমাদের মা দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে নেই আমাদের পথ চেয়ে? সব বাড়ির ঠিকানা জানি, আর এ বাড়িরই ঠিকানা জানব না? সে ঠিকানা তারার অক্ষরে আকাশময় লেখা হয়ে আছে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'সংসার জল আর মনটি যেন দুধ। দুধ যদি জলে ফেলে রাখো, দুধের আর পাত্তা পাবে না। তা হলে কী করবে? দুধকে দই পেতে মন্থন করে মাখন করবে। মাখন করে ফেলে রাখো জলের উপর। ভাসো। জ্ঞানভক্তিতে ঘনীভূত হয়ে ভাসো সংসারসমুদ্রে।'

একেই আবার বলেছেন, 'থাকো পাঁকাল মাছের মত। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁকের চিহ্ন নেই। গা পরিষ্কার, ঝকঝক করছে।'

উপমার মধ্যে কত বৈচিত্র্য!

থাকবে যে, করবে না কিছু? কী করলে তেমন-তেমন থাকা হবে?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙবে। হাতে তেল মেখে নিলে আঠা আর জড়ায় না।'

এই তেল হচ্ছে ঈশ্বরভক্তি। সমস্ত মনে রগরগে করে ঈশ্বরভক্তির তেল মেখে নেবে। তা হলেই আর আসক্তিতে আঠার মত আটকে থাকবে না সংসারে।

সংসারে কাজ করতে এসেছ কাজ করে যাও, কিন্তু মন রাখো মুষলের দিকে। এবার উপমা দিলেন ঢেঁকির।

'ও দেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকি দিয়ে চিঁড়ে কাঁড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকি টেপে, আরেকজন নেড়ে-চেড়ে দেয়। হুঁস রাখে যাতে ঢেঁকির মুষলটা হাতের উপর না পড়ে। এ দিকে ছেলেকে মাই দেয়, আরেক হাতে বা খোলায় ভিজে ধান ভেজে নেয়। ওদিকে আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কচ্ছে—তোমার এত বাকি আছে দিয়ে যেও।'

একটি অপূর্ব চিত্র। ঈশ্বরে মন আকৃষ্ট রাখবার একটি অভিনব দৃষ্টান্ত। শুধু দাঁড় টেনে যাও, চোখ রাখো ধ্রুব তারার দিকে।

মোট কথা, চার দিকে গোলমাল। তা হোক। রামকৃষ্ণ বললেন, 'গোলমালের মধ্যেও বস্তু আছে। গোলমালের গোল ছেড়ে মালটি নেবে।'

এমন সহজ করে আর কি কোথাও বলা আছে? সংক্ষিপ্ততার মধ্যে আর কোথাও কি আছে এমন সন্দীপ্তি?

॥ ১৬ ॥

কিন্তু যতই বলো, 'থাকো ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে'—এ তুলনার তুলনা নেই।

যেমন আশ্চর্য তেমনি অদ্ভুত। মৌলিকতায় দুঃসাহসিক।

চারদিকে এলোমেলো ঝড় বইছে। আর এই সংসারের ভোজন-শালা থেকে বেরিয়ে আসা এঁটো পাতা ছাড়া আর আমরা কী!

একবার বলেছেন, নষ্ট স্ত্রী। এবার বললেন, উচ্ছিষ্ট পাতা।

প্রথমটা উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা বোঝাবার জন্যে। দ্বিতীয়টাতে বোঝালেন শরণাগতি, সর্বসমর্পণের আনন্দ।

'এঁটো পাতা পড়ে আছে বাইরে—যেমন হাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি উড়ে যাচ্ছে। কখনো ঘরের ভিতর, কখনো বা আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায় পাতাও সেই দিকে যায়। কখনো ভালো জায়গায় কখনো মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, এখন সেইখানেই থাকো। আবার যখন সেইখান থেকে তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবেন, তখন যা হয় হবে। চৈতন্যবায়ু যেমনি মনকে ফেরাবে তেমনি ফিরবে।'

একেই বলে শরণাগতি। শরণাগতি নিষ্ক্রিয়তা নয়, নিষ্কামক্রিয়তা। কাজের জন্যে কাজ করা, ফলের জন্যে নয়। খেলার জন্যে খেলা, জিতের জন্যে নয়। ফল যদি জোটে, ভালো; যদি না জোটে তাও ভালো। যদি জিতি আনন্দ আছে, যদি হারি আপত্তি নেই। এরই নাম শরণাগতি।

আমি করছি, গড়ছি, লড়ছি। তবু জানি তোমার হাতের জয়মালা আমার জন্যে নয়। না হোক, দুঃখের নির্দয় রুক্ষতা সইতে আমাকে যে তুমি ডেকেছ সেই তো তোমার দয়া। রেখেছ যে আমাকে ক্ষমাহীন সংগ্রামের কাঠিন্যে সেই তো তোমার কোমলতা। আমি তোমার নির্বাচিত। তোমার চিহ্ন বহন করবার জন্যেই বইছি এত প্রসন্ন প্রহার। ক্ষতের ব্রত উদ্‌যাপন করছি। আমি নইলে আর কে পেত তোমার মনোনয়ন? আমার জয় নয়, আমার অভয়। আমার বিলাস নয়, জীবনোল্লাস। মনোনয়ন কি আর সাধে পেয়েছি? আমার মনের মধ্যে তোমার নয়ন দুটি নিত্য হয়ে রয়েছে।

এই শরণাগতির ভাবটি আবার ফুটিয়েছেন আদালতের ভাষায়। বললেন, 'ঈশ্বরকে আমমোক্তারি দাও।'

বলেই বাঁদর-বেড়ালের দৃষ্টান্ত দিলেন। বললেন, 'বাঁদরের বাচ্চা হয়ো না, বেড়ালের বাচ্চা হও।'

একটি সার্থক কবিতা। ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী।

বাঁদরের বাচ্চা কি করে? এক ডাল থেকে লাফিয়ে আরেক ডালে সে তার মাকে ধরতে যায়। কখনো-কখনো ঠিক মাপ বুঝে লাফ দিতে পারে না, ডাল ফসকে পড়ে যায় মাটিতে। মাটিতে পড়ে গিয়ে কিচিমিচি করে।

আর বিল্লির বাচ্চা করে কি! বিল্লির বাচ্চা শুধু মিউ-মিউ করে ডাকে। কোনো কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই। কোথায় যাবে কি করবে কিছুই জানে না। তার মা এসে তার ঘাড় কামড়ে ধরে যেখানে নিয়ে যাবে সে সেখানেই রাজী। কোনো বিতর্ক নেই বিরুদ্ধতা নেই। প্রতিবাদ নেই

পরিবাদ নেই। কখনো নিয়ে যাচ্ছে ছাইয়ের গাদায়, পুঞ্জীকৃত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে—কখনো বা হেঁশেলে আখার ধারে, মধ্যবিত্ত উত্তাপ ও বিপন্নতার মধ্যে, যেখানে উষ্ণতা আছে আবার গিন্নির হাতে ঠ্যাঙা খাবারও ভয় আছে—কখনো বা বাবুদের বিছানায়, দুগ্ধফেননিভ শুভ্র আভিজাত্যে, কোমল-উচ্ছল বিলাসিতায়।

আমি কি জানি কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। আমি যে একা-একা যাচ্ছি না, পায়ে-পায়ে তুমি যে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছ এইটুকুই আমার সাহস, এইটুকুই আমার সান্ত্বনা। দারুণ-পিশুন খরতাপের মধ্য দিয়ে নিয়ে চলেছ, চলেছি একটানা—জানি না কোথায় তোমার বৃক্ষছায়া। তুমি আমার কাছে ছায়া হয়ে আসোনি, এসেছ রৌদ্র হয়ে। শান্তি হয়ে আসোনি, এসেছ ক্লান্তি হয়ে। তোমার কৃপা দেখা দিয়েছে কষ্টের মূর্তিতে। আমাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, পূব-দিগন্তে নেই তোমার জ্যোতির মন্ত্রোচ্চার। না থাকুক, এই অন্ধকারই তোমার উচ্চারণ। আমার অমাবস্যা, উন্নিদ্র রাত্রির নিস্তপন তপস্যা। সেই তপস্যাতেই আমার সূর্য-সৃষ্টি।

আমার যত ভার সে হচ্ছে অপহার। তোমার যত ভার সে হচ্ছে উপহার। আমার নিজের জন্যে কান্না সে হচ্ছে আর্তনাদ, আর তোমার জন্যে কান্না সে হচ্ছে সংগীত।

আমি বৃষ্টিহীন মরুভূমি। হে জীবন্ত সবুজ, হে জ্বলন্ত সবুজ, তোমার স্পর্শে আমাকে শ্যামায়মান করো।

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুই তাকে ধরিস না, এমন কর যেন সে তোকে ধরে।'

কবির গভীর ভাবে ভরা এই কথাটি।

যদি নিজের থেকে তোমাকে ধরি তবে নিজের থেকেই তোমাকে কখন আবার ছেড়ে দেব। যতক্ষণ কণ্টকে আছি ততক্ষণ তুমি আছ একটি শাণিত নিশ্চিতির মতো। যেই আবার কুসুমে যাব অমনি আবার ডুবে যাব সুকোমল বিস্মৃতিতে। যতক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকবে দুঃখের অমানিশা ততক্ষণই জেগে থাকবে আমার জাগ-প্রদীপ। যেই উৎসারিত হয়ে পড়বে সুখের সূর্যালোক অমনি ঘৃতের প্রদীপটি নিবিয়ে দেব ফুঁ দিয়ে। ভাবব এ আলো বুঝি আমার অহংকারের অলংকার। কিন্তু আবার মিলিয়ে যাবে এ জলের আলপনা। চকিত-চিত্রিত রামধনু। হায়, যতক্ষণ

ভালো আছি ততক্ষণ ভুলে আছি। যখনই আবার মন্দে যাব তখন আবার মৃদুমন্দ তোমার গন্ধ এসে গায়ে লাগবে।

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'এমন এক অবস্থা সৃষ্টি কর যাতে সে তোকে ধরে। সে যদি একবার ধরে, তাহলে সে আর কখনো ছেড়ে দেবে না।' বলে এক গল্প ফাঁদলেন :

'সরু আল পথ দিয়ে বাপ দুই ছেলেকে নিয়ে চলেছে। বড় ছেলেটি সেয়ানা বলে নিজেই বাপের হাত ধরেছে। আর ছোট ছেলেটিকে বাপ আরেক হাতে বুকে করে নিয়ে চলেছে। সে দাদার মত সেয়ানা নয়, স্বাধীন নয়, সে আছে বাপের নির্ভরের দুর্গে। তারপর হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক শঙ্খচিল উড়ে গেল—'

আকাশের নীল দিঘিতে ফুটে উঠল গুচ্ছ-গুচ্ছ শ্বেতপদ্ম। রামকৃষ্ণ যে কবি এই শঙ্খচিলই তার প্রমাণ।

'পাখি দেখে দুই ভাই হাততালি দিয়ে উঠল। তার মানে, দু ভাই-ই হাত ছেড়ে দিল। তার ফল হল কি? হাত-ছাড়া বড় ভাই পড়ে গেল নিচে, পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠল। আর ছোট ভাই? সে নিঃশঙ্ক। সে কিছুতেই পড়বে না। তাকে বাপ ধরে আছে। সে স্বচ্ছন্দে হাততালি দিয়ে যাবে।'

সম্পদে-বিপদে, পদে-পদে, ঈশ্বর আমাকে ধরে থাকুন। নয়ন নিজেকে দেখতে পায় না। তাই যিনি নয়নের মাঝখানে ঠাঁই নিয়েছেন তাঁকে কী করে দেখব? তিনি থাকুন আমার দর্পণ হয়ে। নয়নে-নয়নে তাঁকে দেখি।

রামকৃষ্ণের প্রথম কাব্যচেতনা এসেছিল মেঘের কোলে ওড়া এই উড়ন্ত বকের ঝাঁক দেখে। রামকৃষ্ণ তখন ছ বছরের ছেলে, কোঁচড়ে করে মুড়ি খেতে-খেতে চলেছে গাঁয়ের আল-পথ দিয়ে। আকাশে নিকষ-ঘন নিবিড় কালো মেঘ জমেছে। হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল রামকৃষ্ণ। দেখল সেই দলিত-অঞ্জন মেঘের প্রান্ত ঘেঁষে এক ঝাঁক শাদা বক উড়ে চলেছে। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেল চোখ দুটি। ভাবল এই দুটি কবিতার পঙক্তি কার রচনা, কে লিখেছে এই শাদা-কালোর, অশ্রু-আনন্দের শ্লোক? একটি পঙক্তি কৃষ্ণ মেঘশ্রেণী, আরেক পঙক্তি শ্বেত হংসবলাকা। দুয়ে মিলে এক বিচিত্র দি[illegible]।

কোথায় চলেছে এই বকের পাঁতি? কোন নিরুদ্দেশের সন্ধানে? দিনের শেষে কোন সুন্দর অন্ধকার ওদের ডাক দিল? পথ দেখাল?

তেমনি আমার মন যে ভোলাল সে কোথায়? চিনি নে, জানি নে, বুঝি নে, তবু তার দিকে প্রাণ-মন ছুটে চলে। সে কি একটুখানি দিয়ে ভুলিয়েছে? অজস্র হয়ে অকৃপণ ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছে দশ দিকে। কত সুধা কত সুখ কত শোভা কত সুর! তাই না ছুটে চলেছি মেঘের কোলে ঘরছাড়া বকের পাঁতির মত! অন্ধকারে তার দেখা পাব কিনা জানি না, তবু তাকে দেখতে যে যাত্রা করেছিলাম একদিন, সেই যাত্রার ছন্দটুকু কম্পিত হোক আমাদের পাখার আন্দোলনে!

শরণাগতির আরেকটি গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ।

'বনে ভ্রমণ করতে-করতে পম্পা সরোবরের ধারে চলে এসেছে রাম-লক্ষ্মণ। স্নান করতে নামবে, লক্ষ্মণ সরোবরের পারে মাটিতে তার ধনুক পুঁতে রাখল। স্নানের পর উঠে এসে লক্ষ্মণ ধনুক তুলে দেখে ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি? রাম বললে, ভাই, দেখ-দেখ বোধ হয় কোনো জীবহিংসা হল। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখল মস্ত একটা কোলা ব্যাঙ। মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণ স্বরে বললে ব্যাঙকে লক্ষ্য করে, তুমি শব্দ করলে না কেন? শব্দ করলে আমরা জানতে পারতাম, তা হলে তোমার আর এমন দশা হত না। যখন সাপে ধরে তখন তো খুব চেঁচাও। ব্যাঙ বললে, রাম, যখন সাপে ধরে, তখন রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো, বলে ডাকি। এখন দেখছি স্বয়ং রামই আমাকে ধরেছেন। তাই চুপ করে আছি।'

একেই বলে দুঃখে-মরণে স্থির বুদ্ধি। একেই বলে আত্মসমর্পণ।

॥ ১৭ ॥

মানুষ কে?

রামকৃষ্ণ একটি বিস্ময়কর সংজ্ঞা দিলেন। বললেন, 'মান-হুঁস মানুষ।' যার নিজের মান সম্বন্ধে হুঁস আছে সেই মানুষ।

মানুষের মধ্যে যে যমক ছিল সেটা লাগে এসে চমকের মত। যেমন, 'যে শিরদার সে সরদার,' তেমনি 'যে মান-হুঁস সে মানুষ।'

কিসের মান?

আমি প্রকাণ্ড রাজা-রাজড়ার ছেলে সে মান নয়, আমি অমৃতের

সন্তান। আমি অনৃতের সন্তান নই, আমি অমৃতের সন্তান। আমি নিষ্কিঞ্চন নই, আমি সর্বেশ্বর। চাই এই বোধশক্তি। এই চৈতন্যের প্রাণনা।

কিন্তু আমি যদি তাঁর ছেলে তবে আমার এই দীন বেশ কেন? কেন শুধু আমার দিনগত পাপক্ষয়?

রামকৃষ্ণের আবার একটি মন্ত্রোর মত সূক্তি।

'রাজার বেটা হ, ঠিক মাসোয়ারা পাবি।'

আমরা কি রাজার বেটা হয়েছি? সেই রাজটিকা কি পরেছি? আমাদের রক্তে লিখে নিয়েছি কি সেই স্বাক্ষরের ঔজ্জ্বল্য? যদি তাই নিতাম, তবে জীর্ণ নির্মোকের মত খসে যেত এই দীনসাজ। উত্তীর্ণ হতাম এক জ্যোতির্ময় উদ্ঘাটনে।

'একটি ছোকরা সন্ন্যাসী গৃহস্থ বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েছিল।' রামকৃষ্ণ গল্প বললেন, 'সে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছু জানে না। গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে তাকে ভিক্ষে দিলে। সন্ন্যাসী বললে, মা, এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে? মেয়েটির মা বললে, না বাবা। ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তন করে দিয়েছেন—ঐ স্তনের দুধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তখন বললে, তবে আর ভাবনা কি! আমি আর কেন তবে ভিক্ষে করব? যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে খেতে দেবেন।'

এ কি সত্য?

এক হাতে কাজ করছি আরেক হাতে তাঁকে ধরে আছি। কিন্তু যখন একদিন দু হাত ছেড়ে দিতে পারব তখন কি তিনি নুয়ে পড়ে আমাকে তুলে ধরবেন না?

কিন্তু দু হাত ছেড়ে যে দেব, তিনি কি আছেন?

প্রত্যেক ছন্দোবদ্ধ কবিতার একজন কবি আছে আর এ সৃষ্টি-কবিতার একজন কাব্যকর্তা নেই? নেই তো এত ছন্দ কেন, এত ঐক্য কেন, বৈচিত্র্যের মধ্যেও কেন এত পারম্পর্য? এই ঋতুর পর্যায়, গ্রীষ্মের পর বর্ষা আবার শীতের পর মধু-মাস। এই বয়সের ক্রমান্বয়, বাল্যের পর কৈশোর, কৈশোরের পর যৌবন! কেন বা একটি অবধারিত অবসান! যেখানে এমন একটা রীতির দৃঢ়তা, সেখানে কি একজন নিয়ন্তা নেই? সে গৃহে আমরা সহজেই একজন গৃহস্বামী কল্পনা করি যে গৃহে আলো জ্বলে, যে গৃহের ঘর-দোর সাজানো-গোছানো। তবে, এই বিশ্বসৃষ্টির ঘরে এত যে আলো জ্বলছে, সূর্যে-চন্দ্রে আর নক্ষত্রে, সে ঘরের কি একজন

কেউ কর্তা নেই? যেখানে এত সৌষ্ঠব এত পারিপাট্য সেখানে কি নেই কোনো কারিগর? গ্রন্থ আছে প্রণেতা নেই, চিত্র আছে শিল্পী নেই, এ কখনো শুনিনি।

অকূল সমুদ্রে যতক্ষণ আস্ত গাছ ভেসে এসেছে, বলেনি কিছু কলম্বস। কিন্তু যেই কাটা কাঠের টুকরো একটা ভেসে আসতে দেখল তখন সে উল্লাসে লাফিয়ে উঠল। কাটা কাঠের টুকরো যখন, তখন নিশ্চয়ই আছে একজন কর্তক। সেই আশ্বাসেই ঢেউ ভাঙল। মিলল একদিন আমেরিকার মাটি।

তেমনি এ পৃথিবী যদি কারু ছিন্ন পাতার তরণী হয়, তবে এর পেছনেও আছে একজন নির্মাতা। খামখেয়ালী বলতে চাও, বলো, কিন্তু আছে একজন নিয়ামক। ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে আসা অকারণ দুর্ঘটনা বলতে পারো না। দুর্ঘটনাই যদি হবে, তবে রোজ সূর্য উঠবে কেন, কেন সকলে মরবে? এমনও তো হতে পারত, একদিন সূর্য উঠল না, কে একজন অমর হয়ে রইল। তা যখন নেই তখন বলো একটা কিছু আছে। সে একটা কী, নাম দাও। বলতে চাও, বলো, শক্তি, প্রকৃতি, নীতি, কিংবা যা আর তোমার মনে ধরে। আমি নামের মধ্যে অন্তরঙ্গতার একটু সুর মিশাই। তোমরা তাকে পোশাকী নামে ডাকো, আমি ডাকি ডাক-নামে। আমি বলি, হরি, রাম, কৃষ্ণ। হরি মানে যে মনোহরণ করে। রাম মানে যে রমণীয়, নয়নাভিরাম। কৃষ্ণ মানে যে নিরন্তর আকর্ষণ করে তার দিকে।

তোমরা জজসাহেব বলো, আমি তার কোট-কলার-গাউনের অন্তরালের মানুষটিকে খুঁজি, ডাকি তাকে অমুক বাবু বলে।

কিন্তু, যে নামই দাও, তাকে কি দেখা যায়?

তৃপ্তিকর ভাষায় বললেন রামকৃষ্ণ: 'দিনের বেলায় তো তারা দেখা যায় না, তাই বলে কি বলবে তারা নেই? যদি তারা দেখতে চাও দিনান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করো। দুধে যে মাখন আছে তা কি দুধ দেখে ঠাহর হয়? যদি মাখন দেখতে চাও তবে দুধকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে দই পাতো। তারপর সূর্যোদয়ের আগে সে দই মন্থন করো। তবেই দেখতে পাবে মাখন।'

একটি বাস্তবধর্মী কবিতা।

কাঠে আগুন আছে শুধু এ তত্ত্বে তো ভাত রান্না হবে না। কাঠের সহিত আগুনকে নিষ্কাশিত করতে হবে। মাটির নিচে জল আছে এ

জ্ঞানে কি তৃষ্ণা নিবারণ হবে? পরাঙ্মুখ মাটিকে খনন করতে হবে। যেতে হবে গভীর থেকে গভীরতরে।

এরই নাম সাধন।

কিন্তু কী করে মিলবে সেই জীবনসাধনকে?

আরেকটি বাস্তবপন্থী উদাহরণ দিলেন রামকৃষ্ণ। কিন্তু কাব্যমণ্ডিত।

'কোনো বড় পুকুরে মাছ ধরতে হলে কী করো? যারা সে পুকুরে মাছ ধরেছে তাদের থেকে খোঁজ নাও। খোঁজ নাও কী মাছ আছে, কী চার লাগে, কী টোপ গেলে। খোঁজখবর নিয়ে সেই রকম ব্যবস্থা করো। ছিপ ফেলামাত্রই মাছ ধরা পড়ে না, স্থির হয়ে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করো। তার পর ক্রমে ঘাই আর ফুট দেখতে পাও। মনে তখন আনন্দময় বিশ্বাস আসে যে মাছ সত্যি আছে আর তুমিও ধরতে পারবে সে মাছ।'

এই সৃষ্টি হচ্ছে পুকুর। মাছ হচ্ছে ঈশ্বর। যাদের থেকে খোঁজ করতে হবে তারা গুরু। চার হচ্ছে ভক্তি। মন ছিপ, প্রাণ কাঁটা, নাম টোপ। আর ঘাই আর ফুট হচ্ছে ঈশ্বরের ভাবরূপ।

আগে বিশ্বাস করো তিনি আছেন, তবে তো তাঁকে পাবার চেষ্টা করবে। যদি বিশ্বাসের সহজ পথে না আসতে চাও, আরোহণ করো জ্ঞানের উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়া। সে পর্বতপথ আরোহণ করবার মত আমরা সংসারী লোক, আমাদের স্নায়ুও নেই আয়ুও নেই। আমরা আছি বিশ্বাসের সমতলে।

বলে কিনা, ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ কী?

তোমার বাবা যে অমুক চন্দ্র অমুক, প্রমাণ কী? প্রমাণ, বিশ্বাস। মা বলে দিয়েছেন অমুক তোমার বাবা, বিশ্বাস করেছ। বিশ্বাস করেছ, কেননা মাকে তুমি সব চেয়ে বেশি ভালোবাসো।

তেমনি খুঁজে দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে ঘর-করা এমন কাউকে পাও কিনা যাকে মা'র মতো ভালোবাসতে পারো। বিশ্বাস করতে পারো মা'র মত। সে যদি বলে ঈশ্বর আছেন, তবে মানবে না কেন? আর, যদি একবার মানো, তবে কী ওজুহাতে ফিরে যাবে?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুই হাসপাতালে এলি কেন? যদি একবার এলি, তবে যতক্ষণ না বড় ডাক্তার তোকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে ততক্ষণ তুই ছাড়তে পাবি না হাসপাতাল। তুই এলি কেন?'

ঈশ্বর সন্ধানে আসা মানে আরোগ্য সন্ধানে আসা। বড় ডাক্তার মানে

গুরু—ভবরোগবৈদ্য। যতক্ষণ না গুরু বলছেন ভালো হয়েছি ততক্ষণ নিষ্কৃতি নেই।

॥ ১৮ ॥

তাই প্রথমতম এই প্রার্থনা :

ভগবান, তোমার অস্তিত্বে আমায় বিশ্বাসবান করো। আর কিছুই চাই না, সত্যিই তুমি যে আছ শুধু এইটি আমাকে ঠিক-ঠিক বুঝতে দাও। বুঝতে দাও আমার পথচলায়, আমার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। তুমিই যে আমার সব, তুমি ছাড়া ঘরে-বাইরে আমার যে কোথাও কিছু নেই এইটিই আমাকে বুঝতে দাও মনে-প্রাণে। জীবনে আর সব বিশ্বাস ভগ্ন হয়েছে, তোমার প্রতি বিশ্বাসটি যেন অটুট থাকে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের গল্প বললেন :

'চারদিক অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। নদী পার হয়ে পণ্ডিতের বাড়ি দুধ যোগাতে চলেছে বুড়ি গয়লানি। এই দুর্যোগে নৌকো নেই একটাও—বুড়ি অন্ধকার দেখল। কি করে পার হবে এই ঝোড়ো নদী? বুড়ি ভাবলে, রাম নামে ভবসাগর পার হয় শুনেছি, আর আমি এই ছোট নদীটা পার হতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব। রাম-রাম, নাম করতে-করতে বুড়ি নদী পার হয়ে গেল স্বচ্ছন্দে। পণ্ডিত তো অবাক! এই দুর্যোগে কেমন করে এলি—জিগগেস করলে বুড়িকে। কেন বাবা ঠাকুর, বুড়ি বললে সহজ সুরে, রাম-রাম করতে-করতে পার হয়ে এলুম। পণ্ডিতের তখন মনে পড়ল ওপারে তার কি কাজ আছে। বললে, আমিও অমনি রাম-রাম করে পার হতে পারব? কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। ফিরতি-মুখে দুজনে নদী পার হতে গেল। বুড়ি তো রাম-রাম করতে-করতে দিব্যি পার হতে লাগল। জলে নেমে পণ্ডিতও রাম-রাম করতে লাগল। এক পা এগোয় অমনি কাপড় গুটোয় সঙ্গে-সঙ্গে। পিছন ফিরে বুড়ি তখন বললে, বাবা-ঠাকুর, রাম-নামও করবে, আবার কাপড়ও সামলাবে, তা হলে হবে না। তাই হল না। পণ্ডিত পারল না পার হতে।'

এই বুড়ি গয়লানি শুধু বিশ্বাস নয়, অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাস যত অন্ধ ততই তার জোর। যত নীরন্ধ্র ততই অপ্রতিরোধ্য। নিজে অন্ধ হয়েও

আলো দেয় এ কে, যদি জিগগেস করো, তবে তার উত্তর হবে, বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসের আলোটি বাঁচিয়ে রেখে চলেছি ঝড়ের অন্ধকারে। অন্ধকার মানে সংশয়, ঝড় মানে দুঃখ-কষ্ট আঘাত-অপঘাতের সংসার। কিন্তু আলোটি বিশ্বাসের আলো। আঘাতে সে কাঁপে না, স্খলনে সে টলে না, শত বিক্ষোভের মধ্যেও সে অনির্বাণ। সে শুধু পথই দেখায় না, শোক-শীত-আর্তিতে উত্তাপ আনে, জীবনের সমস্ত নোঙর ছিঁড়ে গেলেও সে আশ্রয় দেয়, সমস্ত বঞ্চনার শেষেও সে জের টানে জমার ঘরে।

বিশ্বাসের জোর কত!

'রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমানের কোনো আয়োজন নেই। তার শুধু রামনামে বিশ্বাস' সে এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘন করলে।'

আর দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়, এবার শুধু স্বীকৃতি, শুধু সমর্পণ। শুধু বিশ্বাসের স্পর্শমণি। যখনই তোমাকে ভাবব তখনই দেখব তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ হাসিমুখে। যখন কাঁদব, দেখব তুমি দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছ কান পেতে। যখন চলব, দেখব পাশে-পাশে তুমিও চলেছ। যখন ঘুমুব, দেখব তোমারই কোলে মাথা রেখে শুয়েছি। যখন সময় আর কিছুতে কাটবে না, তখন দেখব তুমিও বিমনা হয়ে বসে আছ বাতায়নে।

বিশ্বাস করব, জীবনে যা পাই তাই তুমি, যা না পাই তাও তুমি। যা পাই তাতে তোমার স্পর্শ, যা না পাই তাতে তোমার আভাস। খেতে বসে দেখব অন্নরূপে তুমি। নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখব বিস্মৃতিরূপে তুমি। বায়ুস্পর্শে তোমারই আলিঙ্গন। বারিস্নানে তোমারই নির্মলতা। প্রত্যেক নৈশ ঘুমে ক্ষণকালিক মৃত্যুর পর আবার প্রভাত-জাগরণটি তোমারই স্মিতদীপ্ত হাসির প্রতিশ্রুতি।

আরেকবার বিশ্বাস করব। তুমি আছ। আর-সবাই আমাকে ভুলে থাকে, তুমি আমাকে ভোলো না। আর-সবাই ভুল বোঝে, তোমার হিসেবেই ঠিকে কখনো ভুল নেই। আর-সবাই বাইরে থেকে দেখে, তুমি দেখ বুকের মধ্যিখানে বাসা বেঁধে। আর-সবাই বিচার করে, তুমি অপেক্ষা কর। আর-সবাই ফিরিয়ে দেয়, তুমি শেষদিন পর্যন্ত বসে থাকো শিয়রে।

আরেকবার, শেষবার বিশ্বাস করব। আমি সত্যিই নিষ্কিঞ্চন নই, নিরাশ্রয় নই, নই আমি পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত—আমার আর কেউ নেই, না

থাক, তুমি আছ। তুমি শুধু আছ এর মধ্যে আমার তৃপ্তি নেই—তুমি একান্ত আমার হয়ে আছ। আমাকে খুশি করবার জন্যে তোমার কত রাশীকৃত আয়োজন, কত আপ্রাণ চেষ্টা। দূর আকাশে ধূসর একটি তারা এঁকে রেখেছ যদি আমি দেখি। কোন দুষ্প্রবেশ্য জটিল অরণ্যের মধ্যে একটি কলস্বরা নির্ঝরিণী এঁকে রেখেছ যদি আমি কোনো দিন এসে শুনি। পুষ্পে-পর্ণে শস্যে-তৃণে কত অকৃপণ বর্ণচ্ছটা ঢেলে দিয়েছ যদি চকিতেও একটু আভাস পাই। কত পীত-লোহিত, নীল-লোহিত, কত সিত-কৃষ্ণ, পাটল-পিঙ্গল, কত কপিশ-কপিল, ধূসর-পাণ্ডুর, কত হরিৎ-অরুণ, শ্যামল-সুনীল—যদি এত সব বর্ণের মধ্যে খুঁজে পাই অবর্ণনীয়কে। এত তোমার মহিমা অথচ আমার কাছে তুমি কমনীয়, এত তোমার প্রতাপ অথচ আমার কাছে তুমি সহজ-সামান্য। তোমার রাজ-সাজ ছেড়ে পরে এসেছ পীত-ধড়া, তোমার ঐশ্বর্যের রাজ-মুকুট ফেলে দিয়ে হাতে নিয়ে এসেছ মোহন মুরলী।

বিশ্বাস করতে ভালো লাগে বলে বিশ্বাস করব। বিশ্বাস করব, যা চরমতম ভালো তাই তুমি করছ আমাদের জীবনে। তুমি যে আমাদের দুঃখ দিচ্ছ, অশ্রুজলে মার্জনা করে পরিচ্ছন্ন করে নিচ্ছ—পরিপূর্ণতম ভালোটিকে বিকশিত করবার জন্যে। এত যে আঘাত দিচ্ছ, প্রহারে জর্জর করছ, শুধু একটি কল্যাণ-আলোকে অন্ধ চোখকে জাগিয়ে দেবার জন্যে। আমাদের চিরন্তন যাত্রাও এই মঙ্গললোকে। ত্যাগের মরুপথ দিয়ে, দুঃখের কাঁটাবন ভেদ করে, শোকের দুরন্ত সমুদ্র ঠেলে। তুমি আনন্দময়, প্রেমময়, ক্ষমাময় যাই কেননা বলি, আসলে তুমি মঙ্গলময়। বিশ্বাস করব, তুমি আমার অধমার্থ বুঝে আমাকে সুখ দেবে না, তুমি আমার পরমার্থ বুঝে আমাকে মঙ্গল দেবে। যদি পদপ্রান্ত থেকে পথপ্রান্তে ফেলে রাখো বুঝব সেইটিই আমার মঙ্গল।

রামকৃষ্ণ কী বললেন? বললেন, 'পাথর হাজার বছর জলে পড়ে থাকলেও তার ভেতর জল কখনো ঢোকে না। কিন্তু মাটিতে জল লাগলে তখুনি গলে যায়। যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত তারা হাজার-হাজার আপদ-বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের মন সামান্য কারণে টলে যায়। চকমকির পাথর শত বছর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মারামাত্র আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত হাজার-হাজার অপবিত্র সংসারীর ভিতর পড়ে

থাকলেও তার বিশ্বাস-ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎ কথা হলেই সে জ্বলে ওঠে।' আবার বলেছেন এক কথায়, সুন্দর কথায় : 'যার গলা একবার সাধা হয়েছে তার সুরে শুধু সারেগামাই এসে পড়ে।'

সমস্ত কাজের মূলেই একটি বিশ্বাস চাই। এ কাজে আমার পর্যাপ্ত প্রাপ্তি ঘটবে এ বিশ্বাস না থাকলে কাজে প্রবৃত্ত হই না। আর যে কাজই করি না কেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে একভাবে না আরেকভাবে সুখ-আহরণ। আহরণটি আছে বলেই অন্বেষণের আনন্দ। সুখ পেলেই যে থামি তা নয়, আরো একটা সুখ, আরো একটা তুঙ্গতর শৃঙ্গের সন্ধানে ধাওয়া করি। সেটা পেলেও আরো উচ্চতর চূড়ার অভিমুখে। যখন তর আছে তখন তম-ও আছে। যখন অধিকতরকে পেয়েও থামছি না তখন নিশ্চয়ই অধিকতম আছে, আছে পরমতম। সেই পরমতমের কি একটা নাম দেবে না? মানুষ নাম রেখেছে, ভগবান। সুতরাং এই দাঁড়াচ্ছে, সুখানুসন্ধানই ঈশ্বরানুসন্ধান। পূর্ণতা লাভের চেষ্টাই ঈশ্বরলাভের চেষ্টা। শান্তি-প্রাপ্তির প্রার্থনাই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রার্থনা।

শেষে তুমি আছ এই জন্যেই তো সুরু। রামকৃষ্ণ বললেন, 'সাধু গাঁজা তয়ের করছে, তার সাজতে-সাজতে আনন্দ।'

যত বিশ্বাসের জোর তত তার উপলব্ধির ঔজ্জ্বল্য। তত তার আনন্দের ঘনিমা।

রামকৃষ্ণ একটি তেজী উপমা দিলেন : 'যে গরু বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু গবগব করে খায় সে হুড়-হুড় করে দুধ দেয়।'

শুধু উপমার তেজ নয়, বাংলা ভাষার তেজ। সে যুগের সংস্কৃত শব্দাবলী গায়ে দেওয়া আড়ষ্ট-অস্পন্দ ভাষা নয়। রামকৃষ্ণ বাংলা ভাষায় তীক্ষ্ণ স্বচ্ছতা আনলেন। স্বচ্ছতা হচ্ছে গতিশক্তির প্রতিবিম্ব। আর তীক্ষ্ণতা হচ্ছে প্রাণশক্তির।

॥ ১৯ ॥

কিন্তু যে পরমতম আনন্দকে সন্ধান করছি সে আনন্দটি কোথায়? সে আনন্দটি আমাদের মধ্যেই বিরাজমান। হৃদয়ের গহন গুহাশয়ে।

মাটির গভীর উৎস থেকে যেমন শীতলের উৎসার, তেমনি শীতলতমের উৎসার হৃদয়ের দুঃসহ অন্ধকার থেকে। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে হবে, উদ্ঘাটিত করতে হবে নিজের দেহায়তনে। হায়, আমিই তাঁর কুহেলিকা, আমিই তার আবরণ, সে সূর্যোদয়কে আমিই আড়াল করে রেখেছি। তাকে প্রকাশিত হতে দিচ্ছি না। কবে নিজেকে ছিন্ন করতে পারব, বিদীর্ণ করতে পারব এই মেঘপট, সেই ধ্রুব জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় হবে।

কত দূর-দুর্গম দেশের আমরা পথ চিনি, শুধু নিজের অন্তরে যাবার রাস্তাই আমাদের জানা নেই। জেনেই বা দরকার কি। এই রাস্তার শেষে নির্জন শান্তিতে কে বাস করছে তার খবর তো পৌঁছেনি এখনো।

নিজের খবরই নিজে রাখি না। অন্যের খবরের জন্যে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করি। ঠিকানার খোঁজে যাই এ-দোরে ও-দোরে।

একটি কাব্যময় উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'হরিণের নাভিতে কস্তুরী থাকে, তা হরিণ জানে না। গন্ধে দশদিক আমোদ হচ্ছে দেখে উন্মনা হয়ে ছুটে বেড়ায়। অথচ নিজের নাভির মধ্যেই যে এ সুগন্ধের উৎস এ তাকে কে বলে?'

তেমনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটছি আমরা। এ সুগন্ধময় আনন্দের বাসা যে আমাদের বুকের মধ্যে তারই আমরা খবর পাইনি। হৃৎপিণ্ডের শব্দে মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে তবু আমাদের খেয়াল নেই। তারপরে সশব্দে যখন মন্দিরের সিংহদ্বার বন্ধ হয়ে যাবে তখন কি করব!

মজার একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'একজন তামাক খাবে তো প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। রাত তখন অনেক। প্রতিবেশীর বাড়ির লোকেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঠেলাঠেলি করবার পর একজন এসে দোর খুলে দিলে। খুলে লোকটিকে দেখে সে বলে উঠল, সে কি গো, কি মনে করে? আর কি মনে করে! লোকটি বললে, তামাকের নেশা আছে জানো তো! টিকে ধরাবার আগুনের জন্যে এসেছি। তখন প্রতিবেশীর বাড়ির লোক বললে, বাঃ, তুমি তো বেশ লোক! এত রাত করে এত কষ্ট করে আসা, আর এই দোর ঠেলাঠেলি! তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে!'

আঙ্গিকের দিক থেকেও গল্পটি নিখুঁত। তামাকখোর লোকটির হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে তা গল্পের গোড়ায় বলা হয়নি। শেষ ছত্রে সে আলোটি

জ্বলে উঠে সমস্ত গল্পটিকে অর্থে-ইঙ্গিতে আলোকিত করেছে।

আমরাও তেমনি লণ্ঠন হাতে করে টিকের আগুনের সন্ধানে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ যে উলঙ্গ অগ্নি জ্বলছে আমাদের হৃদয়-কুণ্ডে তা আমরা টের পাই না। আমরা না পাই উষ্ণতা না দেখি ঔজ্জ্বল্য।

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'যতক্ষণ বোধ সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা-হেথা, তখনই জ্ঞান।'

তবু বিশ্বাসের সঙ্গে চাই একটি ব্যাকুলতা। আগুনের সঙ্গে চাই সমীর-সঞ্চার। পাখির পায়ের সঙ্গে চাই পক্ষপুট।

কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ :

'চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা যমুনা গোদাবরী জলে জল-ময়, সাত সমুদ্র ভরপুর, তবু সে জল সে খাবে না। মেঘের জল পড়বে তবে খাবে।'

শুধু 'ফটিক জল' বলে আর্তনাদ করছে। পাখা ঝাপটাচ্ছে। ঊর্ধ্ব-পানে তাকিয়ে আছে সকাতরে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু অন্য জলে রুচি নেই।

তাই আবার বলেছেন রামকৃষ্ণ : 'চাতক পাখির বাসা নিচে কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে।'

কোথায় আমাদের সেই ফটিক-জল। সেই স্ফটিকস্বচ্ছ নির্মল-নিরাময় বারিধারা। চারধারে স্তূপীভূত ভোগের উপকরণ, বিলাসকাননের ফুল-ফল, তবু কিছুতেই পিপাসা মেটে না। কোথায় তোমার অচ্ছোদ অমিয়-বৃষ্টি!

লোকলজ্জার ভয়ে কাঁদতে পর্যন্ত আমাদের বাধা। কপট সংসারে সংস্কারের বেড়াজালের মধ্যে আটকা পড়ে আছি। পাছে ওরা হাসে তাই কাঁদি না। নাচি না হরিনামে। লোকে কি বলবে তাই তোমার আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়তে আমাদের লজ্জা করে।

রামকৃষ্ণ এককথায়, একটি ছন্দোবন্ধ কথায় উড়িয়ে দিলেন : 'লোক না পোক!'

মানুষ অষ্ট পাশে বাঁধা। ঘৃণা লজ্জা মান অপমান মোহ দম্ভ দ্বেষ আর পৈশুন্য। গোপীদের বস্ত্রহরণের মানে কি? গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, শেষ পাশ লজ্জা এবার ছিন্ন হল। রামকৃষ্ণ বললেন, 'পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।'

তাই কেউ যখন পরীক্ষায় পাশ করে আসে, রামকৃষ্ণ বলেন, 'পাশ করা না পাশ পরা!'

গ্রন্থ না গ্রন্থি!

যত বই তত বোঝা। যত বেশি বোঝা ততই ভারি বোঝা। শুধু অভিমানের ব্যোমযান। শুধু বন্ধনের জটাজুট।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আজ বাগবাজারের পুল হয়ে এলাম। কত বাঁধনই দিয়েছে। অনেক শিকল—একটা বাঁধন ছিঁড়লে পুলের কিছু হবে না, অন্যগুলো টেনে রাখবে।'

তেমনি সংসারীদের অনেক রজ্জু, অনেক নাগপাশ। একটা যায় তো আরেকটা আটকে রাখে। সংসার ছেড়ে গেরুয়া পরল, তারপর আবার গেরুয়ার অহমিকা।

নিজেকে গৌরব দিতে গিয়ে পদে-পদে নিজেকেই অপমান!

রামকৃষ্ণ বললেন, 'গুটিপোকা আপনার নালে আপনি মরে।'

॥ ২০ ॥

অহংকারই কিছুতেই যায় না।

কী সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও আবার তার পরদিন ফেকড়ি বেরিয়েছে।'

একটা কিছু শক্তি হল অমনি অহংকার। এমন যে ভক্তি তার পর্যন্ত অহংকার—আমার মত ভক্ত আর কজন আছে! ত্যাগ করে এসে রিক্ততায়ই মদমত্ত। কিছুতেই যায় না ফেকড়ি। বাণ যায় তো পুঙ্খ থাকে। আগুন নেবে তো ছাই ওড়ে। কোথায় আবার একটি ফুলকি থাকে লুকোনো। কুকার্য যায় তো কুচিন্তা যায় না। সিল্কের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঘা ঢাকা। কখনো বা গেরুয়ার ব্যাণ্ডেজ দিয়ে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ছুঁচের ভেতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না।'

তাই তো প্রার্থনা—আমার সমস্ত রোগযন্ত্রণার যে বীজ, যে অহং, তাকে তুমি উৎপাটিত করো, উন্মূলিত করো। আমাকে তুমি ভাঙো, ভেঙে-ভেঙে তোমার নৌকো করো। আমাকে তুমি দগ্ধ করো, যদি দাহ থেকেই

আভার কোনো আভাস জাগে। উন্মথিত করো এই বিষসমুদ্র, যদি কোথাও খুঁজে পাও একটু সুধাকণা।

আমি-কে তুমি করো।

জীবের এই আমি নিয়েই যন্ত্রণা। উপাধি নিয়েই আধি। যত ধার তার চেয়ে আধার বেশি। পদ নেই তো পদবীর চাকচিক্য। এই আমি-র আর কিছুতে মূলোচ্ছেদ নেই।

আবার বললেন রামকৃষ্ণ : 'ছাগল কেটে ফেলা হয়েছে তবু নড়ছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।' এই যায় এই আবার আসে সেই অহঙ্কার। ছোট একটুকরো মেঘ, খরকরোজ্জ্বল সূর্যকে আড়াল করে রাখে। ছোট তুচ্ছ একটা ছিদ্র হয়েছে টেলিগ্রাফের লাইনে, আর আওয়াজ আসে না।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হলে আর খবর নেই।'

তবে উপায় কি? ত্রাণ কিসে?

আমাকে 'তুমি' করো। যখন আমার তোমাতে বিস্তার, তখনই আমার একমাত্র নিস্তার।

সেই এক গুরুর গল্প আছে, শিষ্যকে বললেন অরণ্যে গিয়ে দুশ্চর তপস্যা করে সিদ্ধ হও। শিষ্য বারো বৎসর তপস্যা করে ফিরে এল খবর দিতে। দেখল গুরুর গৃহাদ্বার বন্ধ হয়ে আছে। দরজায় করাঘাত করল শিষ্য। ভিতর থেকে গুরু প্রশ্ন করলেন—কে? শিষ্য উত্তর দিল : 'আমি'। কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলেন গুরু। বললেন, 'তোমার তপস্যা এখনো পূর্ণ হয়নি। সিদ্ধি এখনো অনেক দূরে।' শিষ্য আবার দুঃসাধ্যতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। কাটালো আরো বারো বৎসর। আবার ফিরে এলেন গৃহাদ্বারে। দেখলেন এখনো দ্বার রুদ্ধ। আবার করাঘাত করলেন। গুরু প্রশ্ন করলেন—কে? শিষ্য উত্তর দিল : 'তুমি'। অমনি মুক্ত হল গৃহাদ্বার।

একটি অভিনব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ। বাংলা সাহিত্যে এর জুড়ি নেই।

'গরু যতক্ষণ হাম্বা-হাম্বা করে—তার মানে হাম-হাম, আমি-আমি করে—ততক্ষণই তার যন্ত্রণা। তাকে লাঙলে যোড়ে, কত রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, তারপর আবার কশাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়, তখন আবার খুব পেটে। তবুও নিস্তার নেই। শেষে নাড়ি-

ভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈরি হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে তুঁহুঁ, তুঁহুঁ—অর্থাৎ, তুমি-তুমি। যখন তুমি-তুমি বলে তখনই নিস্তার।'

তুমি-র পর আর কিছু হয় না। তোমার পর আর কিছু হবার নেই।

মানুষের এই শুধুই চিরন্তন কান্না, আমাকে প্রকাশিত করো। শুধু মানুষের কেন, অংকুর থেকে অন্তরীক্ষ পর্যন্ত, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির। কিন্তু এই প্রকাশের জন্যে অনুকূল একটি শূন্যতার দরকার। একটি শূন্যতা না পেলে অংকুর কি করে বৃক্ষে প্রকাশিত হবে? তেমনি আমারো প্রকাশের জন্যে চাই একটি শূন্যতা। সেটি হচ্ছে বিরহের শূন্যতা। তুমি নেই—এই বিরহ। তুমি নেই—এই বিরহে আমার বিশ্বভুবন যখন শূন্যময় হয়ে উঠবে তখনই আমার বিকাশের সম্ভাবনা ঘটবে। আর সেই শূন্যের আশ্রয়ে এসে আমি ধীরে-ধীরে তুমি হয়ে উঠব।

আমাকে ত্যাগ করলেই তোমাকে পাওয়া যাবে। আমি হচ্ছি কৃত্রিম তুমি হচ্ছ সহজ। আমি হচ্ছি ক্ষোভ তুমি হচ্ছ শান্তি। আমি হচ্ছি অহংকার তুমি হচ্ছ প্রেম। আমি হচ্ছি সুখ তুমি হচ্ছ মঙ্গল।

আমি কপট থেকে সরলে যাব, ক্ষোভ থেকে শান্তিতে। সুখ ছেড়ে মঙ্গলে উপনীত হব, অহংকার ছেড়ে ভালোবাসায়।

দ্বারে-দ্বারে না ঘুরে যাব সেই অন্তরের স্থিরধামে।

এক কথায় আমি তুমি হয়ে উঠব।

তা হলে সংসার চলে কই? কেশব সেন বললেন, 'তা হলে মশাই দল-টল থাকে না।'

রামকৃষ্ণ বললেন, আমি যখন কিছুতেই যায় না তখন থাক দাস-আমি হয়ে। আমি ঈশ্বরের ছেলে, আমি ঈশ্বরের দাস—সেই আমি হয়ে। এ আমি হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি। যে আমি কাঁচা, যে আমি বজ্জাত, সে আমি বর্জন করো। বলে একটি আশ্চর্য উপমা দিলেন। একটি দুরূহ তত্ত্বকে বুঝিয়ে দিলেন জল করে :

'সংসারীর আমি, অবিদ্যার আমি—একটা মোটা লাঠির মত। সচ্চিদানন্দ সাগরের জল ঐ লাঠি যেন দুই ভাগ করছে। কিন্তু ঈশ্বরের দাস আমি, বালকের আমি, বিদ্যার আমি—এ হচ্ছে জলের উপরে রেখার মত। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে—শুধু মাঝখানে একটি রেখা—যেন দু ভাগ জল। বস্তুত এক জল— এক সমানস্রোত।'

এই জলে নামো হলুদ গায়ে মেখে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে আর কুমীরের ভয় থাকে না।'

বিবেকবৈরাগ্য হচ্ছে হলুদ। সদসৎ বিচার করার নাম বিবেক। আর বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরের উপর অনুরাগ।

আবার বললেন, 'জলে নৌকো থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকোর মধ্যে না জল ঢোকে। তা হলেই ডুবে যাবে।' আবার এই ভাবটিই ব্যক্ত করলেন অন্যভাবে : 'এমনি যদি বনবন করে ঘুরতে থাকো, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তবে যদি খুঁটি ধরে ঘোরো, আর ভয় নেই।'

কোথায় ঘুরবে? ও কি জল, না, জলভ্রম? স্বর্ণমৃগেরই আরেক নাম মৃগতৃষ্ণা। কার পশ্চাদ্ধাবন করবে?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানে খোঁড়ো। খুঁড়তে-খুঁড়তে সেখানেই জল মিলবে।'

আর কিছু না মিলুক অন্তত চোখের জল মিলবে। চোখের জলেই সেই পিপাসার পানীয়। আর, এ আমার যত পান তত পিপাসা।

তাই যেখানে আছি সেখানেই বসলুম তোমার জন্যে। যারা বলে, পেঁছেছি, তারা পথই পায়নি। আমি না জানি পথ না জানি পেঁছুনো। আমি যেখানে আছি সেই আমার পথ, সেই আমার পথারম্ভ ও পথশেষ। তুমিই এবার পথ চিনে এস আমার কাছে। সেই কবে থেকেই তুমি আসছ—কবে থেকেই তাকিয়ে আছ আমার দিকে। এবার যখন তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছি, এবার ঠিক চোখের উপর চোখ পড়বে।

আমাকে না হলে বা তোমার চলে কই? গন্ধ যেমন ফুলকে চায়, ফুলও তেমন চায় গন্ধকে। আমিই তোমার সেই গন্ধ। তুমি সুন্দর, আমি মধুর। মাধুর্যকে না পেলে সৌন্দর্য অসম্পূর্ণ। ভাব যেমন রূপকে চায়, রূপ চায় তেমনি ভাবকে। আমিই তোমার সেই ভাব। তুমি কবিতা, আমি রস। রসকে না পেলে কবিতা প্রাণহীন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বর বৎসহারা গাভীর মত খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কেঁদে বেড়াচ্ছেন—'

একটি মধুলোভী ভৃঙ্গ গুঞ্জরণ করে ফিরছে। ঘুরে-ঘুরে দেখছে কোথায় ফুটেছে সেই মধুপূর্ণ শতদল! কিছু বলতে হবে না, ভ্রমর এসে বসবে সেই পদ্মে। পান করবে কমলমধু।

এত ডাকছি, শুনছেন কই? কিন্তু জলে-স্থলে তিনি যে এত ডাকছেন, তা শুনছ?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তিনি খুব কানখড়কে। সব শুনতে পান। যখন যত ডেকেছ সব শুনেছেন। তাঁকে ডাকবার আগেই এগিয়ে আসেন তিনি। মানুষ যদি এক পা এগোয় তিনি দশ পা বাড়ান। তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই।'

এই বলেই একটি গল্প জুড়লেন : 'এক মুসলমান নমাজ করতে-করতে হো আল্লা হো আল্লা বলে চীৎকার করে ডাকছিল। একজন তার চীৎকার শুনে বললে, তুই আল্লাকে অত চীৎকার করে-করে ডাকছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নুপুর শুনতে পান।'

সত্যি শুনতে পান? আমার বুকে যে এত অবরুদ্ধ কান্না, এত প্রকাশহীন স্তব্ধতা—শুনতে পান তিনি? তিনি আছেন?

॥ ২১ ॥

আবার সংশয়। থেকে-থেকেই সংসারীর এই সন্দেহ, তিনি আছেন? আছেন তো দেখাও আমাকে। প্রমাণ দাও।

দুটি বিস্ময়কর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ। দুটি হীরক-দ্যুতি।

'কিন্তু একদিনেই কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেক দিন ধরে ঘুরতে হয়। তখন কোনটা কফের কোনটা বায়ুর কোনটা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়।'

আবার বললেন :

'অমুক নম্বরের সুতো, যে সে কি চিনতে পারে? সুতোর ব্যবসা করো, যারা ব্যবসা করে তাদের দোকানে কিছুদিন থাকো, তবে কোনটা চল্লিশ নম্বর, কোনটা একচল্লিশ নম্বরের সুতো, ঝাঁ করে বলতে পারবে।'

প্রেমের প্রথম অনুভূতিটি পাবার জন্যে যৌবন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়। একটা বীজ পুঁতলেই তক্ষুনি একটা গাছ হয় না। কত তমিস্রার তপস্যা করে রাত্রি প্রভাত-তপনের মুখ দেখে!

এ কি ইন্দ্রজাল? মাটি খুঁড়লেই কি শস্য পাবে? অশ্রুজলে সিক্ত

করো মাটি। তার পরে হলকর্ষণ করো। বীজ বোনো। আবার যদি সুখের রৌদ্রে বিস্মরণের অনাবৃষ্টি আসে, আরেকবার মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করো। আবার কাঁদো মাঠ ভরে, মাটি ভিজিয়ে। দেখবে আঁকুর দেখা দিয়েছে। আঁকুর থেকে দেখা দেবে সেই প্রশস্য শস্য।

চতুর্দিকে অব্যক্ত ছিল, প্রাণের আবির্ভাব হল। নির্বাক ছিল, নামল ধ্বনির নির্ঝরিণী। অমূর্ত ছিল, দেখা দিল নয়নমোহন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'নবানুরাগের বর্ষা'।

সেই বিদ্যাপতির "নব অনুরাগিণী রাধা। কিছু নহি মানয় বাধা॥" সেই "যামিনী ঘন আঁধিয়ার। মনমথ হিয় উজিয়ার॥"

রামকৃষ্ণ বললেন, 'প্রথম অনুরাগে সব সমান বোধ হয়। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলো ওড়ে, তখন আম গাছ তেঁতুল গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম গাছ এটা তেঁতুল গাছ চেনা যায় না।"

একবার যদি নবীন মেঘের নীল অঞ্জন চোখে লাগে, তখন সমস্ত বিশ্বই শ্যামময়। জীবনের সমস্ত হরণ-পূরণই হরিময়। কৃষ্ণ ছাড়া আর বর্ণ নেই। শিব ছাড়া জীব নেই। রাম ছাড়া কাম নেই।

সেই হচ্ছে নবানুরাগের বর্ষা। বিদ্যাপতির "ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।" ভাদ্রের বাদর-বিধুর শূন্য মন্দিরে বসে হরির জন্যে কাতরতা। "কৈসে গমাওবি হরিবিনু দিন রাতিয়া।" শুধু রাতটুকু নয়, দিন-রাত্রি কি করে কাটবে হরি-হারা হয়ে? শুধু দুঃখের নিবিড় তিমির রাতটুকুই নয়, বিভ্রান্তিময় বিস্মরণের দিনটুকুও।

টুকরো-টুকরো উপমা দিয়েছেন, এবার একটি সম্পূর্ণ কাব্যচিত্র আঁকলেন রামকৃষ্ণ।

'ধ্যান করবার সময় ইষ্টচিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়? কতকটা মন সেই দিকে সর্বদা রাখবে। দেখেছ তো দুর্গা পূজার সময় একটা জাগ-প্রদীপ জ্বালতে হয়, সেটাকে নিবতে দিতে নেই। নিবলে গেরস্তর অকল্যাণ। সেইরকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ জাগ-প্রদীপ সর্বদা জেবলে রাখতে হবে। সংসারে কাজ করতে-করতে মাঝে-মাঝে ভিতরে চেয়ে দেখবে সে প্রদীপটি জ্বলছে কিনা।'

এমন একটি প্রসাদস্নিগ্ধ কাব্যচিত্র বাংলা ভাষায় আর কোথায় দেখেছি!

এই প্রদীপটি যে জবালব তার বহ্নিকণাটি পাব কোথায়? বিরহের অনল থেকে আহরণ করতে হবে সেই শ্বেতশিখা। ধরিয়ে নেব প্রেমের প্রশস্ত দীপভাণ্ড। সেই প্রদীপের বিমুগ্ধ আলোকে মুখচন্দ্রিকা হবে। মুখচন্দ্রিকা হবে চিরবিরহিণী মানবাত্মার সঙ্গে চিরমিলনোৎসুক পরমাত্মার। কিন্তু সেই বিরহব্যথার ব্যাকুল বাদল-অন্ধকারটি পাই কোথা? কি করে দূরের মানুষটিকে বুঝি বুকের মানুষ বলে?

যাই বলো, শেষ পর্যন্ত, সেই করুণাবরুণালয়ের এক বিন্দু কৃপা। একটি চকিততড়িৎ কটাক্ষ।

তাতেও হলো না। এই কৃপাকে আকর্ষণ করি কি করে?

প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি নিহিত আছে। কৃ—করো, পা—পাবে। কৃপা পেতে হলে কাজ করতে হবে। ছুটোছুটি করতে হবে। 'ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হলেই মা এসে ধরেন ছেলেকে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'টেনে নেন কোলের মধ্যে।'

কেন এমন ছুটোছুটি করান? এমনি খেলিয়ে নিয়ে লাভ কি?

'তাঁর ইচ্ছা।' কী গম্ভীরসুন্দর, কী গভীরসহজ ভাবে বললেন রামকৃষ্ণ : 'তাঁর খুশি। তাঁর ইচ্ছা তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়োদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ি খুশি হয় না। খেলা চললেই বুড়ির আহ্লাদ।'

আমাকে নিয়ে তুমি খেলবে তারই জন্যেই তো এত বড় আকাশ-অঙ্গনে এত ঋতু-রঙ্গিমা। পুষ্পবনে এত বিহঙ্গকাকলী। শর্বরীর কবরীতে এত নক্ষত্রকণিকার মণিকা। চতুর্দিকে শুধু অন্তহীন অকারণের আয়োজন। সব আমার জন্যে। আমার সঙ্গে তোমার খেলা হবে তারই জন্যে আনন্দ-উজ্জ্বল দীপাবলী।

কিন্তু, এত আলোক, তবু তোমাকে দেখি কই?

রামকৃষ্ণ উপমা দিলেন, 'পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না।'

কর্ম হচ্ছে, রামকৃষ্ণের কথায়, আদিকাণ্ড। কর্মের জন্যেই কর্ম নয়, কৃপার জন্যে কর্ম। যেমন খেতে-খেতে খিদে, কাঁদতে-কাঁদতে শোক, তেমনি যদি কর্ম করতে-করতে কৃপা পাই!

'সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়; তাঁর মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখে। আর

সকলে পরস্পরের মুখ দেখে। যদি কেউ দেখতে চায় সার্জনকে তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফেরাও, তোমাকে একবার দেখি।'

কী সুন্দর কাব্যরসাশ্রিত প্রার্থনা! এত বর্তিকা জ্বলছে দশদিকে অথচ তোমাকেই দেখছি না সমীপবর্তী। তোমার হাতে আলো অথচ তোমার মুখখানিই অন্ধকার। একবার আলোর শিখাটি তোমার মুখের উপর তুলে ধরো, আর আলো না দেখে দেখি তোমার উদ্ভাসিত মুখ।

কিন্তু যে আলো দিয়ে তোমার মুখ দেখব সে তোমার আলো নয়, সে আমার আলো। তুমি শুধু দয়া করে তোমার নিজের হাতে সে আলোটি জেবলে দিয়ে যাও। জেবলে দিয়ে যাও আমার হৃদয়ের নির্জনতায়। 'বঁধু দয়া করো, আলোখানি ধরো হৃদয়ে—' সেই আলো জ্ঞানের আলো। তোমার কৃপাকোমল স্পর্শে সেই জাগ-প্রদীপ সেই জ্ঞান-প্রদীপ জ্বলে উঠুক। তোমাকে একবার দেখি। শুধু দেখলেই চলবে না। তোমাকে চিনি। চিনি তোমাকে অন্তরঙ্গ বলে। অন্তর্যামী বলে, যদি সেই একটিমাত্র প্রদীপও না জ্বলে তবে তো আমি হত-দরিদ্র, একেবারে অধম-অধন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঘরে যদি আলো না জ্বলে সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। বড়লোকের লক্ষণই এই তার ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে।'

তুমি যদি দয়া না করো তবে আমি কী করব! আমি যত চেষ্টা করি আলো জ্বালতে ততই তা নিবে-নিবে যায়। নিবে যায় তোমার নিবাত নিষ্ঠুরতায়। আলোর জন্যে যে একটি বহমান বায়ু চাই সেইটিই কৃপা। যদি সেই সমীরসঞ্চার না হয় দাও অকৃপণ অন্ধকার। সেই গভীর অন্ধকারেই তোমার আসন প্রসারিত হোক জীবনে। সেই তিমিরভারই হোক তোমার পুঞ্জ-পুঞ্জ করুণা।

॥ ২২ ॥

শুধু এগোও। এগিয়ে যাও। ঢেউ ঠেলে-ঠেলে শুধু দাঁড় টানো। পরে কখন ঝাঁ করে পাড়ি জমে যাবে।

'প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশি পরিশ্রম

করতে হয় না।' নৌকো-নদীর উপমা বাছলেন রামকৃষ্ণ : 'যতক্ষণ ঢেউ ঝড় তুফান আর ব্যাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয় ততক্ষণ মাঝিকে দাঁড়িয়ে থেকে হাল ধরতে হয়—সেইটুকু পার হয়ে গেলেই আর হয় না। যদি বাঁক পার হল আর অনুকূল হাওয়া বইল তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটি ঠেকিয়ে রাখে। তারপর পাল টাঙাবার বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে।'

শান্তশীলা নদীর একটি মৃদুচ্ছন্দ গতি-চিত্র। তামাকটি হচ্ছে একটি উপলব্ধির আরাম। বায়ুটি হচ্ছে অহেতুক করুণা। পাল হচ্ছে বিশ্বাসের ধ্বজপট।

এবার ধরলেন মাঝি ছেড়ে স্বর্ণকারকে।

'স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় চোঙ, পাখা, হাপর সব নিয়ে বসে। সব দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনের খুব তেজ হয়ে সোনাটা শিগগির গলে যায়। কাজ শেষ হলে বলে, তামাক সাজ।'

স্বর্ণকার হল, এবার কুম্ভকার।

'মাটি পাট করা না হলে হাঁড়ি তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি-ঢিল থাকলে হাঁড়ি ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে।'

কুম্ভকারের পরে পটকার। আর এই ছবিটি প্রসন্নহাসা প্রতিমার মত কান্তিমতী : 'চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তার পর বসে-বসে রঙ ফলাও। প্রতিমা প্রথমে একমেটে তারপর দোমেটে তারপর খড়ি তারপর রঙ—পরে-পরে করে যাও।'

তারপর সরকারী কর্মচারী অধর সেনকে বুঝিয়ে দিলেন এক কথায় : 'প্রথম জীবনে খাটনি। শেষকালে পেনসান।'

শুধু এগোও। ভেসে যেও না, এগিয়ে যাও।

একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'এক কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা। ব্রহ্মচারী বললে, ওহে এগিয়ে পড়ো। সে আবার কী কথা! দিব্যি কাঠ কাটছি বনের নিরিবিলিতে, এগোব কী! তবু কি ভেবে এগিয়ে গেল পরদিন। খানিকটা কৌতূহলে খানিকটা বা প্রলোভনে। এগিয়ে গিয়ে দেখল অগণন চন্দনের গাছ। কী আনন্দ! দিকে-দিকে সুগন্ধের অভিনন্দন। গাড়ি-গাড়ি চন্দনের কাঠ কাটতে লাগল কাঠুরে। অবস্থা ফিরিয়ে ফেলল বাজারে সেই কাঠ বেচে-বেচে। ভাবল, আর কী চাই!

এতদিন যত আজে-বাজে কাঠ কেটেছি, এগিয়ে এসে মিলেছে এবার চন্দন বন। ভাগ্যিস এগিয়েছিল! হঠাৎ মনে পড়ল ব্রহ্মচারী তো বলেছিল এগিয়ে পড়তে—তবে এই চন্দনেই বন্ধন মানি কেন? আবার এগুলো কাঠুরে। এগিয়ে গিয়ে দেখল রুপোর খনি। এ তো স্বপ্নের অতীত। অঢেল রূপসাগর। আঁজলা ভরে-ভরে রুপো বেচতে লাগল। আণ্ডিল হয়ে গেল কাঠুরে। আবার মনে পড়ল ব্রহ্মচারীর কথা। এই অল্পেই থামি কেন? এগোও, এগিয়ে পড়ো। এবার রুপোর পর সোনার খনি। হোক সোনার খনি, তবু থামব না। কে জানে এর পরে আরো না জানি কী আছে! এর পরে হীরে-মাণিক—কুবেরের ঐশ্বর্য। তবুও ইতি নেই, স্থিতি নেই, নেই কোনো পরিমিতি। তবু এগিয়ে পড়ো।'

চলো রূপ থেকে অরূপে, অল্প থেকে ভূমায়, ক্ষুদ্র থেকে নিরতিশয়ে। চলো আপ্তি থেকে ব্যাপ্তিতে। অন্ত থেকে অন্তহীনতায়।

চলো সেই পরমের দিকে, চরমের দিকে—তার মানে, চলো আপন মরমের দিকে।

বুকের সব চেয়ে যে কাছে তারই অভিসারে বেরিয়ে পড়েছি। রাম-কৃষ্ণ বললেন, 'ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়।' কিন্তু কাকে দেখব বলে যে বাইরে এলাম তার নাম জানি না। সেই কবে যে এসেছি বেরিয়ে, কোন জন্মে, কোন জগৎ থেকে, তারও হদিস নেই। নির্ঝরধারা কি জানে কবে তার প্রথম যাত্রা? ঐ দূর নক্ষত্রের দ্যুতির রেখাটি কি জানে কত দিনে আমার নয়নের আলোর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে? শুধু এগিয়ে পড়ো। যাত্রা কর যাত্রীদল।

ঈশ্বরকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'সুধার হ্রদ'।

আমাদের মানস-সরোবর। আমাদের মনের মধ্যেই সে জলনিধি। চলো সেই স্নানতীর্থে। সেই মানসতীর্থে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যতই গঙ্গার কাছে যাবে ততই পাবে ঠাণ্ডা হাওয়া।'

আবার বললেন অন্য উপমার সাহায্যে : 'যতক্ষণ না হাটে পৌঁছুনো যায়, দূর হতে কেবল হো-হো শব্দ। হাটে পৌঁছুলে আরেক রকম। তখন স্পষ্ট দর্শন স্পষ্ট শ্রুতি। তখন দেখছ দোকানি-খদ্দের, পসার-বেসাতি। তখন শুনছ আলু নাও, পয়সা দাও—এই সব রোল-বোল।'

কিন্তু এগিয়ে যে যাবে, প্রাণে একটি ব্যাকুলতা চাই। চাই একটি কস্তুরীগন্ধ। বিশ্বাসের অগ্নিদাহের সঙ্গে চাই ব্যাকুলতার তুফান।

শুধু এগুনো নয়, রামকৃষ্ণ আরো জোরালো ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলেন। বললেন, 'ঝাঁপ দাও। ঝাঁপ দিলে হবেই হবে।'

ও মন হবেই হবে।

এই ব্যাকুলতা হলে কী হয়?

কবিতার মত করে বললেন রামকৃষ্ণ, 'ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হয়। তখনই বোঝা যায় সূর্যোদয়ের আর দেরি নেই।'

'একজনের একটি ছেলে প্রায় যায়-যায়। কে তখন বললে, স্বাতী-নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই জল থাকবে মড়ার মাথার খুলিতে, তখন একটা সাপ তেড়ে যাবে এক ব্যাঙকে, ব্যাঙকে ছোবল মারবার জন্যে যেই সাপ ফণা তুলবে, অমনি ব্যাঙ যাবে পালিয়ে, লাফ দিয়ে, আর অমনি সেই সাপের বিষ পড়ে যাবে সেই মড়ার মাথার খুলিতে। সেই বিষজল যদি একটু খাওয়াতে পারো, তবেই বাঁচবে তোমার ছেলে।

দিন-ক্ষণ নক্ষত্র দেখে বেরুলো সেই ছেলের বাপ। বেরিয়েই খুঁজতে লাগল ব্যাকুল হয়ে। আর এক মনে ডাকতে লাগল ঈশ্বরকে। ডাকে আর এগোয় আর খোঁজে। ক্লান্তিহীন পথ ভাঙে বিরতিহীন অনুসন্ধানের। হঠাৎ দেখতে পেল মড়ার খুলি পড়ে রয়েছে এক পাশে। কিন্তু কোথায় বৃষ্টি! মেঘ করে এল দেখতে-দেখতে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তখন সেই লোক বললে ব্যাকুল হয়ে, গুরুদেব, আর কটি জিনিসের যোগাযোগ ঘটিয়ে দাও। ডাকছে এক মনে, এমন সময় দেখে, বিষধর সাপ! আনন্দে বুক দুরদুর করতে লাগল। তবে কি ব্যাঙও এসে পড়বে? ঘটবে কি সে অসম্ভব ঘটনা? নিশ্চয়ই ঘটবে। ব্যাকুলতার কাছে পাহাড় টলে সমুদ্র শুকোয় আবার মরা নদীতে কোটাল ডাকে। সাপের মুখে একটা ব্যাঙ এসে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি। ছেলের বাপ ডাকতে লাগল ব্যাকুল হয়ে, অনুসন্ধানের মধ্যে রেখে দিল একটি স্থির প্রতীক্ষা। অমনি এসে গেল ব্যাঙ!'

তারপর?

'তারপর যেমনটি হবার তেমনি হল। ব্যাঙকে সাপ তাড়া করলে। মড়ার মাথার খুলির কাছে যেই ব্যাঙ এল অমনি সাপ ছোবল তুলল। ব্যাঙ অমনি লাফিয়ে পড়ল ওদিকে, আর বিষ পড়ে গেল খুলির ভিতর। তখন ছেলের বাপের আনন্দ দেখে কে। সে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল।'

এমনি করেই ব্যাকুলতায় ফসল ফলে। শুকনো কাঠে মঞ্জরীরঞ্জন। যা ভাবনার বাইরে তাই হয় সহজ-সম্ভব। বুঝতেও দেয় না কি করে তা সম্ভব হল? এই সবে নৌকোতে পা দিলাম, কি করে কি হয়ে গেল, পালে লাগল কোন সদয় সমীর, দেখতে-দেখতে চলে এলাম ওপারের বন্দরে। কে যেন নিয়ে এল বায়ুভরে! ঊষর মরু দেখে বিরত হইনি, চেয়ে দেখলাম, ছায়া-শ্যামল হয়ে উঠেছে, ঘুমের মতই কেটে গিয়েছে দারুণ রাত্রি। এই ছিলাম পর্বতের পদমূলে, এই আবার শিখরমন্দিরে। একটি বাঁশির সুরের মত কেটে গিয়েছে দীর্ঘ পথ।

স্বাতীনক্ষত্রের বৃষ্টি, মড়ার মাথার খুলি, ব্যাঙ, পশ্চাদ্ধাবিত সাপ—আর সর্বোপরি মড়ার খুলিতে দংশনস্খলিত বিষ—রামকৃষ্ণ একটি অসম্ভবের তালিকা দিলেন। একটি আশ্চর্য তালিকা। কল্পনায় অভিনব। বর্ণনাব্যঞ্জনায় অপরূপ।

অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটছি দিন-রাত। তুমিই আমার সেই অসম্ভব। মাথা কুটতে-কুটতে এক সময় মুখ তুলে চেয়ে দেখি তুমিই কখন সুলভ-সম্ভব হয়ে উঠেছ। আমার সমস্ত প্রয়াস কখন তোমার প্রসাদে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি যদি ব্যাকুল হই, যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, সাধ্য কি তুমি কূলে বসে থাকো? আমি যদি অকূলে পড়ি, তুমি কি করে বসে থাকো গোকুলে?

ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হওয়া কি রকম জানো? রামকৃষ্ণ বললেন, 'যেমন কেরানির চাকরি চলে যাওয়া।'

একটি সাংসারিক, অথচ সার্থক উপমা।

কেরানির চাকরি ছুটে গেলে কেরানি কি করে? পাগলের মত ছুটোছুটি করে। এখানে যায় ওখানে যায় একে ধরে ওকে ধরে। জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেলে। দস্তখতের পর দস্তখত লিখে-লিখে হন্দ হয়ে যায়। মান-অপমান গায়ে মাখে না। যদি বলে ভাড়া দেব না ইণ্টারভিয়ুতে যেতে হবে দিল্লি, তাই ছোটে। যা কোনো দিন করেনি, ফুটপাতের জ্যোতিষীকে হাত দেখায়, চেনা হোক অচেনা হোক পথের ধারে একটা মূর্তি বা মন্দির দেখলেই মনে-মনে কপাল ঠোকে। বলে, তুমি যদি সত্যিই থাকো, আমি না বললেও তুমি আছ—আমার না-বলায় তোমার কী আসে যায়—তাই সত্যি যদি আছ, একটি চাকরি জুটিয়ে দাও। এমনি করে অনেক না-মানা জিনিস মানে, অজানা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। মোট-

কথা, একটি চাকরি চাই। যতক্ষণ না জুটছে ততক্ষণ ছুটছে যত্র-তত্র, আথাল-পাথাল করছে। আরেকটা চাকরি যোগাড় না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হচ্ছে না।

আমরা কি এই চাকরি-হারা কেরানির মত ছুটছি ব্যাকুল হয়ে? করছি হিল্লি-দিল্লি? তার যেমন জীবিকার জন্যে কাতরতা, আমাদের কি তেমনি জীবনের জন্যে অস্থৈর্য?

ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতার আরেকটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'কী হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শিষ্য এসে জিগগেস করলে গুরুকে। এস দেখিয়ে দিই। বলে গুরু তাকে নিয়ে গেল এক পুকুরে। জলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে রাখল জোর করে। শিষ্যের প্রাণ যায়! কতক্ষণ পরে তাকে তুলে দিলেন গুরু। জিগগেস করলেন, কেমন লাগছিল তোমার? শিষ্য বললে, প্রাণ আঁটুবাঁটু করছিল—প্রাণ যায়! গুরু বললেন ভগবানের জন্যে প্রাণ যখন অমনি যায়-যায় হবে, তখন জানবে দর্শনের আর বাকি নেই।'

আছি নিরন্তর হাঁপের মধ্যে। নীরন্ধ্র বন্ধকূপের মধ্যে। প্রাণ যায়! কোথায় আমার সেই খোলা মাঠের মুক্ত বাতাস! কোথায় আমার সেই সহজ নিশ্বাস! প্রাণ যায়-যায় না হলে আসবে কি প্রাণ-সম? আসবে কি প্রাণাধিক?

॥ ২৩ ॥

সাধন করবে কখন থেকে? সেই গোড়াগুড়ি থেকে। যত সকাল-সকাল যাত্রা তত ত্বরিত-তড়িৎ দর্শন।

'একজন গিয়েছিল যাত্রা শুনতে।' রামকৃষ্ণ গল্প বললেন : 'গিয়েছিল মাদুর বগলে করে। গিয়ে দেখলে যাত্রার দেরি আছে। বসে থেকে লাভ কি, মাদুর পেতে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন উঠলো, দেখলো সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন আর কি! তখন মাদুর বগলে করে ফিরে গেল বাড়ি।'

যখন একবার এসেছ এই বিশ্বসৃষ্টির 'যাত্রা' দেখতে, তখন বসে থাকো প্রতীক্ষা করে, বিলম্ব দেখে ঘুমিয়ে পোড়ো না। আরম্ভের বিলম্বটি কার? তোমার দেখার? না, তাঁর দেখানোর?

তাঁর দেরি হয় কই! তাঁর সূর্য ঠিক সময়ে রোজ ওঠে তোমার জানলায়। তাঁর পাখিটি ঠিক ডাকে তোমার নাম ধরে। তোমার চোখে চোখ ফেলে হাসবার জন্যে একটি প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে নিত্য জেগে আছেন তোমার পথের পাশে। বর্ষা হয়ে বিরহের আভাস আনেন, বসন্ত হয়ে মিলনের সূচীপত্র। তোমার জন্যে কবে থেকে তাঁর আরম্ভ, কত তাঁর ছোট-বড় আয়োজন! শুধু তুমিই দেরি করে ফেলছ! তোমার সময় অল্প, তাই যত শিগগির পারো আরম্ভ করে দাও। যত আগে রওনা হবে ততই আগে পাবে জায়গা।

প্রথম-প্রথম যা একটু নিয়মের কড়াকড়ি, শেষকালে অভ্যাসের অনায়াস। সব সাধনাতেই তাই। সেইটিই বোঝালেন নানা উপমায় :

'প্রথমেই বানান করে লিখতে হয়, তার পরে অমনি টেনে চলো।

সোনা গালাবার সময় লাগতে হয় খুব উঠে পড়ে। এক হাতে হাপর, এক হাতে পাখা, মুখে চোঙ, যতক্ষণ না সোনা গলে। গলার পর যেই গড়ানেতে ঢালা হল অমনি নিশ্চিন্ত।

ফুটপাতের গাছ চারা অবস্থায় বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে দেয়। তাই প্রথম অবস্থায় বেড়া দিতে হয়। আস্তে-আস্তে শেষে যখন গুঁড়ি হয়, তখন হাতি বেঁধে দিলেও গাছের কিছুই হয় না।'

দাও তাই একটি নিশ্চল নিষ্ঠা, একটি অশ্রুমার্জিত নির্জনতা। আমি যদি প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় না হই, প্রতীক্ষায় নির্বিচল না হই, তা হলে তোমাকে টলাব কি করে আসন থেকে? যদি নির্জন না হই তবে তোমার অনিমেষ নেত্রপাতটি অনুভব করব কি করে? যদি নিঃশব্দ না হই কি করে শুনব তোমার পদধ্বনি? যদি বিরলে না যাই তুমি আমার একাকী হবে কি করে?

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর আবার নির্জনে বসে মন্থন করো সে দই। তখনই তুলতে পারবে মাখন।'

আবার বললেন : 'নির্জন না হলে ভগবান-চিন্তা হয় না। সোনা গালাবার সময় যদি কেউ পাঁচবার ডাকাডাকি করে, তা হলে কেমন করে গলানো যায়? চাল কাঁড়বার সময় একলা বসে কাঁড়তে হয়। আবার মাঝে-মাঝে তুলে দেখতে হয়, কেমন পরিষ্কার হল। কাঁড়তে-কাঁড়তে পাঁচবার ডাকলে ভালো কাঁড়া হয় না।'

আমাকে নির্জন করো। জনতার মাঝে বাস করছি, তবু আমার অন্তরে রাখো একটি নিভৃতির শুচিতা। চারদিকে ভিড়, ঠাসাঠাসি, ঠেলা-ঠেলি, দাঁড়িয়ে আছি একে-অন্যের গা ঘেঁষে, তিলধারণের স্থান নেই কোথাও। তবু সেই স্থানহীনতায়ও যেন তোমার জন্যে একটি জায়গা থাকে। সে জায়গাটি থাকবে, আর কোথাও নয়, আমার হৃদয়ের পদ্মাসনে। যেন শত ভিড় হলেও তোমার স্থানের না অভাব হয়। বাইরে স্থান না হলেও অন্তরে যেন সংস্থান থাকে। চারদিকের কোলাহল ছাপিয়েও যেন শুনতে পাই অন্তরের সেই সকরুণ রাগিণী। সেই একতারার একাকী সুর। তোমাকে শোনবার জন্যে, তোমাকে দেখবার জন্যে, দাও আমাকে একটি গভীর নীরব শান্তি। তোমার সঙ্গস্পর্শটি পাবার জন্যে দাও আমাকে একটি অন্তরঙ্গ নিঃসঙ্গতা।

'কাঁচা মাটিতেই গড়ন হয়।' যত শিগগির সম্ভব, ছেলেবেলা থেকেই যে ঈশ্বরভাবনায় চালিত হওয়া দরকার সেই কথাটিই বোঝাচ্ছেন উপমা দিয়ে, 'পোড়ামাটিতে আর গড়ন চলে না। যার হৃদয় একবার বিষয়-বুদ্ধিতে পুড়ে গেছে, তার দ্বারা ভগবানলাভ কঠিন।'

'যেমন টিয়া পাখির গলায় কাঁটি উঠলে আর পড়ে না। ছানাবেলায় শেখালে শিগগির পড়ে। তেমনি বুড়ো হলে সহজে মন যায় না ঈশ্বরে। ছেলেবেলায়ই মন স্থির হয় অল্পেতে।'

আবার বললেন : 'সূর্যোদয়ের পরে দধি মন্থন করলে যেমন উত্তম মাখন উঠে থাকে, বেলা হলে আর তেমন হয় না।

এক সের দুধে এক ছটাক জল থাকলে সহজে অল্প জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করা যায়, কিন্তু এক সের দুধে তিন পোয়া জল থাকলে কি সহজে ক্ষীর হবে? শুধু কাঠ-খড় পোড়ানোই সার।

আম পেয়ারা ইত্যাদি আস্ত ফলই ঠাকুর সেবায় দিতে হয়। কাকে ঠুকরে দাগী করলে কি সে ফল দেবসেবায় দেওয়া চলে?'

দেরি করে ফেলেছি বলে কি তোমার করুণার দেরি হবে? তুমি তো আমার চেয়েও আমাকে বেশি জানো। তুমি তো জানো কেন আমার এত দেরি হল, কিসের মোহে ভুলে ছিলাম এত দিন? তুমি তো জানো, মুখে যাই বলি, কাজে যাই করি, মনে-মনে মন শুধু তোমাকেই চেয়ে-চেয়ে ফিরেছে। শুধু নেতির ঘরে গিয়ে-গিয়ে ঘুরে-ঘুরে এসেছি এত দিন, প্রেতির ঘরের ঠিকানা না পেয়ে। আমার দেরি, না, তোমার দেরি হল?

তুমি কেন এতদিন দেরি করে ঠিকানা জানালে তোমার? অন্তরে অন্তর্যামী হয়ে বিরাজ করছ আর জানছ আমার মনের সুদূরতম বাসনা, অথচ সব জেনে-শুনেও জানান দাওনি এত দিন। সে কি আমার অপরাধ? তুমি প্রিয়তম পরমস্নেহী হয়েও যদি এমন ছলনা করো তবে আমার উপায় কি।

কিন্তু আজ তোমার ছদ্মবেশ ধরে ফেলেছি। তোমার দেখা না পেলেও আজ তোমারই পথ চেয়ে বসে থাকব। তোমাকে না পাই কিছু যায়-আসে না। তবু তোমাকেই চাইব অহরহ। সঙ্গী-সাথী কেউ না-ই থাক, তোমাকে চাই—এই চাওয়াটিই নিলাম পথের সঙ্গী করে। তুমি কে জানি না, আমার এই চাওয়াটিই তুমি। না-পাওয়াটিও তুমি।

'নতুন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়, দই-পাতা হাঁড়িতে রাখতে গেলে নষ্ট হয় দুধ।' যুবক ভক্তদের লক্ষ্য করে বললেন রামকৃষ্ণ : 'ওরা যে নির্মল আধার, ঢোকেনি বিষয়বুদ্ধি।'

যদি কেউ নিঃশেষহীন নবীন থাকে, সে তুমি। তুমি পুরাতন হয়েও চিরনবীন, নিত্য নবীন। পুরাতনকে তো শুধু পুরা বললেই চলে, আবার পুরাণ বলি কেন? পুরাণ কথাটির মধ্যে 'ন'-টি কি আতিশয্য নয়? না, ঐ 'ন'-টির মধ্যে একটি সঙ্কেত রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। ঐ 'ন'-টি হচ্ছে নব বা নবীনের দ্যোতক। তার মানে তুমি পুরা হয়েও নবীন। তুমি শিকড়ে পুরোনো কিন্তু পল্লবে নবীন। তুমি মূলে পুরোনো কিন্তু প্রকাশে নবীন।

দিনে-দিনে আমিই কেবল পুরোনো হয়ে গেলাম। তোমার ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডটি পর্যন্ত নতুন। শুধু দিনে-দিনে আমিই ক্ষয় করে ফেললাম নিজেকে। তোমার দিন-রাত্রির আকাশের আলোটির একটুকু ক্ষয় হল না। জীবনের আরম্ভে যে নীল আকাশটি দেখেছিলাম আজ জীবনের প্রদোষেও সেই পরিচ্ছন্ন নীলিমাটিই দেখছি। দেখছি তোমার অপর্যাপ্ত প্রসন্নতা। আজও তার এতটুকু হ্রাস নেই। কত লোক চলে গেল জীবন থেকে, কিন্তু তোমার আকাশ-ভরা তারার হিসেবে এতটুকু কম পড়ল না। ভোরবেলায় তোমার সোনার হাসিটি আজও তেমনি অক্ষয় হয়ে আছে।

তুমি আমাকে ছোঁও। ছুঁয়ে আমাকে নবীন করে দাও।

নবীন হোক আমার চক্ষু, নবীন হোক আমার কর্ণ, নবীন হোক আমার রসনা।

আমার যাত্রা নতুন হোক, পন্থা নতুন হোক, লক্ষ্য নতুন হোক।
তুমি যে আমার চিরনতুন!

॥ ২৪ ॥

'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। জমিদার তার জমিদারির যে কোনো জায়গায়ই থাকতে পারে বটে, কিন্তু লোকে বলে অমুক বৈঠকখানায়ই তাঁর বিশেষ আনাগোনা।'

ভক্তির মানে কায়মনোবাক্যে ভজনা। কায় মানে, চোখে তাঁকে দেখা সর্বঘটে, কানে তাঁর নামকীর্তন শোনা। হাতে সেবা করা পায়ে তীর্থে যাওয়া। আর মন মানে, স্মরণ-মনন চিন্তন-অনুধ্যান। আর বাক্য মানে তাঁর কথনকীর্তন করা। ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি।

ভক্ত আছে মানেই ভগবান আছে। ধূম আছে মানেই আগুন আছে। সুবাসটি আছে মানেই ফুল আছে অদূরে। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বিশ্রাম। গল্প-গুজব রঙ-তামাশার আড্ডাখানা। রামকৃষ্ণ বলে দিলেন এক কথায় : 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।'

কলিযুগের পক্ষে যাগ-যোগ ক্রিয়া-কান্ড নয়, শুধু নারদীয় ভক্তি। একে পরমায়ু অল্প, তায় অন্নগত প্রাণ—কঠোর তপস্যা কি করে চলবে? তাই শুধু স্বচ্ছ শুদ্ধ ভালোবাসা!

এটিকেই প্রকাশ করলেন প্রতীকের সাহায্যে :

'আজকালকার ম্যালেরিয়া জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রুগী কাবু হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিকচার।'

ভালোবাসার টানে বেরিয়ে পড়ো। ঠিকানা জানে না অথচ প্রাণ যাই-যাই করে তার নাম ভক্তি। পথ ভুল হলেও শুধু গতির জোরে ভক্তি নিয়ে যাবে ঠিক জায়গায়।

'কার্তিক আর গণেশ ভগবতীর কাছে বসে আছে।' গল্প বললেন রামকৃষ্ণ, 'ভগবতী তাঁর গলার মণিময় রত্নমালা দেখিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে আগে ব্রহ্মান্ড ঘুরে আসতে পারবে তাকে এই রত্নমালা দেব। কার্তিক তো তক্ষুনি ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। গণেশ মাকে ভালোবাসে,

ভাবলে মা'র বাইরে আবার ব্রহ্মাণ্ড কি! মাকে আস্তে-আস্তে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে যেমনটি বসেছিল তেমনি বসে পড়ল। অনেক পরে কার্তিক ফিরে এল হন্তদন্ত হয়ে। এসে দেখল দাদা দিব্যি বসে আছেন হার পরে।'

ভগবানকে ভালোবাসতে পারার মত কিছু নেই। ভগবানকে যখনই 'আমার' বলব তখনই মমতায় সমস্ত মন বিগলিত হবে। চোখের জলে পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব। পাছে কাঁটা ফোটে দেহ বিছিয়ে দেব পথের উপর, যেমন গোপীরা দিয়েছিল বৃন্দাবনে।

পর্ণে যেমন দিয়েছ বর্ণ, ফুলে দিয়েছ সৌরভ, ফলে দিয়েছ স্বাদসুধা, তেমনি আমার হৃদয়ে ভক্তি দাও। এই ভক্তি তোমারই আনন্দের আত্মদান। তোমারই প্রসাধন। আমার নিজের রচনা নয় তোমারই নিজের রুচি। নিজের আস্বাদন।

'ভক্তের যে আমি,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'সে সোঽহং নয়, সে দাসোঽহং। এ আমি আমি-র মধ্যে নয়। যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। অন্য শাকে অসুখ করে, কিন্তু হিঞ্চে শাকে পিত্ত নাশ হয়। উলটে উপকার। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়, মিছরিতে অম্বল যায়। অন্য মিষ্টিতে অপকার। প্রণব বর্ণের মধ্যে নয়। তেমনি ভক্তি-কামনা কামনার মধ্যে পড়ে না।'

অহেতুক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। তোমার কাছে কিছু চাই না অথচ তোমাকে ভালোবাসি—এইটিই অতুলন। তুমি আমাকে বিশেষ কোনো একটা সুখের বস্তু দেবে, তার বিনিময়ে তোমাকে ভালোবাসব এই হীন কাঙালপনা থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। প্রত্যক্ষে-অলক্ষ্যে তুমি যে আমাকে কত দিয়েছ, কত দিচ্ছ দিন-রাত তার কি কোনো হিসেব আছে? জীবনের পেয়ালা বারে-বারে ভরে দিয়েছ সুধা ঢেলে। বারে-বারে তা পান করে পেয়ালা খালি করেছি, আবার রিক্ত পেয়ালা তুলে ধরে ভিক্ষে করেছি তোমার স্নেহসিক্ত সুধাসার। আবার পেয়ালা উপচে পড়েছে। তবু কি ভালোবেসেছি তোমাকে?

আর সয় না এ কাঙালপনা। ভিক্ষার পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি ভেঙে। এবার আমি আর নেব না, এবার আমি দেব। এবার তুমিই কাঙাল হয়ে আমার দুয়ারে এসে হাত পাতবে। তোমার দু হাত আমি ভরে দেব ভালোবাসায়।

যদি একবার ভালোবাসা জাগে তবে কি আর সুখকামনা থাকে? তখন

কি আর কেউ বলে, আমাকে সুখে রাখো? তখন বলে, আমাকে তোমার কোলে রাখো। আমি সুখ-দুঃখ সম্পদ-দারিদ্র্য বুঝি না, আমি বুঝি তোমার সুনিবিড় উৎসঙ্গ।

তোমার দীপান্বিতার রাত্রিতে আমিও একটি বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ দীপ। জ্বলছি মিটমিট করে। তুমি আমাকে তেল দিয়েছ বলেই তো দিচ্ছি এই আলোটুকু। কাঙালের মত চাইব না আর তেল। যদি দীপ নিবে যায় দেব তোমাকে একটি শোভন শান্ত অন্ধকার। এই অন্ধকারটিই আমার ভালোবাসা। আমার ভালোবাসার ঘর অন্ধকার করে দিলেই তুমিও আসবে অন্ধকারের মত।

'তিন বন্ধু বন দিয়ে যেতে-যেতে একটা বাঘ দেখতে পেল,' গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ : 'একজন বললে, ভাই, আমরা সব মারা গেলুম। আরেক বন্ধু বললে, কেন, মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি। তৃতীয় বন্ধু বললে, না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কী হবে? এস এই গাছে উঠে পড়ি।

যে লোকটি বললে, আমরা মারা গেলুম, সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন। সে অজ্ঞানী। আর, যে বললে, এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি, সে জ্ঞানী। তার বোধ আছে যে ঈশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করছেন। আর, যে বললে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি, তার ভিতরে ভালোবাসা জন্মেছে। প্রেমের স্বভাবই এই আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে সে ভালোবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে।'

রসেই হবে রসবর্ষণ। আমার ভিক্ষা আনবে তোমার দান। আমার কান্না আনবে তোমার অনুকম্পা। কিন্তু আমার ভালোবাসা আনবে তোমার ভালোবাসা। তখন কে দেবে কে নেবে আর প্রশ্ন নেই। তখন তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে, আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে!

শাস্ত্রে বলে তাই ভক্তি করছি তাকে বলে বৈধী ভক্তি। কিন্তু অকারণ ভালোবাসা থেকে যে ব্যাকুলতা হয় তাকে বলে রাগ-ভক্তি।

একটি উজ্জ্বল উপমার সাহায্যে ছবি তুললেন রামকৃষ্ণ : 'বাঁকা নদী দিয়ে গন্তব্যস্থানে যেতে অনেক সময়, অনেক কষ্ট। কিন্তু যদি একবার বন্যে হয়, তা হলে সোজাপথে অল্প সময়ের মধ্যেই চলে যাবে। তখন ডাঙাতেই এক বাঁশ জল। প্রথম অবস্থায় ঘুরতে হয় অনেক, পোয়াতে হয় অনেক হাঙ্গামা। কিন্তু রাগভক্তি এলে সব জলের মত সোজা।'

জল ছেড়ে আবার নিলেন স্থলের উপমা :

'মাঠে ধান কাটার পর আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে যেতে হয় না। তখন যেখান দিয়ে ইচ্ছে যাওয়া যায় এক টানা। যদি পায়ে জুতো থাকে, তার মানে, যদি গুরুবাক্যে বিশ্বাস আর বিবেকবৈরাগ্য থাকে, তা হলে সামান্য খোঁচা-খোঁচা খড় থাকলেও কষ্ট নেই।'

একবার আনো সেই ভাবের বন্যা। তখন বন মনে হবে বৃন্দাবন, সমুদ্র মনে হবে নীল-যমুনা। সমস্ত সংসার দেখবে ভগবন্ময়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় তার উপর পর্যন্ত মমতা থাকবে না। ঘুচে যাবে সব স্বার্থের শৃঙখল, অহঙকারের নাগপাশ। যাঁর কোনো দাবি নেই অথচ যিনি সমস্তই ত্যাগ করেছেন আমাদের জন্যে, ভাবের বন্যায় তাঁর মতই ত্যাগী হব। প্রেমেরই আরেক নাম ত্যাগ।

প্রয়োজন নেই তাঁর, তবু তাঁর এত প্রেম। তেমনি কামনা নেই আমার তবু তাঁকে আমি ভালোবাসি। যেমন তাঁর অকারণ সৃষ্টি তেমনি হোক আমার অকারণ ভালোবাসা। কেন ভালোবাসো ভগবানকে? কেন ভালো-বাসি তা জানি না। ভালোবাসি বলে ভালোবাসি। ভালোবাসতেই ভালো লাগে।

একটি অপূর্ব উদাহরণ দিলেন রামকৃষ্ণ। দৃষ্টান্তটি গল্পের আকারে :

'মনে করো তুমি এক জ্ঞানী-গুণী বড়লোকের বাড়ি গেছ তাকে দেখতে। তার কাছে তোমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই—শুধু তাকে তুমি দেখতে চাও, তাকে দেখতেই তুমি ভালোবাস। তুমি গেলে তার বাড়ি, তার বৈঠকখানায়—সে তোমাকে চেনে না, দেখা হতেই সে কুণ্ঠিত হয়ে শুধোল : কি চান মশাই? কিছুই চাই না—তুমি বললে বিনীতস্বরে, এই আপনাকে একটু দেখতে এসেছি। এ আবার কি রকম আসা! বড়-লোক কিছুতেই তোমাকে বিশ্বাস করবে না, চোখ বাঁকা করে তাকাবে, ভাববে নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তুমি চলে গেলে। তারপর আবার আরেক দিন গিয়েছ। কি চান মশাই? সন্দিগ্ধ কণ্ঠে আবার জিগগেস করল বড়লোক। কিছুই চাই না, শুধু আপনাকে একটু দেখতে এসেছি। বড়লোক আবার দৃষ্টি কুটিল করবে। ভাববে নিশ্চয়ই কোনো ছদ্মবেশী শত্রু, নয়তো গুপ্তচর। নিশ্চয়ই কোনো মন্দ অভিসন্ধি আছে। চোখ নামিয়ে নেবে তোমার থেকে। তোমার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, তুমি আবার আরেক দিন গিয়ে হাজির। এমনি কদিন পরে-পরেই, শেষ-

কালে, নিত্যি। কি চান মশাই? কিছুই চাই না, শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। বড়লোক এদিকে খোঁজ নিয়েছে তোমার সম্বন্ধে, কিন্তু কোনো আকাঙ্ক্ষা বা কোনো অভিসন্ধির পাত্তা পায়নি। তখন আস্তে-আস্তে বড়লোকের মন টলবে। তোমাকে বলবে, বসুন। শেষে একদিন কাঁধে হাত রেখে বলবে, এত দেরি করে এলে কেন ভাই। তোমাকে না দেখে যে থাকতে পারি না।

এরই নাম অহেতুকী ভক্তি।

কিন্তু তুমি যদি বড়লোকের কাছে গিয়ে বলতে, আমি আপনার প্রতিবেশী, আপনার গাড়িতে একটু চড়তে দেবেন? প্রথম দিন হয়তো দেবে ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু আবার আরো একদিন গিয়ে যদি চাও সেদিন চড়তে দিলেও কাছে বসতে দেবে না। বসতে বলবে কোচোয়ানের বাক্সে। আরো একদিন চাইলে সরাসরি মুখের উপর না করে দেবে। কিছু চাইতে গেলেই এই দুর্ভোগ। তোমার দর্শনেই তার বিরক্তি—'

তেমনি ভগবানের সম্পর্কে।

তাঁর কাছে তুমি বসেছ আসন পেতে। তিনি জিগগেস করলেন তোমাকে, কি চাই? তুমি বললে, কিছুই চাই না, শুধু তোমাকে দেখতে এসেছি। ভগবান তোমাকে পরখ করবেন নানা ভাবে, যাচাই করে দেখবেন সত্যই তুমি নিরাকাঙ্ক্ষ কিনা। যখন নিঃসন্দেহ হবেন তোমার কোনোই কামনা-বাসনা নেই, তখন একদিন হাত রাখবেন তোমার কাঁধের উপর। বলবেন, এত দেরি করে এলে কেন ভাই। তোমাকে না দেখে যে থাকতে পারি না।

কিন্তু ধরো কামনা করে বসলে ভগবানের কাছে। ভগবান তোমার কামনা পূর্ণ করলেন। কিন্তু কামনা পূর্ণ হলেও সুখ হল না। পুত্র চেয়েছিলে, পুত্র কুলাঙ্গার হল। ধন চেয়েছিলে ধনের জন্যে গৃহবিভেদ হল। একটা মোটরগাড়ি চেয়েছিলে হয়তো সেটা প্রতিবেশীর ছেলেকে চাপা দিলে। তখন মনে হবে বঞ্চনাটাই করুণা।

তাছাড়া আমি কি সত্যিই জানি কি আমার চাই, কি হলে আমার বাসনার উপশম হবে? কি পেলে কি খেলে আমি হজম করতে পারব? তাও তো আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তা হলে তোমার কাছে চাইতে যাই কেন, কেন মিছিমিছি তোমার কাছে চেয়ে তোমাকে ক্লেশ দিই। তার চেয়ে তোমাকে ভালোবাসি, তোমার উপরেই সব ভার

সমর্পণ করেছি। তুমি যা ভালো বোঝো তাই করবে। তুমিই বুঝবে কি আমার রুচিকর নয়, কি আমার উপযোগী। কিসে আমার ভালো হবে। যদি বোঝো বঞ্চনাতেই আমার কল্যাণ, তবে তোমার সেই বঞ্চনাই আমি আস্বাদ করব তোমার অকৃপণ করুণার মত।

॥ ২৫ ॥

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'রাজার বেটা হ, মাসোয়ারা পাবি।'

আমাদের শুধু মাসোয়ারার দিকেই নজর। রাজার বেটা হবার দিকে লক্ষ্য নেই।

কেন চেয়ে-চেয়ে নিজেদের ছোট করি, যার কাছে চাইছি তার ঘটাই অবমাননা? যাঁর ব্রহ্মাণ্ডভরা ভাণ্ডার তাঁর কাছে কী চাই কটা ছোট-খাটো পার্থিব জিনিস টাকা-কড়ি, বাড়ি-গাড়ি, মান-যশ, প্রভাব-প্রতাপ? আমি কেন তাঁকে আমার চাওয়া দিয়ে সীমাবদ্ধ করি? তিনি ক্ষুদ্র একটি ধূলিকণাতেও অসীম। তাঁর ঐশ্বর্যের কি শেষ আছে?

আমাদের কত বড় রাজা! এমন বিচিত্র তাঁর রাজত্ব আমরা আবার প্রত্যেকেই রাজা। আমরা তাঁরই বিন্দু-বিন্দু প্রতিবিম্ব। তাঁর রাজত্বে যেমন আমাদের বাস, আমাদের রাজত্বেও আবার তাঁর বসতি। আমাদের রাজত্ব সীমা টেনে। তাঁর রাজত্ব অনন্তে। অন্ত আর অনন্ত দুটি পাখি। কিন্তু বসেছে একেবারে পরস্পরের গা ঘেঁষে। একটি নইলে আরেকটি অচল। আরেকটি নির্বাক।

এদের যে যোগ সেটা হচ্ছে প্রেমের যোগ। সীমা কাঁদে অসীমের জন্যে, অসীম কাঁদে সীমায়িত হবার পিপাসায়।

'দুই কাঁটা এক হওয়ার নামই যোগ।' যোগের তত্ত্বটি মধুর উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ : 'নিক্তির একদিকে ভার বেশি হলে উপরের কাঁটা ও নিচের কাঁটার মুখ এক হয় না। উপরের কাঁটা ঈশ্বর, নিচের কাঁটা মানুষের মন। এই দুই কাঁটা এক হওয়ার নামই যোগ। ঠিক দুপুরে ঘড়ির দুটো কাঁটা যেমন এক হয়ে যায়—তেমনি।'

যেন চুম্বক আর ছুঁচ। একে অন্যেকে টেনে নিলেই যোগ।

'কিন্তু ছুঁচে মাটি মাখানো থাকলে চুম্বক টানে না।' বললেন রামকৃষ্ণ :

'তবে মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কিন্তু মাটি ধোবে কি করে? চোখের জলে মাটি ধোবে। তখন ঠিক টেনে নেবে চুম্বক। সেই টান হলেই যোগ।'

এই কথাটিই আবার বলেছেন অন্য ভাবে :

'শুধু কাঁচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি মাখানো কাঁচের উপর ছবি ওঠে। যেমন ফোটোগ্রাফ। তেমনি মনে ভক্তি-রূপ কালি মাখিয়ে নাও, ভগবানের ছবি উঠবে।'

অন্তরে যদি ভক্তি থাকে তবে আর ভয় নেই। 'তখন,' বললেন রামকৃষ্ণ : 'পায়ে যেন জুতো পরে নিয়েছিস। জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটা-বনেও যাওয়া যায় অনায়াসে।'

আমার আর কিসের ভয়। দুই কাঁটা এক করে নেব। নয়নতারাকে মিলিয়ে নেব ধ্রুবতারার সঙ্গে। আমি যেখানে যাব সেখানে তোমাকেও নিয়ে যাব। কিংবা সেখানেই আমি যাব যেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। একবার যখন তুমি হৃদয়ে এসে বসেছ তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আমার হৃদয় হয়ে উঠেছে, তুমিময় হয়ে উঠেছে। যা আছে ভাণ্ডে তাই ব্রহ্মাণ্ডে। আমার আর ভয় কি। আমি তো পথের দিকে চেয়ে চলছি না, পড়লুম কি উঠলুম—আমি চলেছি ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে। যদি তোমার মুখ একবার দেখি তখন কি আর পথ দেখবার সময় হবে। তখন তুমিই পথ তুমিই রথ, তুমিই চক্র তুমিই কেন্দ্র, তুমিই গতি তুমিই ইতি।

কত সাধন করলুম তোমার জন্যে তবু তোমাকে পেলুম না—এ নালিশ আমি করব না কোনোদিন। আমি যে তোমাকে ভালোবাসতে পারছি এই আমার আনন্দ। সুখের বিপরীত দুঃখ, বিষাদের বিপরীত প্রসাদ। কিন্তু আনন্দের কোনো বিপরীত নেই। সে সব সময়েই আনন্দ। সে নির্বিশেষ, বিষয়বিরহিত। তাই আমার সুখেও আনন্দ দুঃখেও আনন্দ। চাওয়াতেও আনন্দ, না-পাওয়াতেও আনন্দ!

আমার তো বৈধীভক্তি নয়, যে, এত জপ এত ধ্যান এত যাগ এত যজ্ঞ করব। আমার হল রাগভক্তি। আমার শুধু ভালোবাসা। আমার শুধু কান্নার আনন্দ। বৈধীভক্তি, রামকৃষ্ণের কথায়, 'হতেও যেমন যেতেও তেমন।' দুঃখ করে বলে, কত ভাই হবিষ্য করলুম, কতবার বাড়িতে পুজো দিলুম, কিছুই হল না। রাগভক্তির আপশোষ নেই। তার পতন

নেই বিচ্যুতি নেই। সে হচ্ছে খানদানি চাষা, দু দিনের ভুঁইফোঁড় চাষা নয়।

সুন্দর একটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'যারা নতুন চাষ করে, মানে যাদের বৈধীভক্তি, তাদের যদি ফসল না হয় জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা, মানে যাদের রাগভক্তি, তাদের ফসল হোক আর না হোক, আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ-পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে তারা জানে যে চাষ করেই খেতে হবে।'

আমাকে চাষ করতে দাও। তোমার কৃপাবারি যদি বর্ষণ না-ও করো, দাও আমাকে চোখের জল ফেলতে। চোখের জলে শুষ্ক মাটি সিক্ত করতে। হাজা-শুকোয় পুড়ে যাক মাটি, ফসলের আশায় বাজ পড়ুক, তবু চাষ করতে দিও বছর-বছর। চেয়ে থাকতে দিও ঊর্ধ্বমুখে তোমার করুণাবাহী বারিবাহের জন্যে। শোভন-শ্যামলের দেখা না পাই আমি থাকব আমার এই তাপ আর তৃষ্ণার তপস্যায়।

আমার এই প্রতীক্ষাই ভিক্ষা। প্রতীক্ষাই প্রাপ্তি।

'জটিল বালক রোজ বনের পথ দিয়ে একলা পাঠশালায় যায়।' গল্প ফাঁদলেন রামকৃষ্ণ : 'যেতে বড় ভয় করে। মা বললেন, ভয় কি? তোর তো মধুসূদনই আছে। মধুসূদনকে ডাকবি। জটিল জিগগেস করলে মধুসূদন কে? মধুসূদন তোর দাদা। বলে দিলেন মা। তখন, পরের দিন, একলা পথে যেতে যাই জটিল ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকে উঠেছে—মধুসূদন দাদা! কেউ কোথাও নেই। শুধু বনের জটিলতা! তখন কেঁদে উঠল অবোধ ছেলে : কোথায় দাদা মধুসূদন, তুমি এসো, আমার বড় ভয় পেয়েছে। তখন ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, এই যে আমি, ভয় কি! এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। বললেন, যখনই তুই ডাকবি, আসব। ভয় নেই। ভয় কি!'

জটিলকে সহজ করে দাও। সহজ করে দাও এই বালকের মত বিশ্বাসে, বালকের মত ব্যাকুলতায়। যিনি ত্রিভুবনপালক তিনিও গোপাল-বালক। ছোটটি না হলে ভক্তের বাড়িতে ঢুকবেন কি করে? দরজার চৌকাঠে যে মাথা ঠেকে যাবে। ভক্তের বাড়িতে এসে তিনি তো আর সিংহাসনে বসতে চান না, বসতে চান কোলের উপরে। ছোট ছেলেটি না হলে কোলের উপর বসবেন কি করে?

ঈশ্বরের বালকস্বভাবের একটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ :

'ঈশ্বর বালকস্বভাব। যেমন, ধরো, কোনো ছেলে কোঁচড়ে রত্ন লয়ে বসে আছে। রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে কত লোক, লক্ষ্যও করছে না। কেউ যদি তার কাছে এসে রত্ন চায়, কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না, কিছুতে দেবো না। আবার হয়তো যে চায়নি, চলে যাচ্ছে আপন মনে, তারই পিছু-পিছু দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে সমস্ত—'

আবার আরেকটি ছবি :

'বালকের আঁট নেই। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেবে তো, ধেই-ধেই করে নেচে কাঁদতে আরম্ভ করবে। আবার কি খেয়ালে নিজেই ভেঙে ফেলবে সব। এই, কাপড়ে এত আঁট, বলছে আমার বাবা দিয়েছে, আমি কাউক্কে দেব না। আবার একটা পুতুল দিলেই পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চলে যায় আরেক দিকে।'

বালক আছে ঈশ্বরের কাছাকাছি। তেমনি যে ঈশ্বরের কাছাকাছি হবে সেও বালক হয়ে যাবে। তেমনি সরল, তেমনি বিশ্বাসী, তেমনি নিরাসক্ত, তেমনি কলঙ্ককালিমাশূন্য। উদাসীন শিশু ভোলানাথ।

দেশের ছেলে শিবুর গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'শিবু তখন খুব ছেলেমানুষ—চার-পাঁচ বছরের হবে। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। শিবু বলছে জ্ঞানীর মত মাথা নেড়ে, খুড়ো, ঐ চকমকি ঝাড়ছে। একদিন দেখি, ফড়িং ধরতে যাচ্ছে একলা। কাছেই গাছের পাতা নড়ছিল। তাই দেখে পাতাকে বলছে, চুপ-চুপ, আমি ফড়িং ধরব। সব চৈতন্যময় দেখছে বালক। চাই এমনি বালকের সরল বিশ্বাস। বালকের বিশ্বাস না হলে পাওয়া যায় না ভগবানকে।'

প্রকাশই তো সত্তা। আমি যে আছি তার মানে আমি প্রকাশিত হয়ে আছি। যা ভাবছি বা করছি, নিজেকে প্রকাশিত করব বলেই। আমাদের করা শুধু এই হওয়ারই জন্যে। প্রকাশই সত্য, প্রকাশই স্থির।

আমি একটি শুচি-শুদ্ধ প্রসন্ন-পরিপূর্ণ বালকে প্রকাশিত হব। শুক্তিকে বিদীর্ণ করে বিকশিত হব মুক্তোয়। সেই তো আমার মুক্তি।

॥ ২৬ ॥

'তবে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। ছুঁচে সুতো

পরাচ্ছ, কিন্তু সুতোর ভেতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর আর প্রবেশ করবে না।'

তার মানে কামনার তন্তুলেশ থাকলেই বন্ধন। যা তন্তু তাই শেষে রজ্জু। যা মাল্য তাই শেষে শৃঙ্খল।

চারদিকে মায়ার জিনিস ছড়িয়ে রেখেছেন ঈশ্বর, আমাদের মন ভোলাবার জন্যে। যদি তা দেখে তাঁকে ভুলে যাই তবেই সেটা মায়া। আর যদি তা সত্ত্বেও তাঁকেই মনোহরণ বলে দেখি ও অনুভব করি তবেই সেটা সত্য।

সংসারে কাম-কাঞ্চনের মধ্যে থাকতে-থাকতে আর মান-হুঁস থাকে না। কেমন যেন নিস্তেজ নিশ্চেতন হয়ে পড়ে। আমরা যে অমৃতের সন্তান, ব্রহ্মময়ীর বেটা, তাই ভুলে থাকি।

নানা উপমায় প্রকাশ করেছেন এই অবস্থাটা :

'ময়লার ভার বইতে-বইতে মেথরের আর ঘেন্না হয় না। বিশালাক্ষীর দু—নৌকো একবার দহে পড়লে আর রক্ষে নেই। কেল্লায় যাবার সময় একটুও বোঝা যায় না যে গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভেতরে গাড়ি পৌঁছুলে দেখা গেল যে চারতলা নিচে নেমে এসেছি।'

'ভূতে যাকে পায় সে নিজে বুঝতে পারে না যে ভূতে পেয়েছে।'

তাই তো সকাতর প্রার্থনা করছি মায়ার কাছে, মায়া তুমি সরে দাঁড়াও। যার তুমি ছলনা তাকেই দেখতে দাও শান্তিতে। মেঘ হয়ে তুমি ঢেকে রেখো না সূর্যকে। ধূলি হয়ে আকাশকে। তুমি উড়ে যাও দূরে যাও। কিংবা যদি বা না যাবে, দেখাও তুমি আর কিছু নয়, তাঁরই ছায়া। তাই ছায়াকে দেখে যেন সেই কায়াকেই ধরতে যাই। তুমি শুধু ভুল হয়েই থেকো না, ভুলকে ফুলে পরিণত কোরো। যেন সেই ফুলটিকে তাঁর চরণে দিতে পারি ফেরাফিরতি।

বিষয়-বিষ-বিকার হয়েছে সংসারীর। জমি, টাকা আর স্ত্রী—এই তিনটি জিনিসের উপরই তার বেশি মন। এই তিনের উপরে মন রাখতে গেলেই ভগবানের সঙ্গে আর যোগ নেই।

এই তিন টান ছেড়ে আর-তিন টান নাও। বললেন রামকৃষ্ণ :

'বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপরে টান আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি মেশে এসে কারু রক্তে, তবে সে সটান ঈশ্বরের কাছে এসে পৌঁছুবে।'

কিন্তু তুমিই আমাকে টানবে আমি তোমাকে টানব না? তুমিও কি কাঙালের বেশে বেরিয়ে পড়নি অভিসারে? তোমার তরী কি আমার ঘাটে এসে ভিড়বে না? আমি যদি একটি পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে পারি, আঁচলের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখতে পারি তার ক্লান্তিহীন শিখাটিকে, তবে কি তুমি সেই আলোতে পথ চিনবে না? আমাকে পেরিয়ে গেলেই কি তুমি পার পাবে? আমার মাঝে তোমার বিচিত্র লীলা হবে বলেই তো আমি এখানে এসেছি। হোক তা বৈফল্যের লীলা, তবু তা তোমারই তো বিলাস-বিভ্রম। তুমি যে বিশাল বিশ্ব সংসারের ছক পেতেছ তাতে আমিও তো একটা ঘুঁটি—আমাকে ছাড়া সম্পূর্ণ হবে না তোমার শতরঞ্জ খেলা। আমি ছাড়া কে প্রকাশ করবে তোমার এই বিশেষ ব্যঞ্জনাটি? ওটির জন্যেই তো আমি। আমার হৃদয়ে বাস করছে যে বিনিদ্রা বিরহিনী সে যতই হতভাগিনী হোক, তোমার বরমাল্যটি তারই জন্যে।

'সব কলায়ের ডালের খদ্দের।' সংসারী লোকের সংজ্ঞা দিলেন রামকৃষ্ণ। শুধু তাই নয়, আরো সুন্দর প্রতীক অবলম্বন করলেন :

'খই যখন ভাজা হয় দু চারটে খই খোলা থেকে টপটপ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকাফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, গায়ে দাগ থাকে একটু। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকাফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাকলে একটু লালচে দাগ হতে পারে।

সংসারী জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে সে দাগে কোনো ক্ষতি নেই। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।'

মলিন কামনা, মলিন সঞ্চয়, মলিন অহঙ্কার—বহু ক্লেদকলুষের দাগ ধরা এই জীবন। একে পরিমার্জন করো। অশ্রুজলে স্নান করিয়ে দাও। দাও তোমার করুণা-রস-বর্ষণ। অশ্রুজলই তো তোমার করুণার আসার। তাইতেই আমি শান্ত হব শীতল হব, আমার গায়ে লাগবে সৌরভস্পর্শ। আমাকে করো তুমি মৃদুগন্ধ শুভ্র মল্লিকাফুল।

কি করে বিভ্রান্ত হয় সংসারী জীব তারই আরেকটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ :

'চালের আড়তে বড়-বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ইঁদুর-গুলো ঐ চালের সন্ধান পায় তাই দোকানদার একটা কুলোতে করে

খই-মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই-মুড়কি মিষ্টি লাগে, আর সোঁদা-সোঁদা গন্ধ লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র-মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর পায় না।

কিন্তু দেখ, এক সের মালে চৌদ্দগুণ খই হয়। কামিনীকাঞ্চনের আনন্দের অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশি।'

যিনি বিশ্বপ্রকৃতিতে এত সুন্দররূপে বিরাজমান, তিনি আমাদের হৃদয়েও এই সুন্দররূপেই আছেন প্রচ্ছন্ন হয়ে। আমাদের কামনাই তাঁকে আবৃত করে আচ্ছন্ন করে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই কামনার আবরণটুকু না সরালে পরমকামনীয়কে দেখতে পাব না। আমার লুব্ধতা আমার ভীরুতা আমার অসহিষ্ণুতাই বাধা। আমি নিজেকে আর দেখতে চাই না। আমি এখন তোমাকে দেখি! আমাকে অপ্রমত্ত করো, বীর্যবান করো, প্রতীক্ষায় পরিপূর্ণ করো, ছিঁড়ে দি ঐ বন্ধ বাসনার বধির যবনিকা। সুন্দরকে সত্যদৃষ্টিতে একবার দেখি। দেখি ঐ তারকিনী রাত্রির দীপাবলীতে, দেখি ঐ তৃণাঞ্চিত প্রান্তরের শ্যামলতায়।

হায়-হায়, ঈশ্বরের যে সঙ্গ করবে সংসারী লোকের অবসর কই?

মজার একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বললে, একটি ভালো পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষ দেখতে হয়। চারখানা লাঙল, আটটা হেলেগরু। সর্বদা তদারক করতে হয় কিনা, অবসর নেই। তখন, যে লোক পণ্ডিত চেয়েছিল, বললে, আমার এমন পণ্ডিতের দরকার নেই যার অবসর নেই। লাঙল-হেলেগরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন পণ্ডিত চাই যে আমাকে ভাগবত শোনাতে পারে।'

ভগবৎকথা ছেড়ে লাঙল-গরুর কথায় বেশি স্পৃহা। যে শান্তি বা সন্তোষের দাম হত লক্ষ টাকা তা ফেলে পাঁচসিকে-পাঁচআনার সন্ধান।

সময় নেই, সময় নেই। সমস্ত সংসার সরে-সরে যাচ্ছে আর বলছে, সময় নেই। ঈশ্বরকে ডাকবার, জানবার, ধরবার সময় নেই। কত কাজ, কত সংকল্প, কত প্রগতি! সত্যি সময় নেই—তাই তো এত ত্বরা করছি তোমাকে ধরবার জন্যে, আকুলতায় এত কাতরতা মিশিয়েছি তোমাকে ডাকবার জন্যে। দিন-রাত্রির সব কটি মুহূর্ত জ্বালিয়ে রেখেছি রক্তের প্রদীপে যদি কখনো না কখনো তোমার দেখা পাই।

না-ই বা পেলাম তোমাকে। এই শুধু জানি, সময় নেই, ছুটতে হবে, নিজেকে বিসর্জন দিতে হবে নিঃশেষে। পাওয়া মানেই তো থামা। পাওয়া মানেই তো পর্যাপ্তি। আমি তাই নিতে চাই না, পেতে চাই না, শুধু দিতে চাই। দেওয়া মানেই তো চলা। দেওয়া মানেই তো অসীম হওয়া, অফুরন্ত হওয়া।

আমি আলো দেব হাসি দেব সুর দেব স্নেহ দেব—
কে নিবি আয়! সময় নেই, সময় নেই!

॥ ২৭ ॥

সংসারী লোক সব স্ত্রীর দাস। এই বক্তব্যটিই কেমন রসালো করে বললেন রামকৃষ্ণ :

'যত সব দেখিস হোমরাচোমরা বাবুভায়া, কেউ জজ কেউ মেজেষ্টর, বাইরেই যত বোল-বোলাও—স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম। অন্দর থেকে কোনো হুকুম এলে অন্যায় হলেও সেটা রদ করবার কারু ক্ষমতা নেই। ভালোই হোক মন্দই হোক নিজের-নিজের পরিবারকে সকলেই সুখ্যাত করে। স্ত্রীকে বোধ হয় অমন আপনার লোক পৃথিবীতে আর হবে না। যদি জিগগেস করো, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলবে, আজ্ঞে খুব ভালো।'

তারপর দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বললেন :

'একজন একটি কর্মের জন্যে আফিসের বড়বাবুর কাছে আনাগোনা করে হায়রান হয়ে গেল। বড়বাবু বললেন, এখন খালি নেই, তবে মাঝে-মাঝে এসে দেখা কোরো। যতবার যায় দেখা করতে ততবার ঐ কথা। অনেক কাল কেটে গেল, চাকরি আর হয় না। সেই কথাই দুঃখ করে একদিন বন্ধুকে বলছে সে উমেদার। বন্ধু বললে, তোর যেমন বুদ্ধি। ওটার কাছে আনাগোনা করলে কিচ্ছু হবে না। তুই এক কাজ কর, গোলাপীকে ধর, কালই তোর কাজ হয়ে যাবে। উমেদার বললে, সত্যি? তবে এক্ষুনি আমি চললাম তার কাছে। গোলাপীর কাছে এসে সেই উমেদার বললে, মা, আমি মহাবিপদে পড়েছি। অনেক দিন কাজকর্ম নেই, ছেলেপিলে না খেতে পেয়ে মারা যায়! ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই,

আপনি একবার বলে দিলেই আমার একটি কর্ম হয়। গোলাপী বললে, বাছা কোন বাবুকে বললে হয়? উমেদার বললে, আপনি দয়া করে যদি বড়বাবুকে একটু বলে দেন তাহলেই হয়ে যায়। গোলাপী বললে, আজই বাবুকে বলে ঠিক করে রাখব। পরদিন সকালেই খবর এল সেই উমেদারের কাছে, আজ থেকেই বড়বাবুর আপিসে বেরুতে হবে। সাহেবকে বড়বাবু বোঝালে, এ খুব উপযুক্ত লোক, এর দ্বারা আফিসের বিশেষ উপকার হবে। একে তাই বহাল করেছি।'

সংসারে দু রকম স্বভাবের লোক আছে। একটি গ্রাম্য অথচ সমীচীন উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'কতকগুলোর স্বভাব কুলো, কতকগুলোর চালুনি। কুলো অসারবস্তু ত্যাগ করে সারবস্তু গ্রহণ করে। আর চালুনি? চালুনি সারবস্তু ত্যাগ করে অসার বস্তুগুলি নিজের মধ্যে রেখে দেয়।'

সংসারে সঙও আছে সারও আছে। সঙ হচ্ছে মায়া, সার হচ্ছে ভগবান।

সঞ্চয়ে মানুষের স্পর্ধা, ত্যাগে মানুষের মহত্ত্ব। তার সার্থকতা ভূরিতায় নয়, ভূমায়। তার মধ্যে যে অর্থটি অন্তর্নিহিত আছে সেটিকে প্রকাশিত করা, উচ্চারিত করাই তার সাধনা। সে অর্থের উচ্চারণ উপকরণে নয়, আত্মার লাবণ্যবিস্তারে। যিনি আমারো মধ্যে অসীম হয়ে বিরাজ করছেন তাঁকে আমারই সীমিত জীবনে রূপায়িত করা। এইটুকুই সার। জীবনকে করব তাই ঈশ্বরের সারানুবাদ।

মানুষকে আবার দু ভাগে ফেললেন রামকৃষ্ণ। মাটির দেয়াল আর পাথরের দেয়াল। বললেন :

'মাটির দেয়ালে পেরেক পুঁততে কোনো কষ্ট হয় না। পাথরের দেয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে তবু দেয়ালের কিছু হবে না।'

আমাকে মাটির দেয়াল করো। নরম ও সহনশীল। চাই না আমি অহঙ্কারে নিরেট হতে, দৃঢ় হতে মূঢ়তায়। আমাকে কোমল করে বিদ্ধ করো, দীর্ণ করো আমাকে। তা হলেই তো তুমি সেই দুঃখের রন্ধ্রটিতে লগ্ন হবে আমাতে, মগ্ন হবে সেই রসক্ষরণে। নইলে দুর্ভেদ্য পাথর হয়ে তোমাকে যদি ফিরিয়ে দি তা হলে সেই নীরন্ধ্র শুষ্কতায় বাঁচব কি করে? সে উদ্ধত স্পর্ধা দাঁড়িয়ে থাকবে তখন একটা অতন্দ্র হাহাকারের মত।

তুমি আঘাত করো আমাকে। আমার মর্মমূলে তোমার অনাবৃত

হাতের যে নিবিড়-নির্মল স্পর্শ তাই তো দুঃখ। দুঃখ থেকে কান্নার ভাষাটি না পেলে প্রকাশের মন্ত্র কি করে রচনা করব? দাহই যদি না পাই তবে একটি অক্ষুণ্ণ দীপ্তি বহন করব কি করে? যদি আঘাতই না আসে তবে মঙ্গলসুধার উৎসমুখটি খুলবে কিসে?

এই ভাবেই আবার বলেছেন রামকৃষ্ণ, অন্য প্রতীকের সাহায্যে :

'তরোয়ালের চোটে কুমিরের কিছুই হয় না। তরোয়াল ঠিকরে পড়ে যায়, তার গায়েও লাগে না। তেমনি বদ্ধজীবের কাছে যতই ধর্মকথা বলো, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগবে না।'

'এরা যেন সাধুর কমণ্ডলু। সাধুর তুম্বা চারধামে ঘুরে আসে, তবু যেমন তেতো তেমনি তেতোই থাকে।'

তার পর একটি কবিতার মলয় হাওয়া বইয়ে দিলেন।

'মলয় পর্বতের হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। সে-হাওয়া যে গাছে লাগে তাই চন্দন হয়ে যায়। কিন্তু যে গাছে সার নেই যেমন কলা আর বাঁশ, তা আর চন্দন হয় না।'

হে দক্ষিণ, তোমার স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্য প্রসারিত করো। আমাকে একবার স্পর্শ করতে দাও। আমার মধ্যে সারবস্তু কিছু আছে কিনা জানি না, তবু সর্বাঙ্গ ভরে তোমার নিশ্বাস নিই একবার। হে আকাশ, নিরন্তর তোমার যে সুধাবর্ষণ হচ্ছে তার নিচে আমার শূন্য হৃদয়কুম্ভটি এনে রাখি। হয়তো কোথাও একটা ছিদ্র আছে, পরিপূর্ণ হবে না সে কুম্ভ। তবু তোমার সুধা-স্পর্শের তো একটু সিঞ্চন পাই।

আবার কত রকম আছে। সাধুর কাছে এসে যখন বসে তখন যেন কতই বৈরাগ্যের ভাব। বিষয়কথা বিষয়চিন্তা সব রেখে দেয় লুকিয়ে। পরে যখন উঠে যায় সেখান থেকে, আবার সেই কথা সেই চিন্তা নিয়ে খতাতে বসে।

একটি অদ্ভুত উপমার মধ্য দিয়ে বলেছেন তা রামকৃষ্ণ :

'পায়রা মটর খেল, মনে হল সব বুঝি হজম হয়ে গেল। কিন্তু সব লুকিয়ে রেখে দেয় গলার মধ্যে। যদি গলায় হাত দিয়ে দেখ তো দেখবে মটর গজগজ করছে।'

আরেক ধরনের লোক আছে, ভিতরে কামকাঞ্চনভোগ, বাইরে নাম-গুণকীর্তন, ধ্যান-জপ, কত কি অনুষ্ঠান। এ যেন সেই দাঁতওয়ালা হাতি! বুঝিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ :

'হাতির বাইরের দাঁত আছে আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাইরের দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়।'

আবার আরেক রকম আছে, ঈশ্বরচিন্তা করে অথচ বিশ্বাস নেই ঈশ্বরে, সংসারে আসক্ত হয়ে আবার ভুলে যায়।

আবার সেই হাতির উপমা :

'মনমত্ত করী। হাতির স্বভাব বটে, নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধুলো-কাদা মাখে। কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি তাকে আস্তাবলে সাঁদ করিয়ে দিতে পারে তা হলে আর ধুলো-কাদা মাখতে হয় না।'

মাহুত হয়ে একমাত্র গুরুই রক্ষা করতে পারে। একবার ঈশ্বরসত্তায় স্নান করিয়ে যদি রাখতে পারে তার রক্ষণাবেক্ষণে, তবে আর ভয় নেই। গুরুই আত্মদর্শন ঘটিয়ে নিয়ে যেতে পারে স্বধামে।

এবার একটি অপূর্ব গল্প বললেন রামকৃষ্ণ। তাৎপর্যে তীক্ষ্ম একটি গল্প :

'একটা ছাগলের পালে বাঘিনী পড়েছিল। দূর থেকে একটা শিকারী তাকে মেরে ফেললে। অমনি তার প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। ছানাটি ছাগলের পালের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। ছাগলেরাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও ভ্যা-ভ্যা করে, সেও ভ্যা-ভ্যা করে। ক্রমে-ক্রমে ছানাটা বড় হল। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে উপস্থিত। বাঘ দেখে ছাগলের পালের সঙ্গে বাঘের বাচ্চাটাও ছুট দিল পালাবার জন্যে। বাঘ তখন সে ঘাসখেকো বাঘের বাচ্চাটাকে ধরলে। সে ভ্যা-ভ্যা করতে লাগল প্রাণপণে। বাঘ তখন তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে এল। বললে, এই জলের ভিতরে তোর মুখ দ্যাখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি। আর এই নে খানিকটা মাংস—খা। বলে জোর করে খানিকটে মাংস তার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলে। সে কিছুতেই খাবে না প্রথমটা, শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। বাঃ, বেশ তো খেতে—একেবারে স্বভাবের খাদ্য। তখন আততায়ী বাঘটা বললে, এখন বুঝেছিস, আমিও যা তুইও তা। এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।'

ছাগলের পালে বাঘের ছানা মানে আত্মবিস্মৃত অমৃত-পুত্র। ঘাস খাওয়া মানে অসার কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত ডাকা আর পালানো মানে সামান্য বদ্ধ জীবের মত ব্যবহার করা। আততায়ী বাঘের আগমন মানে আকস্মিক গুরু লাভ। জলে প্রতিবিম্ব দর্শন মানে স্বরূপ-

দর্শন। রক্তের স্বাদ মানে হরিনাম স্বাদ। বনে চলে যাওয়া মানে চৈতন্যদাতা গুরুর শরণাগত হওয়া।

সহজের মধ্য দিয়ে এমন গভীর বিশ্লেষণ আর কোথায়!

গুরুকৃপায় যদি জ্ঞান লাভ হয় তবে সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়। সংসার তো ছাড়তে বলেননি রামকৃষ্ণ, সংসারে থাকতেই বলেছেন, সঙ ছেড়ে সারটুকু নিয়ে থাকতে। সংসারের ঘর ছাড়লেও দেহ-ঘর তো ছাড়তে পারবে না, তবে আর এই বিড়ম্বনা কেন? ঘর ছেড়েও তো আবার কুটির বাঁধে সন্ন্যাসী, কুটির না বাঁধলেও মঠ। নিজের বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে আসে, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। পুত্র ছেড়ে দিয়ে আসে, কিন্তু চেলা জোটায়। এও একরকম মায়া। একরকম অহঙ্কার।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'গেরুয়ার অহমিকা।'

তাই, সংসারে এসেছ সংসারেই থাকো। থাকো গুরুজ্ঞানাশ্রয়ে ঈশ্বর-যুক্ত হয়ে। এই ভাবটিই বোঝালেন একটি ঘরোয়া উদাহরণ দিয়ে :

'যদি কেরানিকে জেলে দেয় সে জেল খাটে। কিন্তু যখন তাকে ছেড়ে দেয় জেল থেকে তখন সে কী করে? সে কি তখন রাস্তায় এসে ধেই-ধেই করে নেচে-নেচে বেড়ায়? মোটেও নয়। সে আবার একটি কেরানিগিরি জুটিয়ে নেয়, সেই আগেকার কাজই করে।'

হৃদয়ে শুধু জেবলে রাখে একটি অনির্বাণ জ্ঞানবর্তি।

জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিই ঐ জ্ঞানচক্ষু।

কিন্তু সদগুরু ধরা চাই। সচ্চিদানন্দ গুরু। যে ঈশ্বরলাভ করেনি, পায়নি তাঁর প্রত্যক্ষ আদেশ, যে ঈশ্বরশক্তিতে শক্তিমান নয় তার কী সাধ্য শিষ্যের ভববন্ধন মোচন করে! যদি সদগুরু হয় জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা।

এখানে আরেকটি রসাশ্রিত চিত্র আঁকলেন রামকৃষ্ণ :

'শুনতে পেলুম একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হল সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পর যখন ফিরে আসছি তখনও দেখি, ব্যাঙটা ডাকছে খুব। কি হয়েছে—একবার উঁকি মেরে দেখলুম। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধরেছে—ছাড়াতেও পাচ্ছে না, গিলতেও পাচ্ছে না—ব্যাঙটারও যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলুম, ওকে যদি জাত-সাপে ধরত তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত। এ একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই সাপটারও যন্ত্রণা ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।'

॥ ২৮ ॥

তাই, যে-ঘরে আমাকে রেখেছ আমি সেই ঘরেই থাকব। যে ঘরেই থাকি সেই ঘরেই তোমার ঘট, সে ঘরের বাইরেই তোমার আকাশ। আমার দৃষ্টি আর ঘরের দিকে নয়, ঘেরের দিকে। তার মানে, কতটা নিজেকে আড়াল করলাম সেদিকে নয়, কতটা তোমাকে ঘিরতে পেলাম সেই দিকে। যে ঘর তোমার খুশি, সেই ঘর দাও, কিন্তু বেড়া দিও না। যে ঘরেই থাকি, ঘরকে যেন বাহির করতে পারি। ঘরকে যেন বন বলে মনে হয়।

সেই ঘরই দাও যেখানে মন উন্মনা হয়ে থাকে। যেখানে বনবাসীর মত বাস করতে পারি। নয়নে যদি কটাক্ষ না থাকে, তবে কাজল দিয়ে কী হবে? তেমনি অন্তরের স্থিরধামে যদি তুমি না থাকো, তবে কী হবে আমার ঘর-দ্বারে?

চুপ করে বসে থাকতে তো পারি না। জীবন চলেছে, জগৎ চলেছে, চোখের উপরে কাজ করছে অনল-অনিল। তেমনি আমাকেও কাজ করতে হবে। কাজ করে ক্লান্ত না হলে তুমি তো টেনে নেবে না তোমার বাহুর মধ্যে, অঞ্চলে মুছে দেবে না স্বেদধারা। কিন্তু কাজ যে করবো, কী ভাবে করবো? যেমন গান কাজ করে। গান তার কথার মাঝে-মাঝে সুরের জন্যে ফাঁক রাখে। তেমনি আমার কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তোমার সুর ভরে-ভরে উঠবে। আমার কথা তোমার সুর দুয়ে মিলে সংগীত। তেমনি আমার কাজ তোমার দৃষ্টি দুয়ে মিলে আনন্দ।

আমার ব্যথার বাঁশিতে তুমি আনন্দের সুর বাজাও।

'আমি দেখছি, যেখানে থাকি,' বললেন রামকৃষ্ণ : 'রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎসংসারই রামের অযোধ্যা।'

যেখানেই থাকি তোমার প্রেমপ্রসন্ন মুখের বিভাটি দেখতে পাই—তাই সর্বত্রই আমার রামের অযোধ্যা। তুমি সমস্ত অনুভব করছ, তেমনি তোমার মধ্যে সমস্তকে অনুভব করি। কিন্তু পারি কই সব সময়? যখন তুমি রিক্ত করে দাও তখন দুয়ারে বসে কাঁদি, ভাবি না এই রিক্ততা তুমি আবার রসে ভরে দেবে। যখন আহত হই, ভাবি না এই আঘাতের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তোমার আরামরমণীয় আলিঙ্গন।

'যুদ্ধ যখন করতেই হবে তখন কেল্লার মধ্যে থেকেই করা সহজ। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে অনেক অসুবিধে, অনেক বিপদ! গায়ের উপর গোলা-গুলি এসে পড়ে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, বাসনার সঙ্গে, খিদে তৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ গৃহে থেকেই ভালো। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর-টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।'

ঘরই হচ্ছে কেল্লা। ঘরই হচ্ছে তীর্থ। ঘরই হচ্ছে তপোবন।

আর যুদ্ধ হচ্ছে কর্ম। আর সংসারী হচ্ছে বীর।

'সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই, তাতে আর বাহাদুরি কি! সংসারে থেকে যে ডাকে—সে যেন বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখে। তাই সেই ধন্য, সেই বাহাদুর, সেই বীরপুরুষ।'

সংসারীর কত দৈন্য, কত দায়। কত ক্লেশ কত নৈরাশ্য। কত লজ্জা, কত লাঞ্ছনা। তবু তারি মধ্যে সে ঈশ্বরের দিকে মুখ রাখে। পুঞ্জিত হয়ে ওঠে অবিশ্বাসের অন্ধকার। তা অতিক্রম করে অন্তরে একটি নিভৃতি খুঁজে পায়। তারপর সঙ্গহীন নগ্নতায় বসে এসে ঈশ্বরের মুখোমুখি। আনন্দময়ের কাছে বেদনা জানায়। অবশেষে অশ্রুজলে স্নান করে বেদনাটি আনন্দে বেশবদল করে। যা মনে হয় দুঃসহ তাই শেষে আস্বাদময়।

আবার ঘানি টানে।

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে দু হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।'

কিন্তু কর্ম শেষ হবে কখন?

যতই ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে আসবে। বলেই একটি উপমা দিলেন :

'যেমন দেখনি ব্রাহ্মণ-ভোজনে প্রথমে খুব হৈ-চৈ। যত পেট ভরে আসে ততই হৈ-চৈ কমে যায়। শেষে নিদ্রা-সমাধি।'

আরো একটি উপমা দিলেন কাব্যমণ্ডিত করে :

'অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাওনি। এখনও একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। কেবলই অন্তর খুঁড়বে।'

তারপর একটি সুন্দর সাংসারিক উপমা :

'গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি কর্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাসে কর্ম প্রায় করতে হয় না। ছেলে হলে একেবারে কর্মত্যাগ। মা তখন

ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ করে শাশুড়ি ননদ বা জায়েরা।'

আসল হচ্ছে ভালোবাসা। ভালোবাসা হলেই কর্ম চলে যায়। যেমন ফল হলেই ঝরে যায় ফুল।

এইটিই একটি কাব্যে প্রকাশ করলেন রামকৃষ্ণ :

'যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায় ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি আপনি হাওয়া আসে তা হলে আর পাখা দিয়ে কী হবে?'

তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যেমন করাও তেমনি করি।

কাজ করা ছাড়া আমার আর কী করবার আছে? কাজই আমার উপাসনা, তোমার কাছে এসে বসা। কেননা কাজটি কেমন ভাবে করছি তুমি নিরন্তর লক্ষ্য করছ পিছে দাঁড়িয়ে। আফিসের মনিবকে ফাঁকি দিতে পারি কিন্তু ত্রিভুবনের যিনি প্রভু তাঁকে ফাঁকি দিতে পারব না। তুমি অনিদ্র চক্ষু মেলে দেখছ আমার কাজ এতেই তো আমি তোমার সামীপ্য অনুভব করছি দিবানিশি। জনে-জনে ইচ্ছে মত তুমি কাজ বেঁটে দিয়েছ, কেউ মেথর কেউ মজুর কেউ কেরানি কেউ আড়তদার। সব তোমার কাজ। তোমার যন্ত্র। তোমার যন্ত্রের ছোট-বড় অংশ একেকজন। তোমার দেওয়া কাজ যখন, তখন কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। হেয় নয়, সামান্য নয়। বিভিন্ন কুশীলবে বিচিত্র নাটক। সে নাটকের লেখক তুমি, দর্শক-শ্রোতাও তুমি। আর-যারা সব দেখছে উঁকি-ঝুঁকি মেরে তারা 'লোক না পোক'! তাদের মুখ চেয়ে কাজ করব না, তোমার মুখ চেয়ে কাজ করব। তাদের নিন্দা-প্রশংসায় দাম নেব না, দাম নেব তোমার রস-গ্রহণে। বহু লোকের জনপ্রিয়তার জন্যে লুব্ধ হব না, মুগ্ধ হব তোমার একলার ভালোবাসায়।

চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে তুমি দেখছ এই বোধেই আমার কাজের আনন্দ। হার বা জিত যা তুমি দাও দেবে, শুধু ঠিকঠাক খেলাটি খেলে যাই। তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'বুড়ির ইচ্ছে যে খেলাটা চলে। বুড়ির ইচ্ছে নয় যে সকলে ছোঁয়। সবাই যদি বুড়িকে ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা আর চলে না।'

সবাই যদি মুক্ত হয়ে যায় তা হলে আর খেলায় মজা কি। তাঁর ইচ্ছায়ই কেউ বন্ধ কেউ মুক্ত। তার মানে তিনিই তরী হয়ে ডুবছেন-উঠছেন। প্রত্যেকের মাঝে সেই একের রকমফের।

তাই কাজ করে-করে বন্ধন কাটো। তারপর যখন নির্বন্ধন প্রেম আসবে তখনই নৈষ্কর্ম্য।

নৈষ্কর্ম্যের একটি ঘরোয়া ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ :

'গৃহিণী বাড়ির কাজকর্ম ও রান্নাবান্না সেরে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুরঘাটে গা ধুতে যায় তখন আর হেঁসেল-ঘরে ফেরে না—ডাকাডাকি করলেও না।'

একবার যদি তোমার প্রেমের নাগাল পাই ফিরব না আর হেঁসেলে, সেই কালি-ঝুলির অন্ধকূপে।

॥ ২৯ ॥

'আত্মীয় কালসাপ, ঘর পাতকুয়ো।' বললেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'ঈশ্বর ছাড়া সব ফক্কাবাজি।'

সব আমার-আমার করছি। কিন্তু সব ধোঁকা, ভানুমতীর ভেল। কিছুই আমার নয়, সব তাঁর।

মায়া ছেড়ে দয়ার দিকে যাও। কিন্তু মায়া-দয়া কাকে বলে?

কী সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'নিজেকে ভালোবাসার নাম মায়া, পরকে ভালোবাসার নাম দয়া। শুধু নিজের পরিবারের লোকদের ভালোবাসি এর নাম মায়া। শুধু নিজের দেশের লোকগুলিকে ভালোবাসি এর নামও তাই। কিন্তু সব দেশের লোককে সব ধর্মের লোককে ভালোবাসি এর নাম দয়া। মায়াতে মানুষ বদ্ধ, ভগবানের থেকে বিমুখ। দয়াতে মানুষ মুক্ত, ভগবানের প্রতি অভিমুখী।'

আসল উৎসটি হচ্ছে ভগবানকে ভালোবাসা। ভগবানকে ভালোবাসলেই সকলকে ভালোবাসব। কিন্তু ভগবানকে না ভালোবেসে যদি নিজেকে ও নিজের জনকে ভালোবাসি, সেটা হবে আত্মরতি। তার নামই মায়া।

আমার-আমার যে করছ তার দৌড় কতদূর?

সুন্দর একটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ :

'বড়মানুষের বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, বাগানের সরকার বলে এ বাগান আমাদের। কিন্তু মনিব যদি কোনো দোষ দেখে ছাড়িয়ে দেয় তাহলে আমকাঠের সিন্দুকটি লয়ে যাবার পর্যন্ত মুরোদ থাকে না।'

তার পরেই একটি মজার গল্প বললেন :

'গুরু শিষ্যকে বললে, সংসার মিথ্যে, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। ঈশ্বরই তোর আপনার, আর কেউই তোর আপনার নয়। শিষ্য বললে, সে কি কথা, আমার মা, আমার বাপ, আমার স্ত্রী—এদের ছেড়ে কেমন করে যাব! ও সব তোর মনের ভুল। কেউ তোর আপনার নয়। এক কাজ কর। তোকে একটা ওষুধের বড়ি দিচ্ছি, তুই তা খেয়ে শুয়ে থাকগে বাড়িতে। লোকে মনে করবে তুই মরে গেছিস। আসলে সব দেখতে-শুনতে পাবি তুই, তোর টনটনে জ্ঞান থাকবে। আমি সেই সময়ে গিয়ে পড়ব। যেমন বলা তেমনি—বড়ি খেয়ে শিষ্য মড়ার মতন হয়ে গেল। কান্নাকাটি পড়ে গেল বাড়িতে। এমন সময় কবরেজের বেশে গুরু এসে উপস্থিত। সব শুনে বললে, এর ওষুধ আছে, বেঁচে উঠবে রুগী। বাড়ির সবাই হাতে স্বর্গ পেল। তখন ফের কবরেজ বললে, কিন্তু একটা কথা আছে। ওষুধটা আগে একজনকে খেতে হবে। তারপর রুগীকে দেব। আগে যিনি খাবেন তিনি কিন্তু অক্কা পাবেন। তা, এখানে ওর মা কি পরিবার এরা তো সব আছেন, একজন-না-একজন কেউ খাবেন তাতে সন্দেহ নেই। তা হলেই ছেলেটি বেঁচে ওঠে। তখন সবাই কান্না থামিয়ে চুপ করে রইল। শিষ্য সমস্ত শুনছে। কবরেজ আগে মাকে ডাকলো। মা বললে, তাই তো এ বৃহৎ সংসার, আমি গেলে কে এসব দেখবে শুনবে, তাই ভাবছি। স্ত্রী এতক্ষণ—দিদি গো, আমার কী হল গো—বলে কাঁদছিল। এখন, কবরেজের ডাকে বললে, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আমার অপোগণ্ডগুলোর এখন কী হবে! আমি যদি যাই, কে দেখবে এদের? শিষ্যের তখন বড়ির নেশা ছুটে গিয়েছে। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, গুরুদেব, চলুন।'

এই তো সংসার।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'রোগটি হচ্ছে বিকার। আর যে ঘরে বিকারের রুগী সেই ঘরেই কিনা তেঁতুলের আচার আর জলের জালা। আচার-তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে। বিকারের রুগী বলে, এক জালা জল খাব। তাতে কি আর বিকার সারে? যদি বিকারের রুগী আরাম করতে চাও ঘর থেকে ঠাঁই-নাড়া করতে হবে। যেখানে আচার-তেঁতুল নেই, নেই বা জলের জালা। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এসে থাকলে আর ভয় নেই।'

আচার-তেঁতুল হচ্ছে যোষিৎসঙ্গ, আর জলের জালা হচ্ছে বিষয়-ভোগ। তাই নির্জনে না হলে চিকিৎসা হবে না।

আমাকে নির্জন করো। চারদিকে জনতার জলকল্লোল, মধ্যস্থলে আমার নির্জন হৃদয়দ্বীপ। আসঙ্গ-সঙ্গ থেকে চলে আসব এবার অসঙ্গ-সঙ্গে। তাই দাও এবার নিরাশা-নিবিড় নিঃসঙ্গতা। আমাকে রিক্ত করো যাতে পূর্ণ হতে পারি। আমাকে চূর্ণ করো যাতে নির্মিত হতে পারি নতুন করে। যাতে নতুন করে সাজাতে পারি সৌন্দর্যের অর্ঘ্যমাল্য। তোমার প্রসাদ বহন করবার পবিত্র পাত্র করতে পারি এ জীবনকে।

যেখানে অনুরাগ সেখানেই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য হচ্ছে অনুরাগের প্রগাঢ় রঙ, তাই রক্তিম না হয়ে গৈরিক। প্রেমের সঙ্গে ত্যাগ মেশালেই রঙ ধরবে গেরুমাটির। আকাঙ্ক্ষার কোমলতার সঙ্গে ত্যাগের কাঠিন্য। অনুরক্তির সঙ্গে অনাসক্তি।

'কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা চলে না।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'তেমনি জীবে কামকাঞ্চনরূপ তেল লাগলে তাতে আর সাধন চলে না। কিন্তু তেলমাখা কাগজে খড়ি দিয়ে ঘষে নিলে লেখা যায়। তেমনি জীবে কামকাঞ্চনরূপ তেল লাগলে ত্যাগরূপ খড়ি দিয়ে ঘষে দিলে তবে সাধন হয়।'

যা আমাদের বাঁধছে প্রতিনিয়ত তার গ্রন্থি শিথিল করে দেয়ার নামই ত্যাগ। ভোগে দাসত্ব, ত্যাগেই স্বাধীনতা। যেটুকু ধরে রাখব সেটুকুই বাঁধবে প্রাণপণে। যদি কিছুই না ছাড়ি, সঞ্চয়ের পাষাণ স্তূপে ধরিত্রীর শ্বাসরোধ হবে। ছাড়তে পারি বলেই আমরা বাঁচি, বড় হই, যাত্রা করি পরিপূর্ণতার দিকে। ত্যাগ তো শূন্যতার শুষ্কতা নয়, পূর্ণতার অভিষেক।

আমাকে ত্যাগের মধ্য দিয়ে নতুন করে ভোগ করতে দাও তোমাকে। আমি কিছুই চাই না এইটিই একটি বৃহৎ চাওয়া হয়ে তোমাকে আবৃত করুক। শূন্য আর পূর্ণের এক আকার, তুমি আমার শূন্যের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে ওঠো। তোমার জন্য যত ছাড়ব ততই তুমি ভরে-ভরে উঠবে। মানুষকে যা আমরা দিই তার মধ্যে একটা অহঙ্কার থাকে, লোকে তা দেখুক, গুণগান করুক, থাকে এমনি একটা প্রচ্ছন্ন কামনা। সে দান বহন করে কিছু ফিরে-পাবার প্রত্যাশা। কিন্তু তোমাকে যে দান সে দান প্রেমে, অগোচরে, সে দান বিনিঃশেষে। সে দানের নামই ত্যাগ।

তিনিই বা কি আমাদের জন্য কম ত্যাগ করছেন? কী প্রয়োজন ছিল তাঁর এত আলো-হাসার এত ভালোবাসার, এমন করে অসীম শক্তিকে অসীম মাধুর্যে রূপান্তরিত করার? তিনি যে এত ত্যাগ করছেন আমাদের জন্যে আমরা শুধু তা সংগ্রহই করব দু হাতে, কিছুই তাঁকে ফিরিয়ে দেব না? তিনিও তো কাঙালের মত ফিরছেন আমাদের দ্বারে-দ্বারে, রিক্ত ভিক্ষাপাত্র হাতে, তাঁকে আমরা কী দেব? তাঁর জন্যে যদি কিছু ত্যাগ না করতে পারি, তবে আমাদের কিসের তাঁকে ভালোবাসা?

'গীতা পড়লে যা হয় আর দশবার গীতা-গীতা বললে তাই হয়। গীতা-গীতা বলতে-বলতে ত্যাগী-ত্যাগী হয়ে যায়। গীতার সব বইটা পড়বার দরকার নেই—ত্যাগী-ত্যাগী বলতে পারলেই হল। তাই গীতার সার। অর্থাৎ, হে জীব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা করো। এই গীতার সার কথা। গীতা সব শাস্ত্রের সার।'

তাগী আর ত্যাগী দুই-ই প্রত্যয়গত রূপে ও অর্থে সমতুল।

আমার মাথায় কত বোঝা-ই যে চাপিয়েছি দিনে-দিনে। তোমাকে প্রণাম করে-করে সে বোঝা একেক করে নামিয়ে দেব তোমার পায়ে। এমনি করেই ভারমুক্ত হব। নির্ভার হতে পারলেই চরম নির্ভর আসবে তোমাতে।

॥ ৩০ ॥

তীব্র বৈরাগ্যের গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'একবার ঘোর অনাবৃষ্টি হয়েছে দেশে। কিন্তু চাষারা চাষ দিতে ছাড়েনি। জল হয় না, কি আর করা—সবাই খাল কেটে নদী থেকে জল আনবার চেষ্টা করছে। সবাই রোজ একটু-একটু করে কাটে। তার মধ্যে একজনের মাথায় হঠাৎ ভাবনা ঢুকল, আজই খালে-নদীতে যোগ করে দেব। কে জানে, কাল যদি মরে যাই, ছেলেগুলো সব তো না খেয়ে মরবে। এই ভেবে সে এক নাগাড়ে কেটে চলল। এদিকে বেলা অনেক হল দেখে গিন্নি মেয়েকে দিয়ে মাঠে তেল পাঠিয়ে চাষাকে নেয়ে নিতে বললে। চাষার এক ধমক খেয়ে পালিয়ে গেল মেয়ে। বেলা আরো বেড়ে গেল দেখে গিন্নি মনে করলে, যাই মিনসেকে আমিই একবার বুঝিয়ে বলি।

ভালো জ্বালা, আজ আবার ঘাড়ে কী ভূত চাপল! আমি হাঁড়ি নিয়ে আর কতকাল বসে থাকব? একটা বিবেচনাও কি নেই যে, হ্যাঁ, খেয়ে নিয়ে কাজ করি? কাজের হেপায় নিজের খিদে-তেষ্টা নেই বলে কি সবার তাই? আপনার মনে বকতে-বকতে স্ত্রী এসে বললে চাষাকে, বলি হ্যাঁগো, ভাতগুলো যে কড়কড়িয়ে গেল, নেয়ে-খেয়ে—চাষা কোদাল উঠিয়ে তাড়া করলে স্ত্রীকে। স্ত্রী তো দৌড়। চাষা অমনি আবার মাটি কাটতে লেগে গেল। আর কোনো দিকে তার হুঁস নেই। সমস্ত দিন হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার একটু আগে নদীর সঙ্গে খানার যোগ করল চাষা, আর কুলকুল করে খাল দিয়ে জল আসতে লাগল খেতে। চাষা তখন মহানন্দে জলের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তারপর বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললে, নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ। তারপর তেল মেখে নেয়ে খেয়ে সুখে ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।'

সিদ্ধি জানি না, জানি সাধন। সাফল্য জানি না, জানি সংকল্প। ক্লিষ্টতা মানি না, মানি চেষ্টা। মানি নিষ্ঠা নিঃসংশয়।

শুষ্কতার পথে উড়ুক মরুবালুর ঝড়, না মিলুক আমার খর্জুর-কুঞ্জের শ্যামচ্ছায়া, তবু পথ চলব খররৌদ্রে। বিরুদ্ধ-বিমুখ সমুদ্র যতই প্রখর-নখর তরঙ্গের আঘাত হানুক তবু কিছুতেই হাল ছাড়ব না। আমার পথই প্রাপ্তি। কূল না পেয়ে যদি ডুবেও যাই, তবু জানি আমি তোমাকেই পেলাম।

'আর একজন চাষা, সেও মাঠে জল আনছিল,' রামকৃষ্ণ দিলেন এবার একটি মন্দা বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত : 'তার স্ত্রী যখন গিয়ে বললে, অত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই, এখন এস, অনেক বেলা হয়েছে, তখন সে কোদাল রেখে বেশি উচ্চবাচ্য না করে স্ত্রীকে বললে, তুই যখন বলছিস তবে চল। তার আর মাঠে জল আনা হল না।'

চাই অর্জুনের পুরুষকার। চাই নৈরাশ্যনাশী নিষ্ঠা। চাই আঘাতপ্রসন্ন প্রতিজ্ঞা।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'খুব রোক না হলে চাষার মাঠে যেমন জল আসে না তেমনি মানুষেরও হয় না ঈশ্বরলাভ।'

তোমাকে যদি আমি নিজের মধ্যে ব্যক্ত করতে পারি তবেই তো তোমাকে আমার লাভ করা হল। তুমি যে কল্পনার নও তাই আমি প্রমাণ

করব আমার মধ্যে তোমাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করে। কিন্তু কি করে তোমাকে প্রকাশিত করি? তোমাকে প্রকাশিত করবার আমার একটিমাত্র উপায় আছে। সে হচ্ছে আমার কর্ম। আমার কর্ম কর্মের জন্যে নয়, তোমাকে প্রকাশিত করবার জন্যে। কর্মই কর্মের শেষ নয়, কর্মের শেষ হচ্ছে হওয়া। করতে-করতে একদিন হয়ে উঠব আমি। আলো জ্বালতে-জ্বালতে হয়ে উঠব তোমার দেবমন্দিরের প্রদীপ। প্রত্যেকের মনের বীণায় সুর তুলতে-তুলতে হয়ে উঠব তোমারই মনোবীণা।

কর্মই আমার ধর্ম। কিন্তু ধর্ম আবার কর্মকে অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে। আমার জীবনের আয়-ব্যয়ের হিসেবের উপর চিরকাল একটি উদ্বৃত্ত বেঁচে থাকবে। সেই উদ্বৃত্তেই আমার প্রকাশ, আমার ঐশ্বর্য। ধর্ম বলতে আর কী বুঝি? যেখানে আমার এই আশ্চর্য প্রকাশ, এই ঐশ্বর্যময় প্রকাশ, সেখানেই আমার ধর্ম।

এই কর্ম দিয়ে তোমাকে প্রকাশ করব। তোমার মন্দিরে গিয়ে উঠব এরই জন্যে কর্ম আমার সোপান, ওপারে তোমার কাছটিতে গিয়ে পৌঁছুব এরই জন্যে কর্ম আমার সেতু। সমীর হয়ে সৌরভের আভাস নিয়ে বেড়াবে তাই কর্ম আমার মাধ্যম। তুমিও তো বিশ্বকর্মা। তুমিও তো চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে নেই। তোমারই মত আমার কর্মে আমি প্রকাশমান হব। আমার অপরিমাণ কর্মে প্রকাশ করব আমার অপরিমাণ প্রেম। আর যেখা-নেই প্রেম সেখানেই তো তুমি।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতরে পড়েছে, পিষে যাবে। তবে জাঁত্যর খুঁটির কাছে যে কটি ডাল থাকে তারা যেমন পিষে যায় না তেমনি ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে থাকলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবার ভয় নেই।' আবার বললেন নতুনতরো উপমায় : 'সংসার শেঁকুল কাঁটার মত, এক ছাড়ে তো আরেকটি জড়ায়।'

এর থেকে ছাড়া পাব কি করে?

এর থেকে ছাড়া পাবার উপায়, নির্জনে রাত-দিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসংগ।

চিন্তা করবে, রামকৃষ্ণ বললেন, 'মনে বনে কোণে।'

নির্জনে গৃহকোণটিতে গিয়ে বসো। সংকীর্ণ অন্ধকার সীমা থেকে চলে যাও নীহারিকার মহা-অংগনে, জ্যোতিষ্কলোকের জয়ধ্বনির সংগে তোমার স্তব্ধতার স্তবটি সম্মিলিত করো। তুমি সংসারী লোক, বনে

তুমি যেতে পারবে না, বুঝি। কিন্তু কোণে বসতেও যদি তোমার বিঘ্ন ঘটে, যদি ঘরের লোকের নিন্দা বা বিদ্রুপে নির্বিচল থাকতে না পারো, তবে মনেই যোগাসন পাতো। একটি অনির্বাণ হোমহুতাশন নিরন্তর জ্বালিয়ে রাখো অন্তরের মধ্যে।

তারপর যখনই সুযোগ পাও সাধুসঙ্গ করো।

কী সুন্দর একটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'মন একলা থাকলেই ক্রমশ শুষ্ক হয়ে যায়। এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গাজলের মধ্যে যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখো তা হলে আর শুকুবে না।'

আমার এ হৃদয়ের ঘটটি তোমার আনন্দসমুদ্রে ডুবিয়ে রাখব। কিন্তু তুমি যে শুধুই আনন্দ, এ হিসেব মাঝে-মাঝে ভুল হয়ে যায়। তাই মাঝে-মাঝে একটি কবিবন্ধুর সঙ্গ দরকার। সেই কবি-বন্ধুই, চলতি ভাষায়, সাধু। তোমার যখন খবর দিচ্ছে তখন সে নিশ্চয়ই কবি। কবি ছাড়া কবিকে আর কে বোঝে? আর তোমার খবরটি যখন সে আমাকেই বলছে একান্তে, তখন সে আমার বন্ধু ছাড়া আর কি! তখন আবার শুষ্ক তরুতে বসন্তের শিহরণ লাগবে। আবার আশ্বাসের শাখায় জাগবে বিশ্বাসের রক্তজবা।

'সাধুসঙ্গ কেমন জানো?' বিবিধ-বিচিত্র উপমা গাঁথলেন রামকৃষ্ণ : 'যেন চালধোয়ানি জল। সৎ কথা শুনতে-শুনতে বিষয়বাসনা একটু-একটু করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্যে একটু-একটু চালধোয়ানি জল খাওয়াতে হয়। তাহলেই নেশা ছুটতে থাকে।

ঘটি রোজ মাজতে হয়, তা না হলে কলঙ্ক পড়বে।

মন কেমন জানো? যেন স্প্রিং-এর গদি। যতক্ষণ গদির উপর বসে থাকা যায় ততক্ষণই নিচু হয়ে থাকে, আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে।

কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল। আবার যদি আলাদা করে রাখো, তা হলে যেমন কালো লোহা তেমনি কালো লোহাই হয়ে যাবে। তাই লোহাকে মধ্যে-মধ্যে দাও হাপোরে।'

আমাকে তোমার নামের মধ্যে, তোমার গানের মধ্যে নিমগ্ন করে রাখো। তোমার মার্জনা দিয়ে ক্ষালন করো আমাকে। আমার অশ্রুতে আমি আবার মার্জনা করব। যতই বিপদে পড়ি তোমার শ্রীপদ যেন না

ছাড়ি। তোমার যেমন অভিরুচি, আমাকে আঘাতে চূর্ণ করো যেন তোমার সামান্যতম ধূলিকণাটিকে মনে করতে পারি সগোত্র, আমাকে দুঃখে বিস্তীর্ণ করো যেন দূরতম দুঃখীজনকে স্পর্শ করতে পারি আত্মীয় বলে।

হে অনিমেষ, আমার দিন-রাত্রির প্রতিটি নিমেষ যেন তোমার প্রতি অশেষ হয়ে থাকে।

॥ ৩১ ॥

কিন্তু যাই বলো, ভোগান্ত না হলে মন যায় না ঈশ্বরের দিকে। হতে হয় পর্যাপ্তকাম। তার পরেই ত্যক্তকর্মা।

'সব ঘর না ঘুরলে ঘুঁটি চিকে ওঠে না।' একটি চমৎকার উপমায় ব্যক্ত করলেন রামকৃষ্ণ।

সুখে-দুঃখে পাপে-পুণ্যে, উত্থানে-পতনে মানে-অপমানে চলেছি এক পৃষ্ঠা থেকে আরেক পৃষ্ঠায়, এক খণ্ড থেকে আরেক খণ্ডে। একটি সমাপ্তি বা পরম পর্যাপ্তির দিকে। চলেছি তোমারই অভিমুখে। নানা ঘাটেই নৌকো ভিড়ছে, কিন্তু বন্দরের দেখা নেই, কে জানে হয়তো বা পথই ভুল করেছি। তবু, জানি, যখন তোমার জন্য যাত্রা তখন সব ঘাটই আমার তীর্থ। ঠিকানা না জানি, আমার জিজ্ঞাসাটি যেন ঠিক থাকে।

'বৈদ্য বলে দিন কাটুক, তার পর সামান্য ওষুধে উপকার হবে।'

দিনই বুঝি আর কাটে না। তোমার জন্যে ব্যাকুলতার ঝড়টি যদি আসে তবে কি মিলবে না তোমার কৃপার বারিবিন্দু? দাবদাহের দীর্ঘ দিন আর সহ্য হয় না, আনো এবার একটি পুঞ্জিত-অঞ্জন মেঘের ব্যাকুলতা। একটি ঝড় তোলো জীবনে। স্তম্ভিতকে ধাবিত করো। প্রগাঢ়কে করো বিগলিত। মূককে উন্মুখর। শুকনো মরুহাওয়ার ঝড় নয়। করুণাকণা-বাহিনী সুধাস্যন্দিনী বৃষ্টিধারা।

'ফোড়ার কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে।'

যতক্ষণ ভোগ ততক্ষণ জ্বালা। ততক্ষণই ভাবনা। ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি।

এবার একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'একটা চিল একটা মাছ মুখে করে আসছে, তাই দেখে হাজার কাক তাকে ধরে ফেললে। যে দিকে চিল মাছ মুখে করে যায়, কাকগুলো কা-কা করতে-করতে তার পিছনে-পিছনে সেই দিকে যায়। মাছটা যখন চিলের মুখ থেকে আপনি হঠাৎ পড়ে গেল তখন যত কাক সেই চিলটাকে ছেড়ে ছুটল মাছের দিকে। চিল তখন একটা গাছের ডালে বসে ভাবতে লাগল—ঐ মাছটাই যত গোল করেছিল। এখন মাছটা কাছে না থাকাতে নিশ্চিন্ত হলুম।'

ঐ মাছ হচ্ছে উপাধি। নামৈশ্বর্য। কৌলীন্যের অভিমান। চিলের মুখ থেকে পড়ে গিয়েছিল আকস্মিক ভাবে। কিন্তু আমাদের এ ভার পরিত্যাগ করতে হবে সরল হবার নির্মল হবার নির্মুক্ত হবার সাধনায়। যখন বুঝব এ বস্ত্রভার উন্মোচন না করলে তোমার পরশসরস বাতাস আর লাগছে না গায়ে তখনই ভারমুক্ত হব। যতক্ষণ আবরণ উন্মোচন না হচ্ছে ততক্ষণই তো প্রকাশে বাধা। আর প্রকাশে যখন বাধা তখন সে ব্যথার আর পার নেই।

কিন্তু যে যাই বলো, মন নিয়েই কথা। ধ্বনি নেই কিন্তু বাণীটি তিনি শুনতে পান। আমার ভাষা আড়ষ্ট কিন্তু ভাবটি সরল। তুমি পর্বতের গহন ভেদ করে এস আমার নির্জন নির্ঝর-উৎসে। নাও আমার স্বচ্ছতার শুভ্র স্বাদ। উৎসস্থল পেরিয়ে এসেই আমার ভঙ্গি জটিল, গতি কুটিল, স্রোত ব্যাহত। কিন্তু যেখানে তোমাকে ডাক দিচ্ছি সেখানে আমি অস্পৃষ্ট, নির্মল, তুমি যদি সেইখানে এসে স্পর্শ করো আমাকে, তবে আমারই তৃষ্ণানিবারণ ঘটে। আর যদি মনে করি তুমি আমার জল-রেখাটি অনুসরণ করছ সমস্ত প্রস্তর-অরণ্য অতিক্রম করে-করে, তবে আমার গতি-ভঙ্গি স্ফীতি-স্ফূর্তি সমস্তই সরলতা ও মধুরতার স্রোতস্বিনী হয়ে উঠবে। তোমার মাঝে নিজেকে সমর্পণ করেই আমি সম্পূর্ণ হব।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙই হয়ে যাবে।'

আমি মনকে ফেলে রাখব না মিথ্যেতে। রাখব না তমসায় আবিষ্ট করে। মন আমার মুক্ত খড়্গের মত জ্বলবে। জ্বলবে সত্যের বিভাসনে। যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সে দীপ্তি কিছুতেই বাধিত হবে না,

বাইরে তার আভাস জাগবেই জাগবে। রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঘরে আলো না জ্বলা দরিদ্রতার চিহ্ন।' আমার মনের সমস্ত কুঠুরিতে আলো জ্বলবে, এমনকি ঘরের সিঁড়ি-গলিটিও থাকবে দীপান্বিত। সে আলো প্রেমের আলো, ক্ষমার আলো, শান্তির আলো। সাধ্য কি তুমি আমার মনের ঘরটিতে এসে না বোস। তোমাকে আমি ধন দিয়ে ভোলাব না, মন দিয়ে ভোলাব।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া যায় সেই চাতুরীই চাতুরী।'

সে চাতুর্যটি কী! সেই চাতুর্যটি মাধুর্য। সেই মাধুর্যের উৎসটি কোথায়? সে মাধুর্যের উৎসটি ভালোবাসায়।

আমার নয়নে সেই চাতুরী দাও যাতে সূর্য-চন্দ্রকে তোমার নিয়ত-জাগ্রত কোমল দৃষ্টিপাত বলে দেখতে পারি। অনুভবে এমন চাতুরী দাও যাতে সুখকে মনে করতে পারি তোমার প্রসাদ বলে, দুঃখকে মনে করতে পারি তোমার অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন। এমন চাতুরী দাও যাতে তোমার চাতুরীটি ধরে ফেলতে পারি। প্রাণের মাধুরী দিয়ে তোমার প্রেমের মাধুরীকে।

ঈশ্বর একা, কিন্তু তিনি সকলের। যে কেউই ইচ্ছে করলে যুক্ত হতে পারে তাঁর সঙ্গে। তাঁর ঘরে সকলের সমান হিস্সা।

কী সুন্দর করে উপমার সাহায্যে তা বললেন রামকৃষ্ণ :

'গ্যাসের নল সব বাড়িতেই খাটানো আছে। গ্যাসকোম্পানির কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি করো। করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে—ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে।'

যেখানে আর্জি করলেই গ্যাস পাওয়া যাবে সেখানে কেন ঘরে আলো জ্বালবো না? গ্যাসের আলো পেলে কে আর অন্ধকারে থাকে?

'বড়মানুষের বাড়ির একটি লক্ষণ যে সব ঘরে আলো থাকে।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'গরিবরা তেল খরচ করতে পারে না, তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে না। এই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নেই, জ্ঞানদীপ জেবলে দিতে হয়। জ্ঞানদীপ জেবলে পরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না!'

আবার বললেন, 'অনন্তকে কে বোঝাবে? পাখি যত উপরে ওঠে, তার উপর আরো আছে।'

তবু যতটুকু পারি, তোমাকে দেখি। আর যতটুকু দেখি তাতেই

তোমার অন্ত পাই না। রূপ থেকে কেবল রূপান্তরের শোভাযাত্রা দেখি। সে শুধু তৃপ্তিহীন স্পৃহা থেকে স্পৃহাহীন তৃপ্তির দিকে যাত্রা। আমার স্পৃহাও তুমি তৃপ্তিও তুমি। যা আছে তাও তুমি যা চলছে তাও তুমি। যা পেয়েছি তোমাকেই পেয়েছি, আর যা আমার না-পাওয়া তা তোমাকেই না-পাওয়া।

চারদিকে রূপের তরঙ্গ উঠেছে, কিন্তু হে রঙ্গময়, তুমি কোথায়? রূপ দিয়ে তুমি আমাদের আচ্ছন্ন করেছ, কিন্তু নিজে রয়েছ প্রচ্ছন্ন হয়ে। রূপে-রূপে অপরূপ হয়ে। এই রূপের মধ্য থেকেই আবিষ্কার করব অপরূপকে। শুক্তি বিদীর্ণ করেই আনতে হবে সে মুক্তির মুক্তাফল।

ঈশ্বরের শক্তিতেই সব শক্তিমান। একটি বিস্ময়কর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'একটা হাঁড়িতে আলু-পটল উচ্ছে ভাতে দিয়ে উনুনে চড়িয়েছ। যখন ভাত ফুটছে তখন আলু-পটলগুলো লাফাচ্ছে। ভাবছে, আমরা আপনি লাফাচ্ছি। ছোট ছেলেরাও ভাবছে, তারা বুঝি জীবন্ত। জ্ঞানী লোকেরা বুঝিয়ে দেয়, ওরা নিজে লাফাচ্ছে না, হাঁড়ির নিচে আগুন আছে বলেই লাফাচ্ছে। আগুন টেনে নিলে আর নড়বে না।'

শরীর হচ্ছে হাঁড়ি, মন-বুদ্ধি জল। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হচ্ছে ভাত, আলু, উচ্ছে-পটল। অহং হচ্ছে তাদের অভিমান, ভাবছে নিজেই টগবগ করছে নিজের জোরে। সচ্চিদানন্দ হচ্ছে অগ্নি। অগ্নি সরে গেলেই সব নিশ্চুপ। নিষুপ্ত।

একটু কি শক্তি হল বা ঐশ্বর্য হল, ভাবছি নিজের পৌরুষ, নিজের কৃতিত্ব-কৌশল। কিংবা এমন একটা ভাব করি যে সৃষ্টির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন যে একজন বিচারক আছেন তিনি বুঝেছেন আমার গুণগ্রাম, পাঠিয়েছেন অবধারিত পুরস্কার। এই নিয়ে তেজ কত! অহঙ্কারের কণ্টকে সকলকে ক্ষতবিক্ষত করি। সে কণ্টকিত বৃন্তে গোলাপ ফোটে না, শুধু প্রলাপ ফোটে।

আমার মধ্যে যেটুকু গুণ যেটুকু বৈশিষ্ট্য সেটুকু তোমারই বিকাশ। তোমারই উচ্চারণ। আমি কোথাও নেই, শুধু তুমি। শুধু তোমারই উদ্ভাসন। তোমারই কৃপা, আমি শুধু তোমার কৃপাপাত্র। তোমারই প্রসাদ, আমার শুধু করপত্র।

যা কিছু প্রকাশ করি, তোমাকেই প্রকাশ করি। আমার সংকীর্ণ ঘট

তোমারই আকাশে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার শূন্য ঘর হয়ে ওঠে সসাগরা পৃথিবী। তুমি দাও, আমি নিই। কিন্তু আমি যে নিই তোমাকেই ফিরিয়ে দেবার জন্যে। আমার যা কিছু অর্জন তোমারই উৎসর্জনে। আমি সংগ্রহ করি, সঞ্চয় করি, রাশীকৃত করি; এ দিয়ে অহং তৃপ্ত হয় কিন্তু আত্মা তৃপ্ত হয় না। আত্মার তৃপ্তি না হলে আত্মতৃপ্তি কোথায়?

আমি বর্জন করব না, আমি দান করব। বর্জনে মুক্তি নেই বিস্তারেই মুক্তি। আর, দান সেই বিস্তার। শুধু পরিহার নয়, প্রসারণ। পরিহারে কার্পণ্য, প্রসারণেই ঐশ্বর্য। আমি ছাড়তে-ছাড়তে বাড়ব। এগোব পথের দিকে চেয়ে নয়, তোমার দিকে চেয়ে। চারদিকে আমার উত্তাল ঢেউ, কিন্তু আকাশে আমার স্থিরলক্ষ্য ধ্রুবতারা।

॥ ৩২ ॥

ঈশ্বরই সব করছেন।

গল্প বললেন রামকৃষ্ণ:

'একদিন এক সাধু কোন এক গ্রামে গিয়েছিল ভিক্ষে করতে। দেখলে গাঁয়ের জমিদার একটা লোককে মারছে। কেন মারছ? সাধু জমিদারকে থামাতে গেল। জমিদার উলটে সাধুকেই দু ঘা বসিয়ে দিলে। ফলে সাধু অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তাই দেখে পথ-চলতি এক লোক ছুটে গিয়ে মঠে খবর দিলে। মঠের সাধুরা ধরাধরি করে আহত সাধুকে মঠে নিয়ে এল। একজন বললে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। ভালো কথা, যদি কিছুটা বল পায় শরীরে। মুখে দুধ দিতেই সাধু চোখ চাইল। তখন সেবারত মঠের এক সাধু খুব চেঁচিয়ে জিগগেস করলে, মহারাজ, চেয়ে দেখ তো, এখন তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে? সাধু তখন আস্তে-আস্তে বললে, ভাই যিনি মেরেছিলেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

এক হাতে তোমার প্রহার, আরেক হাতে উপশম—দুটি মিলিত হাতে কল্যাণ। তোমার এক পদে আঘাত, আরেক পদে নৃত্য—দুটি মিলিত পায়ে আশ্রয়। এক চোখে ভ্রুকুটি, আরেক চোখে আশ্বাস—মিলিত দৃষ্টিপাতে প্রসন্নতা।

তুমি যখন আঘাত করো যেন বুঝতে পারি তুমিই আমাকে নিবিড়

করে আলিঙ্গন করেছ। যখন বঞ্চিত করো যেন বুঝতে পারি তুমি দিয়েছ আমাকে তোমার অকৃপণ আশীর্বাদ। যখন অপমানিত করো যেন বুঝতে পারি এ ধূলিশয্যাতে তুমিই আমার পার্শ্ববর্তী।

আমাকে যদি না কাঁদাও, তোমার নিজের কাঁদা যে হয় না। আর, তুমি যদি না কাঁদো তবে এ সৃষ্টি যে শুকিয়ে যাবে। শাশ্বত একটি কান্না অহর্নিশ নিহিত আছে বলেই তোমার এ কবিতাটি নিত্য সজীব। পুরোনো হল না কোনো দিন। প্রতিটি দিন একটি নতুন দেশ হয়ে দেখা দিল।

কিন্তু তুমি কেমন?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যেন অচীনে গাছ। দেখে কেউ চিনতে পারে না।'

এসেছ নরবেশে, কিন্তু চিনি তোমাকে সেই চোখ কোথায়? গাছ দেখি না, কিন্তু ছায়াটি দেখি। শুনি তার পত্রমর্মর। গায়ে তার সুখস্পর্শ হাওয়া লাগে। ঘ্রাণে পাই তার স্নেহসৌরভ। কানে আসে কোকিল-কাকলী।

আভাসে নয়, বিভাসে কবে চিনব তোমাকে? চিনব কবে গোচরীভূত করে? শুধু প্রকারে নয়, আকারে! ইঙ্গিতে নয়, ভঙ্গিতে! চিনব কবে তোমাকে সাক্ষাৎ আমার চক্ষুর সামনে?

তোমাকে দেখব কবে আকাশের নীলিমায়, ধরণীর শ্যামলিমায়। তারকাবিকীর্ণ বিভাবরীতে? প্রতিটি মুহূর্তের প্রজাপতির পাখার আলিম্পনে? তুমি আনন্দময় হয়ে আছ আমার শূন্যতায়, রসময় হয়ে আছ আমার শুষ্কতায়, মধুময় হয়ে আছ আমার কাঠিন্যে, জ্যোতির্ময় হয়ে আছ আমার অন্ধকারে। আমার স্নানে পানে গন্ধে গানে বাক্যে ধ্যানে কর্মে জ্ঞানে, আমার অণুতে-রেণুতে! ভালো-মন্দে, পাপে-পুণ্যে, উত্থানে-পতনে, সুরে-বেসুরে! স্বেদে-ক্লেদে শোণিতে-অশ্রুতে। দেহে-মনে সঙ্গীতে-আর্তনাদে। নির্লক্ষ্য নিশ্বাসবায়ু হয়ে!

'আদ্য-অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই।' যত যত্ন করেই তোমাকে অগম-অগোচরে রাখি না কেন তুমি আমার এই দেহ-ঘটের মধ্যেই দীপ্যমান। তোমাকে কেমন করে প্রচ্ছন্ন করি? এই ভালোবাসা যে বসন-ভূষণ দিয়ে ঢেকে রাখতে পারি না। আমার এই দেহের মধ্যেই চন্দ্র সূর্য, দেহের মধ্যেই সপ্ত সমুদ্রের রঙ্গলীলা। দেহেই আমার দ্বারকা-মথুরা, দেহেই আমার কাশী সর্বপ্রকাশিকা। এই অখণ্ড বসুন্ধরাকে

আমি দেহেই ধরে রেখেছি। আর কোন ঘরে আমি পরবাসী হব? এই দেহই আমার ঘর-দুয়ার। "ঘর হইতে আঙিগনা বিদেশ"।

এই দেহকেই ঘৃতের প্রদীপ করি। তারপর চলি সেই মন্দিরের অন্ধকারে।

হোক প্রস্তর-কঙ্করে কঠিন, তবু অন্তর খুঁড়লেই জল মিলবে। এই অন্তরেই সুচির নীর-নিবাস। মনের মধ্যেই সেই মানসসরোবর।

মনমালাই জপমালা।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। তেমনি ঈশ্বরতত্ত্ব মানুষে।'

তাই তো সর্বজীবে শিব দেখলেন তিনি। 'জীবে দয়া'—কেটে লিখে দিলেন, জীবে সেবা, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম। লিখে দিলেন রক্তের অক্ষরে অশ্রুজলে। বেদনায়, নির্ব্যবধান ভালোবাসায়।

তুই কীটানুকীট, কী তোর স্পর্ধা, তুই মানুষকে দয়া করবি? রামকৃষ্ণ নতুন সাম্যবাদের পত্তন করলেন। ভূমি আর ভূমা এক করে দিলেন। শুধু কাঙালী ভোজনের সমান পঙক্তিতে না বসিয়ে, সমান অধিকার দিলেন ক্ষয়হীন অমৃতের ভোগ-ভাগে। শুধু পঙক্তি সমান নয়, পাত্র সমান। একই ব্রহ্ম, তার বিচিত্র প্রতিবিম্ব।

'কোনো বাঁশের ফুটো বড়, কোনোটা বা ছোট।' উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'ঈশ্বরবস্তুর ধারণা কি সকল আধারে সম্ভব?'

তাই যেটুকু আমি সেটুকুই তুমি। আমার যা কিছু কান্না তোমার জন্যেই কান্না। আমার যা কিছু সন্ধান তোমাকেই সন্ধান। আমার যা কিছু ক্লান্তি তোমার অভাবে, তোমার কালহরণে।

কান্নার মধ্যেই আমার তৃপ্তি, সন্ধানের মধ্যেই প্রাপ্তি, ক্লান্তির মধ্যেই আমার ক্লেশহরণ।

কিন্তু আমিই কি কাঁদছি? না, এ তোমার কান্না? রামকৃষ্ণ বললেন, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' না, তুমিই কাঁদছ। তুমি যে আমাকে পাচ্ছ না এ দুঃখেরও তো সীমা নেই। তুমি আমাকে পাচ্ছ না মানে তুমি আমার মধ্যে তোমাকে প্রকাশিত করতে পারছ না। অবরুদ্ধ গুহায় তোমার সে অসহায় কান্না আমি দিবা-নিশি শুনতে পাচ্ছি। আমার কণ্টকিত বৃন্তে যে তুমি পুষ্পায়িত হতে পাচ্ছ না এ দুঃখের কি শেষ আছে? নিজেকে যে মুক্ত করতে পারছ না উচ্ছ্রিত নির্ঝরস্রোতে সে প্রস্তরপ্রতিহত কান্না বাজছে আমার বক্ষের পঞ্জরে। তোমাকে বন্দী করে

রেখেছি বলেই আমিও বন্দী। আমার যা বন্দনা তা তোমারই ক্রন্দন।

অমল তোমার প্রেমাশ্রু। অমল প্রেমাশ্রু থেকে তোমার জন্ম বলেই তুমি আমলকী। তোমাকে যদি প্রকাশিত করতে পারি তবেই আমি হস্তামলক।

আমার এ দেহ-গেহ তুমিই নির্মাণ করেছ। আবার নিজেই হয়েছ তার অধিবাসী। ভেবেছিলে আমাকে নিয়ে সুখে ঘর করবে এ নির্জন নিকেতনে। কিন্তু অভিমান আর কাপট্যের দেয়াল দিয়ে তোমার জানলা-দুয়ার সব বন্ধ করে দিয়েছি। তোমাকে সেই রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে একা রেখে আমি বাইরে এসেছি বিচরণ করতে। দেবায়তন ছেড়ে ভোগায়তনে। প্রজাপতিকে গুটি কেটে বের হতে দিলাম না। নিজেই প্রজাপতি সাজতে গিয়ে শুঁয়োপোকাই হয়ে রইলাম। তোমাকে যদি বাইরে আনতে পারতাম, তবে আমার সমস্ত জগৎসংসার শাশ্বত আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। নিজের সুখ প্রচারিত করতে গিয়ে তোমার আনন্দটিকে আর প্রকাশ করা হল না! তোমার হাসিটি আমার জীবনে পরিব্যাপ্ত করে দিতে পারছি না বলেই তোমার কান্না। নিজের কান্নাই শুধু উঁচু গলায় জাহির করলাম। সেই আর্তনাদের কোলাহলে তোমার কান্নাটি আর শোনা হল না।

॥ ৩৩ ॥

কৃপা করো।

আমার হাজার বছরের অন্ধকার গুহায় একটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করো। তোমার সেই কৃপার বহ্নিকণায় আলো হয়ে যাবে আমার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘর একটি মাত্র দেশলায়ের কাঠিতে আলো হয়ে ওঠে।'

ঈশ্বরের কৃপা বোঝাবার জন্যে কাব্যান্বিত উপমা। যেমন আমার অহেতুক ভক্তি, তেমনি তোমার অহেতুক কৃপা। কেন যে কৃপা করবে, আর কখন যে কৃপা করবে কিছুই জানি না। শুধু নিজের 'কৃ'-টুকু করে যাচ্ছি যদি 'পা'-টুকু পাই। মাঠ কর্ষণ করে রাখছি যদি তোমার মেঘবারির বর্ষণ হয় সহর্ষে। তোমার কৃপার এক বিন্দুতেই আমার সহস্র সিন্ধু।

সেই বিন্দুটির জন্যেই আমার প্রতীক্ষা। আমার হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো করবার জন্যে হাজারটি দেশলায়ের কাঠি লাগে না, লাগে না হাজার-ঝালর-ওয়ালা হাজার দীপের ঝাড়লণ্ঠন। একটি বহ্নি-কণাতেই হবে বিরাট বিস্ফোরণ।

তোমার করুণায় নিঃস্ব বিশ্বজয়ী হবে। অকৃতী হবে অসাধ্য-সাধক।

মরা নদীতে বান ডাকবে। শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হবে। বোবাকণ্ঠে ফুটবে নামগুণগান।

আরো একটি উপমা দিলেন: 'এক-একটি জোয়ানের দানায় এক-একটি ভাত হজম করিয়ে দেয়। কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয়, একশোটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না।'

তাঁর কৃপার বাতাসটি না বইলে তুমি অমল ধবল পাল তুলবে কি করে? তাঁর কৃপাটি আছে বলেই তো ভাবতে সাহস পাচ্ছ, কূল আছে। নইলে এই অজ্ঞাত সমুদ্রে কোথায় তোমার যাত্রা? কোন বন্দরের অভিমুখে?

কৃপা করেই তো তুমি ছোটটি হয়েছ আমার জন্যে। তুমি এত মহনীয়, কিন্তু আমার জন্যে সহনীয় হয়েছ। এত অপরিমেয় তোমার প্রতাপ কিন্তু আমার কাছে রাজার মুকুট পরে আসোনি—এসেছ নির্ভূষণ কাঙালের বেশে। আমার দরজায় তোমার মুকুট যে ঠেকে যেত! এত অপরিমেয় তোমার ঐশ্বর্য কিন্তু আমার কাছে এসেছ মধুর হয়ে, কোমল হয়ে স্নেহলাবণ্যপুঞ্জিত হয়ে। বালগোপাল হয়ে। ছোট্টটি না হলে তোমাকে বুকের মধ্যে ধরব কি করে?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হয়ে যান। যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। যে সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়, চক্ষু ঝলসে যায় না, বরং চোখের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্যে ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আসেন তিনি ভক্তের কাছে।'

এ কি এক কবির বর্ণনা নয়? মধ্যদিনের খররৌদ্রে তুমি বিকট-প্রকট, সাধ্য নেই তোমাকে দেখি। তোমার শুধু বিদ্যমানতা নয়, তোমার অভ্যুদয়। তোমার শুধু থাকা নয়, তোমার আসা, তোমার দেখা দেওয়া। কিন্তু আমি যেমন করে তোমাকে সইতে পারি তেমন করেই তো তুমি দেখা দেবে। তাই তুমি আমার প্রথম জাগরণের মুক্ত মুহূর্তে ভোর-বেলাকার সূর্যটি হয়েই দেখা দিয়েছ। নম্রতায় রক্তিম হয়ে, অনুরাগে

সুন্দর হয়ে, তমসাস্নানে পবিত্র হয়ে। সোনার থালায় নিয়ে এসেছ সানন্দ-প্রসাদ।

তোমাকে ছোট করি এমন সামর্থ্য নেই। তুমি নিজের ইচ্ছায় ছোট হয়েছ। আমার ঘটটি ছোট বলে তুমি, হে আকাশ, ছোট হয়ে আমার ঘটে ঢুকেছ। আমার কল্পনাটি ছোট বলে, হে সমুদ্র, তুমি ছোট হয়ে ধরা দিয়েছ আমার সীমাবন্ধ কবিতায়। তুমি নিজেই ছোট হও, তোমাকে কেউ ছোট করে না।

'ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান সূর্য।' বললেন রামকৃষ্ণ।

ভক্তি নরম, শীতল, গদ্গদ। সূর্য তীব্র, প্রখর, জ্যোতির্ময়। চন্দ্র ভাব, সূর্য যুক্তি। চন্দ্র কল্পনা, সূর্য বিচার।

তাই সূর্যের চেয়ে চন্দ্রের দৌড় বেশি। রামকৃষ্ণ বললেন, 'জ্ঞান যায় বৈঠকখানা পর্যন্ত, ভক্তি যায় অন্তঃপুর পর্যন্ত।'

বিচারের শেষ আছে, ভাবের শেষ নেই। যুক্তি নিয়ে যাবে তিনধাপ, কল্পনা নিয়ে যাবে গহন গুহার অন্ধকারে। তুষার যেমন স্থিতি পায় বিগলিত নদীস্রোতে, জ্ঞান তেমনি আশ্রয় পায় ভাবের তরলীভবনে। ভক্তি ছাড়া জ্ঞানের দাঁড়াবার ঠাঁই কোথায়? সর্বভূতে ভগবান, এ জেনে আমার কী হবে যদি আমি কাউকে ভালোবেসে না কাঁদতে পারি? জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলেই ভক্তি। দ্রবীভূত হতে পারার নামই সিদ্ধ হওয়া।

তাই বিদ্যাসাগরকে রামকৃষ্ণ যখন বললেন, তুমি সেদ্ধ গো, বিদ্যাসাগর তখন আশ্চর্য হবার ভাব করে বললে, কই, আমি তো ডাকি না ভগবানকে।

তখন 'সিদ্ধ' হবার অপূর্ব একটি সংজ্ঞা দিলেন রামকৃষ্ণ।

বললেন, 'আলু পটল সেদ্ধ হলে কি হয়? নরম হয়। তোমার চিত্তও নরম হয়েছে। দ্রবীভূত হয়েছে। পরের দুঃখে তুমি কাঁদছ। তোমার অত দয়া!'

পরের দুঃখে যদি সত্যি-সত্যি কাঁদি, তবে এই ভেবেই কাঁদি, সে আর আমি এক, তার দুঃখ আমার নিজেরই দুঃখ। আমার নারায়ণ তার নারায়ণকে চিনতে পারে। তাই লোকের দুঃখবারণই ঈশ্বরভজন।

তাই পরোপকার মানে, এমন এক কাজ যা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। 'পর' মানে ঈশ্বর, 'উপ' মানে সমীপস্থ হওয়া, 'কার' মানে কার্য। ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করে এমন যে কাজ তার নামই হচ্ছে পরোপকার।

তাই, শুধু এ প্রার্থনা, আমাকে তুমি ভক্তি দাও। আমাকে তুমি শীতল করো আর্দ্র করো। রসে-রহস্যে ডুবিয়ে রাখো। আমি জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হতে চাই না। আমি চাই না প্রখর-প্রহর মধ্যাহ্নের মরুভূমি। আমাকে দাও তুমি ভক্তির নিশীথ জ্যোৎস্না। জ্ঞানের রৌদ্র সইতে পারব না, দাও ভক্তির হিমকণা। জ্ঞানদাহের বদলে ভক্তির শ্বেতচন্দন।

জেনে আমার তত সুখ নেই যত সুখ কাছে টেনে। তুমি আছ শুধু এ জেনে আমার লাভ কি, যদি তোমাকে কাছে না টানতে পারি? কিন্তু টানি কি দিয়ে? এই টানবার দড়িটি হচ্ছে ভক্তি। জ্ঞান হচ্ছে মস্তিষ্ক, ভক্তি হচ্ছে হৃদয়। কি-কি বিষয় নিয়ে ব্যঞ্জন রান্না হয়েছে এটি হচ্ছে জ্ঞান—জিহবায় এর আস্বাদ নেওয়াটি হচ্ছে ভক্তি।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আধ বোতল মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাই, শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে সে খোঁজে আমার দরকার কি?'

ভগবান আস্বাদ্য এটি হচ্ছে জ্ঞান, ভগবান সুস্বাদু এটি হচ্ছে ভক্তি।

॥ ৩৪ ॥

'এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে এক ছোকরা ছিল।' রামকৃষ্ণ গল্প বললেন, 'লোকে তাকে পোদো বলে ডাকে। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির আছে। ভেতরে ঠাকুরবিগ্রহ কিছু নেই, চামচিকে বাসা করেছে। মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থ গাছ, আগাছার জঞ্জাল। লোকজনের যাতায়াত নেই মন্দিরে।

একদিন সন্ধের পর গাঁয়ের লোকেরা হঠাৎ শঙ্খধ্বনি শুনতে পেল। কি ব্যাপার? মন্দিরের দিক থেকে শাঁখ বাজছে ভোঁ-ভোঁ করে। গাঁয়ের লোকেরা ভাবলে, কেউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছে বোধহয়, সন্ধের পর আরতি হচ্ছে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই দৌড়ে-দৌড়ে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত। সবাইর আশা ঠাকুরদর্শন করবে আর আরতি দেখবে। কাকস্য পরিবেদনা। মন্দিরের দ্বার বন্ধ। একজন সাহস করে আস্তে-আস্তে খুলে দিল দরজা। দেখল পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ-ভোঁ শাঁখ বাজাচ্ছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা দূরস্থান, মন্দির মার্জনাই হয়নি। তখন সে-লোক চেঁচিয়ে বলে উঠল :

মন্দিরে তোর নাহিক মাধব,
পোদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল!'

পরিহাসরসাশ্রিত অনবদ্য গল্প। একটি জীবন্ত বর্ণনা।

আমরাও এমনি ফাঁকা শঙ্খধ্বনি করছি। তাঁকে প্রকাশ করছি না, শুধু আত্মপ্রচার করছি। মন্দিরে মাধব-প্রতিষ্ঠা নেই, শুধু স্তোত্রপাঠের অনুষ্ঠান। সে স্তোত্র আরাধনা নয়, আত্মস্তুতি। তাঁকে জানানো নয়, শুধু নিজের বিজ্ঞাপন।

'তাই সবার আগে চিত্তশুদ্ধি।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'মন শুদ্ধ করলেই ভগবান এসে বসবেন সে পবিত্র আসনে।'

তিনি শঙ্খধ্বনি শুনে আসেন না, তিনি আসেন কান্না শুনে। আর শুষ্ক চোখে যদি একবার কান্না আসে, তবে সে চোখের জলে মনের ময়লা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।

ভক্তের ভগবানকে চাই, আবার ভগবানেরও ভক্তকে চাই। একজনের আর একজন ছাড়া গতি নেই। ভগবান যখন সূর্য, ভক্ত তখন পদ্ম। আবার ভক্ত যখন পদ্ম, ভগবান তখন অলি।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়। কেননা ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়!'

তুমি আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছ কিন্তু আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। তোমার চেয়ে আমার কত বেশি ক্ষমতা। এত তোমার প্রভুত্ব কিন্তু আমার কাছে তুমি দুর্বল, স্নেহল, খর্বকায়। তোমার এত বৃহৎ রাজকার্য, তার মধ্যে তুমি এই নগণ্যতমকে মনে করে রাখতে পারো না। কিন্তু সর্বক্ষণ তোমাকে ভেবেই আমার দিন কাটছে। তোমার স্মৃতিটি বয়ে-বয়েই জীবনের পথ ভাঙছি চিরদিন।

আশ্চর্য, তুমি কে!

আমি যে তোমাকে ভাবি; সেই তো তোমারও আমাকে ভাবা। আমি যে তোমাকে দেখবার জন্যে তাকাই, সেই তো তোমার আমাকে দেখে নেওয়া। আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সেই তো আমাকে তোমার ভালোবাসা। তুমিই যদি না ভালোবাসো তবে আমার ভালোবাসা জাগত কি করে? তুমি গোপন বলেই তো আমার ভালোবাসা এত স্বপ্নময়!

কিন্তু তুমি কোথায়?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছ সেখানে।'

রোক চাই, ব্যাকুলতা চাই, তবেই না মিলবে সেই জলসত্র। হলো হলো, না হলো না হলো—এই ভাবে কিছু হবে না। চাই নিষ্কাশিত তরবারির মত উজ্জ্বলন্ত ব্যাকুলতা। ব্যাখ্যা করলেন রামকৃষ্ণ : 'জলের দরকার হয়েছে, কুয়ো খুঁড়ছে। খুঁড়তে-খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে-খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল কেবল বালিই বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছ সেখানেই খুঁড়বে। ছাড়বে না। তবে তো জল পাবে!'

একটার উপর দৃঢ় হতে হবে। একটাকে ধরতে হবে জোর করে। উপর-উপর না ভেসে ডুব দিতে হবে অতলে। এক ডুবে রত্ন না মিললে অনন্তবার দিতে হবে। তিনি ভাবে অনন্ত আমি ডুবে অনন্ত। তাঁর রূপসাগর, আমার ডুব-সাগর।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তিনি তো ধর্ম-মা নন, আপন মা। ব্যাকুল হয়ে মা'র কাছে আবদার কর। ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।'

কিন্তু কে ব্যাকুল হচ্ছে? সবাই বাবুর বাগান দেখে অবাক, বাবুকে দেখবার কথা কেউ ভাবে না!

এই সৃষ্টি দেখেই সকলে বিভোর—যার এই সৃষ্টি তার কথা নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

কেমন মধুর করে বললেন রামকৃষ্ণ :

'সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক, কেমন গাছ কেমন ফুল, কেমন ঝিল কেমন বৈঠকখানা, কেমন ছবি, এই সব দেখেই খুশি! কিন্তু এই বাগানের মালিক যে বাবু তাকে খোঁজে কজন?'

কত দেশ-দেশান্তরে যাই আমরা। প্রকৃতির কত রূপ দেখতে। কখনো রুদ্র কখনো স্নিগ্ধ! কখনো ভয়াল-উত্তাল, কখনো শ্যামল-শীতল। কত সে বিচিত্র কত সে বহুলবর্ণ। তবু এত সব দেখে-দেখেও একবার কি ভাবি কে এই শিল্পী কে এই লিপিকার? শুধু কবিতাটিই পড়ব, যাব না একবার কবি-দর্শনে?

আমি যাব। পরব উৎসববেশ। নইলে চারদিকের এই রূপসজ্জার মানে কি? জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে কেন এত পীত-গন্ধ, কেন এত লীলা-ছন্দ, কেন এত দীপাবলী? এই রূপবাসর তবে কেন রচিত হল? কেন তবে এত রাগরাগিণী বেজে চলেছে বাতাসে? সর্বশোভার যিনি সভাপতি

হয়ে আছেন যাব সেই কবির অট্টালিকায়। মুখোমুখি বসে আলাপ করে আসব।

'তাই,' রামকৃষ্ণ বললেন, 'পগার ডিঙিয়েই হোক, প্রার্থনা করেই হোক, বা দারোয়ানের ধাক্কা খেয়েই হোক, যদুবাবুর সঙ্গে আলাপের পর কত কি আছে একবার জিগগেস করলেই বলে দেয়। আবার বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আমলারাও মানে।'

তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট! তাঁর যদি কটাক্ষের কণা মেলে তবে মিলবে জগতের দৃষ্টি। কিন্তু জগতের আনন্দের দিকে তোমার দৃষ্টি নয়, তোমার দৃষ্টি জগদানন্দের দিকে।

এই ভাবটিই আবার ব্যক্ত করলেন অন্য উপমায় : 'আলো জ্বাললে বাদুলে পোকার অভাব হয় না।'

তিনি যদি হৃদয়ের মধ্যে আসেন তবে বহু লোক এসে আঙিনায় ভিড় করবে।

তিনি কিন্তু ভিড়ে নন, তিনি নিবিড়ে।

॥ ৩৫ ॥

কিন্তু তুমি কতক্ষণ কাঁদবে তাঁর জন্যে?

ছেলে কতক্ষণ কাঁদে?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পারে। তার পরেই কান্না বন্ধ হয়ে যায়। তখন কেবল আনন্দ। আনন্দে মা'র দুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে-খেতে মাঝে-মাঝে খেলা করে, আবার হাসে।'

যদি একবার মা'র দেখা পাই, যদি পাই তাঁর সঙ্গস্পর্শস্বাদ, তবে আর বিচার কি! তখন আর সন্ধান নেই তখন সন্ধি। শুধু প্রাপ্তি হলেই চলে না, তৃপ্তি চাই। প্রাপ্তির প্রান্তর মরুভূমি হয়ে যায় যদি তৃপ্তির তরুচ্ছায়াটি না থাকে। মা হচ্ছে প্রাপ্তি, তাঁর স্তন্যসুধা হচ্ছে তৃপ্তির গঙ্গাধারা।

'এটা সোনা, এটা পেতল—এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা—এর নাম জ্ঞান।'

অদ্বৈতানন্দের ভাবটি চমৎকার করে বোঝালেন রামকৃষ্ণ। লিখলেন সোনার অক্ষরে।

ঘটি যদি পেতলের হয়, কলঙ্ক পড়ার ভয়ে তাকে মাজতে হয় প্রত্যহ। কিন্তু যদি সোনার হয়ে যায়, আর মাজবার দরকার হয় না।

কর্মযোগে অঙ্গার যদি হীরক হয়, পেতল কি সোনা হবে না?

আমাকে সোনা করো। ঘর্ষণ, তাপন, ছেদন ও তাড়ন করো। আগে কষ্টিপাথরে ঘষো। পরে আগুনে পোড়াও। তার পরে ছেনি দিয়ে কাটো টুকরো-টুকরো করে। শেষে হাতুড়ির ঘায়ে পীড়ন করো। এই ভাবে পাকা করে অলঙ্কারে নিয়ে যাও আমাকে। আমার অহঙ্কার থেকে তোমার অলঙ্কারে। যদি একবার অলঙ্কার হতে পারি তবে কি দুলব না তোমার কণ্ঠহার হয়ে?

সেই কলসীর কাহিনীটি স্মরণ করো। অলস চাকর, কর্তব্যকার্যে স্পৃহা নেই, নিত্য প্রভুর গঞ্জনা সয়ে দিন কাটায়। পালাবার মতলবে কলসী নিয়ে ঘাটে যাচ্ছে। কলসীটি নির্জনে কোথাও ফেলে দিয়ে চম্পট দেবে। এমন সময় কলসী কথা কয়ে উঠল : 'শোনো, আমিও প্রথমে মাটি ছিলাম। কত দূর দেশ থেকে আমাকে খুঁড়ে এনেছে কোদাল দিয়ে। জলে ভিজিয়ে রেখেছে। কঙ্কর আর পাথর বার করবার জন্যে পায়ে দলেছে। তার পরে পাট করে তুলেছে কুম্ভকারের চাকে। চাকে পাক দিয়েছে। ঘুরিয়ে মেরেছে। হাতের কায়দায় ছাঁচ গড়েছে কলসীর। এততেও শেষ নেই। কাঁচা কলসকে রোদে পুড়িয়েছে, আগুনে দিয়েছে। শেষেই না আমি কলসী হলাম! এখন দেখ কত সন্তর্পণে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছ। কেউ নিয়ে যায় কক্ষে, কেউ বা মাথায়। কত আমার প্রতি যত্ন, কত কোমলকরুণ ব্যবহার। ছিলাম মলিন মাটি, এখন পবিত্র তৃষ্ণাবারি বিতরণ করছি।'

লোহার খড়্গ হয়ে পড়ে আছি। কাম ক্রোধ আর হিংসার প্রহরণ। কিন্তু, রামকৃষ্ণ বললেন, 'লোহার খড়্গে যদি পরশমণি ছোঁয়ানো হয়, খড়্গ সোনা হয়ে যায়।'

সে তখন নিজেই হয়ে ওঠে কামনীয়। তাকে দিয়ে তখন আর হিংসা-ক্রোধের কাজ হয় না। তরবারির আকারটা শুধু থাকে। দেহবোধ যায় কিন্তু দেহ যাবে কোথায়? তাই ঐ আকারবিকারটুকু যায় না। আসলে সেটা পোড়া দড়ি, কোনো রকমে ঝুলে আছে মাত্র। দিলেন আবার আরেক

উপমা : 'দূর থেকে পোড়া দড়ি বোধ হয়, কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে উড়ে যায়।' মনে হয় ষড়রিপুর ষড়ৈশ্বর্যই রয়েছে বুঝি, কিন্তু কাছে এলে বোঝা যায় ছলনা-ছায়া!

এই হল আসল জ্ঞানীর লক্ষণ।

এ ভাবটিই বোঝালেন আবার এক অদ্ভুত উপমায় : 'নারকোল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এই শুধু টের পাওয়া যায় যে এককালে ঐখানে নারকেলের বেল্লো ছিল।'

একবার সিদ্ধ যদি হতে পারো, তা হলে আর নতুন সৃষ্টি হবে না তোমাকে দিয়ে। তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।

কী সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ!

'সিদ্ধ ধান পুঁতলে কী হবে? গাছ আর হয় না।'

আলু-পটল সেদ্ধর কথা এক অর্থে বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে। এবার ধান সেদ্ধর কথা বললেন অন্য অর্থে।

এ হচ্ছে জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ! জ্ঞানাগ্নি যদি একবার জ্বলে, তখন আগুনই বা কি, জলই বা কি! কাকে বলে জাগরণ, কাকেই বা স্বপ্ন!

এবার একটা গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'এক কাঠুরে স্বপন দেখছিল। কে একজন এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি? তেড়ে এল কাঠুরে। কেমন সুন্দর রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম! ছেলেরা সর্ব লেখা-পড়া অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম! কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙে দিলি? তখন সে লোক বললে, ও তো স্বপন, ওতে আর কী হয়েছে! কাঠুরে বললে, দূর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়াও যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে যদি সত্য হয়, স্বপনে রাজা হওয়াও বা সত্য হবে না কেন?'

যা ভাবছি জাগরণ, কে জানে তাই সত্যি স্বপন কিনা! যখন শেষ-বারের মত ঘুমোব, যে ঘুমের আর জাগা নেই, কে জানে তখনই ঠিক জেগে আছি বলে অনুভব করব কিনা! আর যা এতদিন জাগরণ বলে মনে করে এসেছি তাই হয়ে দাঁড়াবে না আকাশকুসুম।

তাই কোথায় তুমি যাবে? যদি তিনি বনে থাকেন তবে তিনি মনেও

আছেন। যদি থাকেন গুহায় তবে আছেন শয্যায়। যদি আছেন বিজনে, তবে আছেন জনে-জনে।

'তাই,' রামকৃষ্ণ বললেন একটুকরো এক রামায়ণের গল্প : 'রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর বললেন, থাকবো না সংসারে, তখন দশরথ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন বশিষ্ঠকে। পাঠিয়ে দিলেন রামচন্দ্রকে বোঝাবার জন্যে। বশিষ্ঠ বললেন, রাম! যদি সংসার ঈশ্বর-ছাড়া হয়, তুমি ত্যাগ করতে পারো। রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হল না!'

হায়, গৃহ তো ছাড়ব, কিন্তু দেহ-গেহ ছাড়ি কি করে? গৃহ ছেড়ে যেখানে যাব সেখানেই তো নিয়ে যাব এই দেহ-গেহকে।

ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসীর আবার কুটির নির্মাণ। নিজের বৃত্তি ছেড়ে দ্বারে-দ্বারে ফিরি করে বেড়ানো। পুত্র ছেড়ে চেলা-গ্রহণ। হায়-হায়, এ আবার কী অপরূপ মায়া! মায়া ছাড়তে মায়াপাশেই ফের বাঁধা পড়া!

॥ ৩৬ ॥

তাই, আমি থাকবো আমার হকের ঘরে, যাব না কুহকের সন্ধানে।

সংসারেই থাকবো, কিন্তু থাকবো সং ফেলে সারকে নিয়ে।

একটি জোরালো ঘরোয়া উপমা দিয়ে বোঝালেন রামকৃষ্ণ। সেই কুলো আর চালুনির উপমা। চালুনি না হয়ে কুলো হবে।

কিন্তু একদল আছে যারা জাঁতি। যা পায় দু টুকরো করে দু টুকরোকেই ত্যাগ করে। তাদের শুধু তর্ক আর বিতণ্ডা। তাদের শুধু উড়িয়ে দেওয়া। ধারণায় কিছুই না ধরা।

রামকৃষ্ণের ভাষায়, তারা হচ্ছে 'আদাড়ে'।

কিন্তু 'আদাড়ে'ই যদি না থাকবে তবে 'বাগাটে'ই বা হবে কেন? বিষবৃক্ষ আছে, আবার আছে চন্দনতরু। বিদ্যার পাশাপাশি আছে আবার অবিদ্যা। মহা বিদ্যা আর মহা অবিদ্যা দুই-ই মহাবিদ্যা।

রামকৃষ্ণ আরেক টুকরো গল্প বললেন রামায়ণ থেকে :

'অযোধ্যায় সব বাড়ি যদি অট্টালিকা হত তা হলে বড় ভালো হত। রামকে বললেন জানকী। অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা, পুরোনো। রাম বললেন, সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রিরা কি করবে?'

মন্দটি আছে বলেই তো ভালোটি আনন্দকর। দুষ্ট আছে বলেই তো শিষ্টকে এত মিষ্টি লাগে। জটিলা-কুটিলা আছে বলেই তো কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণলীলা।

কী একটি অপূর্ব উক্তি করলেন রামকৃষ্ণ।

'জটিলে-কুটিলে না হলে লীলা পোষ্টাই হয় না।'

তোমার লুকোচুরি খেলা কী করে জমবে যদি আলো-আঁধারের না জাল বোনো অরণ্যে। তোমার অবগুণ্ঠনটি আছে বলেই তো তোমার অনাবৃতিটি এত মধুর। দুই চোখ অশ্রুতে ভরে দেখি বলেই তো তোমার মুখ এত সুন্দর লাগে!

যাই বলো, ভগবানকে দেখার শক্তি যদি চাও তো আসক্তি কমাও। বাইরে মালা জপলে, তীর্থে গেলে, গঙ্গাস্নান করলে কী হবে? আসল হচ্ছে মনের মার্জন। মুখের গর্জনে কিছুই হবার নয়।

পরিহাস মিশিয়ে বললেন রামকৃষ্ণ: 'টিয়াপাখি সহজ বেলা বেশ রাধাকৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরলেই নিজের বুলি বেরোয়—ক্যাঁ ক্যাঁ!'

ভিজে দেশলাই হয়ে থাকব না। শুকনো দেশলাই হয়ে থাকব।

শুকনো দেশলাই একবার ঘষলেই দপ করে জ্বলে ওঠে। ঈশ্বরের নাম শুনলেই উদ্দীপনা হয়। অশ্রু আর পুলক একসঙ্গে দেখা দেয় হাত-ধরাধরি করে। কে যে কোনজন বুঝে ওঠা যায় না।

কিন্তু বিষয়াসক্ত মন?

'বিষয়াসক্ত মন,' বললেন রামকৃষ্ণ: 'ভিজে দেশলাই। হাজার ঘষো, কোনো রকমেই জ্বলবে না, কাঠি ভেঙে গেলেও না। কেবল একরাশ কাঠিই লোকসান হয়।'

তেমনি: 'ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বকে টানে না।'

আগুন জেলে ভিজে দেশলাই শুকিয়ে নাও। আগুন মানে ত্যাগের আগুন, অনাসক্তির আগুন। জল ঢেলে ছুঁচের কাদা ধুয়ে ফেল। জল মানে অশ্রুজল, ভালোবাসার কান্না।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করো, ভগবানের কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে দেখি এমন সাধ্য কি! কৃপা কি সহজে হবে? অহঙ্কার যতদিন থাকবে ততদিন তাঁর আসবার লগ্ন আসবে না। আর অহঙ্কার কি সহজে যায়? অপূর্ব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ি বেরিয়েছে!'

'নিজে কর্তা হয়ে বসলে ঈশ্বর আর আসেন না। বলেন, ও তো আর নাবালক নয় যে অছি হব। ও এখন সেয়ানা হয়েছে, লায়েক হয়েছে, তেমনি গোঁফে চাড়া দিয়ে বসেছে সাইনবোর্ড মেরে, আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াই এমন সাধ্য কি।'

বলে ঘরোয়া একটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ির কর্তাকে যদি কেউ বলে, মশায়, আপনি এসে জিনিস বার করে দিন, তখন কর্তা বলে, ভাঁড়ারে একজন যে রয়েছে, আমি আর গিয়ে কি করব!'

কিন্তু আমার 'আমি' যাবে কি করে?

'আমি' একেবারে যায় না। আবার উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছি কিন্তু কাটা ছাগলের মত ভ্যা-ভ্যা করে।'

'আমি' হচ্ছে উঁচু ঢিপি। উঁচু ঢিপিতে কি জল জমে?

চমৎকার বললেন রামকৃষ্ণ : 'আমি-রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপাজল জমে না।'

তবে উপায়?

উপায় হচ্ছে কান্না। দুঃখে একবার কান্না, আনন্দে একবার কান্না। তোমাকে না পেয়ে কান্না, তোমাকে পেয়ে কান্না। না পেয়ে কান্না, কবে তোমাকে পাব? পেয়ে কান্না, এতদিন তুমি ছিলে কোথায়? না পেয়ে কান্না, দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। পেয়ে কান্না, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি।

তাই, রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি-ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফেল।'

আমাকে কাঁদাও। আমাকে সমতল করো। আমাকে দুঃখের দীক্ষা দাও। যদি দুঃখ না দাও তবে আমার হিসেবে যে কম পড়ে যাবে। তোমার কাছে যে আমার অনেক পাওনা। যদি প্রহার না পাই তবে কি করে পাব তোমার প্রলেপের পেলবতা! যদি রোগের রাত্রি না আসে কি করে পাব তোমার আরোগ্যের সুপ্রভাত! যদি তোমার জন্যে কলঙ্কসাগরে না ভাসি কি করে হব তোমার বুকের অলঙ্কার!

তোমার কাছে আমার এত পাওনা, অথচ উলটে, আমারই কাছে তোমার অফুরন্ত দাবি। বললে, দুঃখ দিলাম, একে আনন্দে রূপান্তরিত করো। বন্ধন দিলাম, একে নিয়ে যাও মুক্তিতে। সংকোচ দিলাম, একে নিয়ে যাও প্রকাশে। মাটি দিলাম, একে এখন স্বর্গ বানাও।

কত বড় দুষ্কর ব্রত সাধন করতে বসেছি আমি, বেদনাকে নিয়ে যাব আনন্দে, কামনাকে নিয়ে যাব নির্মলতায়, দীনতাকে নিয়ে যাব মহত্ত্বে। শূন্য হাতে এসেছি সংসারে, বিনা-উপকরণে স্বর্গসৌধ নির্মাণ করে যাব। ক্ষীণায়ু ক্ষুদ্র প্রাণী হয়ে নিজেকে ভাবব অনন্তের আয়তন। এই সংসারে তোমাকে আনতে পারলেই তা স্বর্গ হয়ে উঠবে। তুমি পৃথিবীকে বর্ণে-স্বর্ণে গন্ধে-ছন্দে রূপান্তরিত করেছ, আমি স্বর্গে সংসারের রূপান্তর ঘটাব।

আমি কী করতে পারি? তুমি যদি করুণা না করো তবে কিছুই হবার নয়। না আসে মেঘ, না হয় বৃষ্টি, না বয় হাওয়া। আমি কী করতে পারি? শুধু পাখা চালাতে পারি, কিন্তু তোমার কৃপার দক্ষিণবায়ু যদি না আসে তবে সবই অদক্ষিণ। তোমার কৃপা আকর্ষণ করবার জন্যেই তো আমার কর্ম। যদি একবার তোমার কৃপার হাওয়া ভেসে আসে কে আর তখন পাখায় হাওয়া খায়?

বললেন রামকৃষ্ণ : 'হাওয়ার জন্যে পাখার দরকার। কিন্তু পাখা তখুনি ফেলে দেয় যদি বয় একবার দক্ষিণে হাওয়া।'

ঈশ্বরের উপর যদি অনুরাগ আসে, তবে কিসের আর জপতপ-উপাসনা? হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হতে পারলে বৈধীকর্ম কে করে?

কিন্তু, হে সর্বান্তর্যামী, তুমি তো সমস্ত জানো। তুমি তো জানো মন দিগন্ত-ধাওয়া কিন্তু কর্মটি কত ক্ষীণ। ইচ্ছার অনুপাতে ক্ষমতা কত সংক্ষিপ্ত। তুমি কি খর্ব কর্ম দেখবে, দেখবে না আমার পর্বত-ছোঁওয়া ইচ্ছাটিকে? হে অখিললোকলোচন, তুমি এত দেখতে পাও, আর এটুকু দেখবে না? কর্ম দেখবে মন দেখবে না? ভাষা দেখবে ভাব দেখবে না? কি বলতে পারিনি তাই দেখবে, কি বলতে চেয়েছি তা দেখবে না? আমি যদি তোমার চোখের আড়ালে নই, তুমি কেন আমার চোখের আড়ালে? রূপে-রূপে মিশে তুমি অরূপ হয়ে আছ। আমার রূপে কেন তুমি ধরা দেবে না আমার কাছে? আমার রূপটি যদি ধরো তবে কি আমার মনটিও ধরবে না?

'ভগবান মন দেখেন।' কেমন সরল অথচ সতেজ ভাষায় বললেন রামকৃষ্ণ : 'কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না।'

তারপর এবার দেখুন রামকৃষ্ণের কথাশিল্প :

'শোর-গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে সে লোক ধন্য। আর

হবিষ্য করে যদি কামিনীকাঞ্চনে মন রাখে তা হলে সে ধিক। যদি কেউ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভিতরে কামিনীকাঞ্চনে মন, তাকে বলি ধিক। আর যে খায়দায় বেড়ায়, কামিনীকাঞ্চনে মন নেই, তাকে বলি ধন্য।'

বলে ফের বললেন, 'মন্তর মানে মন তোর। যার ঠিক মন তার ঠিক করণ।'

মানুষ কি বুঝতে পারে কোথায় পড়ে আছি! ভুলকেই মনে করে সে ফুলশয্যা। বিপথকেই মনে করে পান্থনিবাস। কিন্তু মন যদি গভীর থেকে একবার কেঁদে ওঠে মুক্তির জন্যে, তা হলেই তুমি উন্মুক্ত হলে।

একটি বিস্ময়কর গল্প বললেন রামকৃষ্ণ। শুচিবায়ুগ্রস্ত সন্ন্যাসীর বলা নয়, এক উদাররসবুদ্ধি সাহিত্যিকের বলা :

'দু বন্ধু বেড়াতে চলেছে। একজায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বললে, এস ভাই, একটু ভাগবত শুনি। আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে। তারপর সে সেখান থেকে চলে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরক্তি এল। সে আপনা-আপনি বলতে লাগল, ধিক আমাকে। বন্ধু আমার হরিকথা শুনছে আর আমি কোথায় পড়ে আছি। এদিকে যে ভাগবত শুনছে তারও ধিক্কার হয়েছে। সে ভাবছে আমি কি বোকা! কি ব্যাড়ব্যাড় করে বকছে, আর আমি এখানে বসে আছি। বন্ধু আমার কেমন আমোদ-আহ্লাদ করছে! এরা যখন মরে গেল, যে ভাগবত শুনছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল। আর যে বেশ্যালয়ে গিয়েছিল তাকে নিয়ে গেল বিষ্ণুদূত—নিয়ে গেল বৈকুণ্ঠে।'

'আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে'—কী চমৎকার একটি ব্যঞ্জনা! ছবিটি যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি।

প্রথমে যখন একটু উঁকি মেরে দেখি তখন যেন স্বাদ পাই না। পরে মন কেমন করে, কেন দু চোখ ভরে দেখিনি, শুনিনি দু কান ভরে। তোমাকে কি শুধু উঁকি মেরে দেখলে চলে? তুমি আমার অপরিচ্ছিন্ন সুখ, আমার ভূমা। তুমি আমার দশদিগ্বিকাশী আকাশ। তোমাকে আমি অনবগুণ্ঠিত করে দেখব।

তুমি রস আমি ভাব। রস ধারণ করবার জন্যে পাত্র চাই, তাই ভাব। তুমি রসিকশেখর। তোমাকে আস্বাদ করবার জন্যে চাই মহাভাব। বিরাট ভোগের জন্যে বিরাট ভাবের পাত্র।

তুমি কুসুম আমি গ্রন্থনসূত্র। হায় কুসুম যদি ফুটল গ্রন্থনসূত্র নেই, গ্রন্থনসূত্র যদি জুটল, দেখা নেই কুসুমের।

কবে তোমাকে গাঁথতে পারব আমার দিন-রাত্রির মালা করে।

॥ ৩৭ ॥

মন নিয়েই সব।

কিন্তু এমন করে কে বলেছে মনের কথা?

বললেন রামকৃষ্ণ, 'মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান। পরিবারকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।'

আমার এই একের মধ্যে তুমি বহু হয়ে বিরাজ করছ। আমার ভাবে আর কর্মে বোধে আর প্রকাশে আনন্দে আর সৌন্দর্যে বহুধা হয়ে বিকীর্ণ হচ্ছ। কিন্তু একই তুমি। অন্তরে-বাহিরে যে দিকে তাকাই, মন কম্পাসের কাঁটার মত শুধু সেই ধ্রুবতারাকেই দেখে। তোমাকে খুঁজি কান্তারে-প্রান্তরে, পর্বতগুহায়। চেয়ে দেখি অন্তরেই সেই নির্জন বনানী, সেই গহন গুহা। তোমাকে খুঁজি তারা-ভরা বিভাবরীতে। দেখি দুঃখের বিভাবরীতে তুমি আমার আনন্দের শুকতারা।

মন নিয়েই কথা। এই মনটিই যদি স্থূল সংসারে বন্ধক দিয়ে ফেলি তা হলেই পড়ে যাই বন্ধনে। আর তোমার জয়ধ্বনি করি না। আর তখন দান করি না নিজেকে, ক্ষয় করি। শুধু কান্না আর হুতাশের আগুন জ্বালি, জ্বালি না আর আনন্দ-হোমকুণ্ডের নির্ধূম হুতাশন।

'মন নিয়েই কথা।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত।'

আমি রাজাধিরাজের ছেলে, আমাকে আবার বাঁধে কে? এ জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ তুমি আমার জীবনে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে বলে। এ জীবনে তাই আমি অপরিমাণরূপে বেঁচে যাব, বীরের মত স্বীকার করব হাসিমুখে, তারপর নিজেকে দান করব, ছেড়ে দেব, ঢেলে দেব প্রাণপণে, বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ কর্মের মধ্যে। তুমি যে কত কাজ করছ, অহোরাত্র তা দেখছি না চোখের সমুখে! গতির উল্লাসে উজ্জ্বল একটি স্থিতি হয়ে বিরাজ করাই তোমার কাজ। তার গতির মধ্যে নদী

একটি স্থিতি পায় সমুদ্রের শাশ্বত শান্তিতে। আমি আমার গতির মধ্যে পাব এই একটি বিস্তীর্ণ হবার শান্তি। ফুল যেমন বহমান বাতাসে গন্ধটি ত্যাগ করে তৃপ্ত মুখে অবস্থান করে, তেমনি আমার অবস্থান। কর্মের মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে ক্ষয় করব না দান করব, ব্যয় করব না বিতরণ করব। আমার শুধু পরিবর্তন। 'পরি'-উপসর্গের আরেক অর্থ বর্জন, ত্যাগ। পরিবর্তন মানে বর্জনপূর্বক বর্তন। ত্যাগ করে অবস্থান। দান করে অদৈন্য।

কর্মফল আছেই আছে। কত উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'লঙ্কা মরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে।

পাপ আর পারা কেউ হজম করতে পারে না। কেউ যদি লুকিয়েও পারা খায়, কোনো দিন না কোনো দিন গায়ে ফুটে বেরুবেই।

মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর বেরোয়।'

তবু জমি পাট করো। নিষ্কণ্টক করো। বললেন রামকৃষ্ণ, 'জমি পাট করা হলে যা রুইবে তাই জন্মাবে।'

সংসারে যখন থাকবে তখন জানো সংসারের কোথায় সঙ কোথায় সার। সেটুকু জেনে নিয়ে 'সারে মাতো'। এককথায় বললেন রামকৃষ্ণ, 'ছুরির ব্যবহারের জন্য ছুরি হাতে করো।'

কিন্তু, যাই বলো, ভোগের শান্তি না হলে বৈরাগ্য আসে কই? ঢেউ যখন আসে তার চেয়ে বেশি শক্তি যখন সে চলে যায়। ভোগের নেশার চেয়েও ত্যাগের নেশা বেশি জোরালো। খেলনা পাবার জন্যে ছেলে যতটা কাঁদে, খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মা'র কোলে যাবার জন্যে তার ঢের বেশি কান্না।

ধনুকের ছিলা নিজের কাছে যত জোরে টানি তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে ছুঁড়ে মারি তীর। যত কাছে আসে তার চেয়ে ঢের বেশি দূরে ছোটে।

নিজেকে নিয়ে বড় কাছাকাছি ছিলাম, স্বার্থপরতার কারাবাসে। তোমাকে নিয়ে চলে যাই দূর মাঠের উন্মুক্তিতে। ভোগের দিনে গায়ে ধুলো লেগেছে বলে শোক করেছি, এখন ত্যাগের দিনে সেই ধুলোতেই গড়াগড়ি দিচ্ছি। শোক এখন শ্লোক হয়ে উঠেছে। যা মনে হত দারিদ্র্য তাই এখন বৈভব। যা মনে হত রিক্ততা তাই শক্তি আর শান্তির সমাহার।

কিন্তু সুসময়টি আসা চাই।

বললেন রামকৃষ্ণ, 'ডিমের ভিতর ছানা বড় হলেই পাখি ঠোকরায়। সময় হলেই ডিম ফুটোয় পাখি।'

কবে আসবে আমার সেই শুভলগ্ন?

স্বর্ণবর্ণ পর্ণ দুলছে গাছের শাখায়। দুলে-দুলে খেলা করছে। দেখতে-দেখতে সোনার বর্ণ ছেড়ে ধরছে হরিতবর্ণ। দেখতে-দেখতে শেষে বিবর্ণ হয়ে যায়। জীর্ণতায় ঝরে পড়ে মাটিতে। ধুলোর সঙ্গে উড়ে বেড়ায় শুকনো হাওয়ার হাহাকারে। কে বলবে এ একদিন কাঞ্চনবর্ণ কমনীয় কিশলয় হয়ে বিরাজ করছিল শাখাশ্রয়ে?

আমিও কি তেমনি কাল-সমীরণে সমীরিত হতে-হতে ঝরে পড়ব একদিন? এমনি অপ্রতিরোধ্য জীর্ণতায়? তোমার দেখা কি পাব না? এই তো সামান্য একটি সংকীর্ণ জীবনপাত্র? এই পাত্রমেয় ভিক্ষা—সেটুকু করুণাও কি পাব না তোমার হাত থেকে?

কিন্তু তুমি আছ এই বহ্নিময় বিশ্বাস কি আছে?

তুমি নেই, তবে চারদিক এত আশ্চর্য কেন? কেন সব কিছু পেয়েও মনে হয় তোমাকে পেলাম না? সব নেতি করে দিচ্ছি, তবু তোমায় কেন নস্যাৎ করতে পারছি না? সব ত্যাগ করতে পারি তবু তোমাকে ফেলতে পারি না কেন?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। একজন হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজছে বাবুকে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়; জানলায় হাত দিয়ে বলছে, এ নয়। নেতিনেতিনেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, ইহ, এই বাবু।'

অন্ধকারে কবে পাব তোমার গায়ের স্পর্শ?

কিন্তু তুমি অন্ধকারে আছ, দাও আগে আমাকে এই আলোকিত বিশ্বাস। একটি প্রণিহিত প্রত্যয় দাও, আর রেখো না, রেখো না সংশয়ে। অন্ধকারে যদি তোমার স্পর্শের চমক নাও লাগে, যদি নাগাল না পাই হাত বাড়িয়ে, তবু এ যেন অন্তত বুঝি তুমি ছাড়া সব কিছু অন্ধকার। অন্তত এ যেন বুঝি তোমাকে না ছুঁলে বাঁচব না, তোমাকে না পেলে চলবে না কিছুতেই।

'বিশ্বাসের জোর কত শোনো।' গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'একজন লঙ্কা থেকে সমুদ্দুর পার হবে। বিভীষণ বললে, কাপড়ের খুঁটে এই জিনিসটা বেঁধে নাও। কিন্তু, দেখো, খুলে দেখো না কিন্তু। এর জোরে তুমি

নির্বিঘ্নে পার হয়ে যাবে। লোকটি বেশ হেঁটে যাচ্ছিল সমুদ্রের উপর দিয়ে। খানিক পরে আশ্চর্য হয়ে ভাবলে, কী এমন বেঁধে দিল বিভীষণ যার গুণে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। এই ভেবে খুঁট খুলে দেখলে, কি ব্যাপার! কিছুই নয়, একটি পাতায় কেবল রাম-নাম লেখা। ওমা, এই জিনিস! এরই জন্যে এত! যেমনি এই ভাবা অমনি ডুবে যাওয়া।'

বলেই একটি কাব্যময় উক্তি সংযোজন করলেন :

'পাহাড়ে গুহায় নির্জনে বসলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ।'

কিন্তু শুধু বিশ্বাসেই কি তোমাকে দেখতে পাব? শুধু নিশ্বাসেই কি পাব আমার প্রাণধারণের প্রচুরতা? অন্ধকারে তোমাকে দেখি কি করে? শুধু ছুঁলেই কি আমার চলবে, তোমাকে দেখব না?

যতক্ষণ ভালোবাসা না আসে ততক্ষণ চোখ ফোটে না। কান ভুল শোনে। মন বসে থাকে। কথা শুকিয়ে যায়। যেই প্রেম জাগে, বিপর্যয় ঘটে যায়। কান দেখে। চোখ শোনে। মন কথা কয়।

তাকেই বলে প্রেমের শরীর। ভাগবতী তনু।

বললেন রামকৃষ্ণ, 'তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন করতে-করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—প্রেমের চক্ষু প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁকে শোনে।'

একটি অনবদ্য কবিতা।

বলে যোগ করলেন : 'তাঁকে রাত-দিন চিন্তা করলে তাঁকে চারদিকে দেখা যায়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাকো, তবে খানিকক্ষণ পরে চারদিকে শিখাময় দেখা যায়।'

কিন্তু তোমাকে যদি ভালো না বাসি, তবে তোমাকে রাত-দিন চিন্তা করি কি করে?

॥ ৩৮ ॥

বিশ্বাসের আরেক নাম সরলতা।

তোমার প্রেমে গরল নেই। সে যেমনি তরল তেমনি সরল। শুধু তাই নয়, বিরামবিহীন।

প্রেম আমার দায় নয়, তোমার দয়া। তোমাকে ভালোবাসি কেন? হায়,

যে আমার পরমতম সুখ তার প্রতি আমার অনুরাগ হবে না? আমার বৈরাগ্যের বসনটি অনুরাগের রঙেই গেরুয়া হয়েছে।

সরলতার দুটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'এক সাধুর কাছে গিয়ে একজন উপদেশ চাইলে। সাধু বললে, আর কি উপদেশ দেব, ভগবানকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবাসো। লোকটি বললে, ভগবানকে কখনো দেখিনি, তাঁর বিষয় কিছু জানিও না, কি করে তাঁকে ভালোবাসব? সাধু তার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। জিগগেস করলে, এ সংসারে কাকে তুমি ভালোবাসো? লোকটি বললে, আমার কেউ নেই। শুধু একটা মেড়া আছে ঐটিকেই ভালোবাসি। ব্যস ওতেই হবে। সাধু বললে, ঐ মেড়ার মধ্যেই নারায়ণ আছে জেনে ঐটিকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবাসো আর সেবা করো। এই বলে সাধু চলে গেল। লোকটিও মেড়ার মধ্যে নারায়ণ আছে বিশ্বাস করে তার প্রাণপণ সেবা করতে শুরু করলে। বহুদিন পরে সাধুর সঙ্গে ফের লোকটির দেখা। কি হে কেমন আছ? লোকটি প্রণাম করে বললে, গুরুদেব, আপনার কৃপায় বেশ আছি। আপনি যেমন বলেছিলেন সেইরূপ ভাবনা করে আমার খুব উপকার হয়েছে। কি রকম? মেড়ার ভেতরে এক অপরূপ মূর্তি দেখতে পাই—তাঁর চার হাত—তাঁকে দর্শন করে পরমানন্দে আছি।'

সাধু ভাবছে আমার দর্শন হল কই? প্রেমচক্ষু বুজে আছে, কি করে দর্শন হয়?

তারপর সেই গোবিন্দ-স্বামীর গল্প :

'খুব অল্পবয়সে মেয়েটি বিধবা হয়েছে। স্বামীর মুখ কখনো দেখেনি। অন্য মেয়েদের স্বামী আসে, দেখে। একদিন বাপকে বললে, বাবা, আমার স্বামী কই? তার বাপ বললে, গোবিন্দ তোমার স্বামী। তাঁকে ডাকলেই তিনি দেখা দেন। ব্যস, আর কোনো কথা নয়। বাপের কথাতেই মেয়ের অটল বিশ্বাস। ঘরে দ্বার দিয়ে বসল। কাঁদতে লাগল অঝোরে, গোবিন্দ, তুমি এস, আমাকে দেখা দাও। কেন তুমি আসছ না? কেন তুমি লুকিয়ে থাকছ? মেয়েটির কান্না শুনে ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না, দেখা দিলেন।'

চাই এই বালকের মত বিশ্বাস। বালকের মত সরলতা। মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয় সেই উৎকণ্ঠা।

মা'র কথা মনে পড়েছে ছেলেকে তখন কে আটকায়!

হও এই সরল ছেলে। পাগল ছেলে। এত কিছুর জন্যে পাগল হলে একবার ঈশ্বরের জন্যে পাগল হও। লোকে একবার বলুক অমুক লোকটা ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়ে গেছে।

আমাকে পাগল করে দাও। 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'

সংসারে তুমিই একমাত্র স্থির, একমাত্র ধ্রুব, একমাত্র শাশ্বত। আর সব বস্তুমূল্যের অদলবদল হয়, তোমার মূল্যের ব্যাহতি নেই ব্যতিক্রম নেই। তোমাতে যে বুদ্ধি তাই তো স্থির বুদ্ধি। লোকে বলবে পাগল! রামকৃষ্ণ বললেন, 'পাতকুয়োর ব্যাঙ, বিশ্বাস করবে না যে একটা পৃথিবী আছে।' কিন্তু তুমি আমার পৃথিবী হয়েও উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা। ঘূর্ণ্যমান চক্রের মধ্যে স্থির বিন্দু। ঐটিতেই লক্ষ্যভেদ।

বালকের ব্যাকুলতার কী সুন্দর ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ :

'ছেলে ঘুড়ি কিনবে। মা'র আঁচল ধরে টানাটানি করছে, পয়সা চায়। মা গল্প করছে অন্য মেয়েদের সঙ্গে। ছেলের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন টানাটানি বেড়ে গেছে, আর উপেক্ষা করা যায় না, মা নানারূপ ওজর তুললে—না, উনি বারণ করে গেছেন, উনি এলে বলে দেব, এখুনি একটা কাণ্ড করবি নাকি? ছেলে কেনোমতে ভুলবে না, কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে দিলে। তখন বলতে বাধ্য হল মা, রোসো, ছেলেটাকে আগে শান্ত করে আসি। বলে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দিলে ছেলেকে।'

ছেলের কান্নার কাছে মা করবে কি? সাধ্য নেই বধির হয়ে থাকেন। বিরক্ত হলেও ছুঁড়ে দেবেন পয়সা। তাঁর কৃপার কাঞ্চনখণ্ড।

আর তা দিয়ে আমি কী করব? ঘুড়ি কিনব। আকাশে ওড়াব। আমার আনন্দের পত্রটি পাঠিয়ে দেব নীলাকাশের রাজধানীতে।

বেঁধে তো আদায় করতে পারব না, কেঁদে আদায় করব। কান্না দেখতে জল ভিতরে আগুন। বাইরে কোমল ভিতরে অনমনীয়। যাবে কোথায়? রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বরের ঘরে আমাদের হিসসা আছে। বেশি বাড়াবাড়ি বুঝলে বেগতিক বুঝে ফেলে দেবেন আমাদের হিসসা।'

চাই তাই এই বালকের ব্যাকুলতা। সর্বভঞ্জন প্রভঞ্জন।

সার্থক কথাশিল্পীর মত মনোরম একটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ :

'যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ-খচমচ করে। তখনো কৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নেই। সাজ পরে আপনমনে তামাক খাচ্ছে, গল্প করছে। যখন সে সব

থামল, নারদ ব্যাকুল হয়ে বীণা বাজাতে-বাজাতে আসরে নেমে গান ধরল, প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন, তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারল না। হুঁকোটা নামিয়ে রেখে আসরে নেমে পড়ল।'

যদি ব্যাকুলতা না থাকে তীর্থভ্রমণ ব্যর্থভ্রমণ। যদি ব্যাকুলতা থাকে এখানেই বারাণসী।

সরলতা হল, ব্যাকুলতা হল, এখন একটু সাধন করো। জীবনসাধনকে দেখবে, একটু সাধন করবে না? সুখদুঃখমন্থনধনকে দেখবে, একটু মন্থন করবে না?

পর-পর উপমা সাজালেন রামকৃষ্ণ : 'বড় মাছ ধরতে হলে চার ফেলতে হবে। দুধ থেকে মাখন তুলতে হলে মন্থন করতে হবে। সরষে থেকে তেল বার করতে হলে সরষে পিষতে হবে। আর,' এইটিই অভিনব উপমা : 'মেদীতে হাত রাঙা করতে হলে মেদী বাটতে হবে।'

তাই, আর যাই হোক, পুঁথিতে হবে না। কান্নার সময় কি পুঁথি লাগে? মা'র কাছে ছেলে যখন ঘুড়ির পয়সা চায় তখন কি তার তত্ত্বজ্ঞান লাগে কি করে ঘুড়ি আকাশে ওড়ে? তবু শুধু কথা আর কথা। বাক্যের চাকচিক্য। শব্দের শোভাযাত্রা। কথার কারুকাজ।

'পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়, তাও না।'

পণ্ডিতগুলো দরকচা-পড়া। তাদের সব পণ্ড বলেই তাদের বোধহয় পাণ্ডিত্য। বলিষ্ঠ উপমা চয়ন করলেন রামকৃষ্ণ :

'পণ্ডিত খুব লম্বা চওড়া কথা বলে, কিন্তু নজর শুধু দেহের সুখে, কামিনীকাঞ্চনে। কেমন? যেমন শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে। কেবল খুঁজছে কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়! শুধু-পণ্ডিতগুলো দরকচা-পড়া। না এদিক, না ওদিক।'

না পক্ক না অপক্ক, না সিদ্ধ না অসিদ্ধ। দরকচা বাদ দিয়ে খাবে তারও উপায় নেই, সবটাই শুষ্ক, আর্দ্র নেই কোনোখানে।

তাই তো রামকৃষ্ণের দুই সাধ ছিল জীবনে। 'আমি ভক্তের রাজা হব, আর, আমি শুঁটকে সাধু হব না।'

'তোমরা সারে-মাতে থাকো, আমি রসে-বশে থাকব'—তাই বলেছেন রামকৃষ্ণ। আমি গোমড়ামুখো গোঁয়ারগোবিন্দ সন্নেসী নই, আমি রসের সাগরে ভাসব। আমি জ্ঞানের আগুন নই আমি প্রেমের চন্দ্রিকা। আমি

বন্ধ ঘরের অন্ধ বাতাস নই, আমি মুক্তিময় অনাময় সমীরণ। আমি গুরু-গম্ভীর নই, আমি মেদুরমধুর। আমি বৈরাগ্যের রাজমুকুট নই, আমি ভালোবাসার কণ্ঠমাল্য। আমি অর্থী-প্রার্থীর গুরুদেব নই, আমি বঞ্চিত ও অকিঞ্চনের বন্ধু। যেখানেই করুণতম ব্যথা সেখানেই আমার মধুরতম গান।

আমার বসনটি শাদা, রঙিন নয়। আমি মূর্তিমান সরলতা, বাইরের রঙের ধার ধারি না। কোথায় যাব রে আর বাইরে, ঘরেই তো তাঁর কত ফাগ-রাগ!

আমার রাগভক্তি, ওদের মত বৈধীভক্তি নয়।

বললেন রামকৃষ্ণ, 'রাগভক্তি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মত। তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না।' আর বৈধীভক্তি? 'বৈধীভক্তি আসতেও যতক্ষণ যেতেও ততক্ষণ।'

শাস্ত্র পড়ে শুধু তর্ক করার জন্যে, বিদ্যে জাহির করবার জন্যে। শাস্ত্র বেশি পড়লেই তর্কবিচার এসে পড়ে। তিনি আছেন শুধু এটুকু জানবার জন্যেই শাস্ত্র। অনেক কিছুই তো শিখলে শাস্ত্র পড়ে, কিন্তু তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হলে সব বৃথা।

জোরালো ভাষার জাদুতে সুন্দর একটি রসিকতা করলেন রামকৃষ্ণ : 'যারা জ্ঞানাভিমানী তারাই শাস্ত্র মীমাংসা তর্ক যুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি ঈশ্বরকে কেউ একবার জানতে পারে, তাহলে ওসব হাবজাগোবজা বিষয় জানতে ইচ্ছেও হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে—আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাব। আমি এক জালা জল খাব। বৈদ্য তখন বলে, খাবি, আচ্ছা খাবি। এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে কি বলবে তা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে।'

যখনই সৌরভের স্থানটির সন্ধান মেলে নিজের হৃদয়ের মধ্যে, তখনই বই বন্ধ করে দিতে হয়, তখনই জ্ঞান হয় ও সব 'হাবজাগোবজা'।

'এই বলে বৈদ্য তামাক খায়।' কী সুন্দর করে বললেন কথাটা! বিকার কাটবার আশায় অপেক্ষা করছেন। বিষক্ষয় করবার জন্যে বিষই ওষুধ দিয়েছেন। দুঃখ থেকে ত্রাণ করবার জন্যেই দিচ্ছেন অনন্ত দুঃখ।

শুধু পড়লেই হবে না, করতে হবে। খুঁজতে হবে। কিনতে হবে। ছোট একটি গল্প, কিন্তু ইঙ্গিতটি গভীরে।

'কুটুম্ববাড়ি থেকে চিঠি এসেছে তত্ত্ব করতে হবে। সে চিঠি আর

খুঁজে পাচ্ছে না। কি-কি জিনিস পাঠাতে হবে কেউ বলতে পাচ্ছে না ঠিক-ঠিক। খোঁজ্, খোঁজ্—কোথায় সে চিঠি! অনেক কষ্টে বহু খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। কী লিখেছে? সবাই কাড়াকাড়ি করে পড়ে দেখলে, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাবে, আর একখানা রেলপেড়ে কাপড়। ব্যস জানা হয়ে গেছে তত্ত্ব। এবার উড়িয়ে দাও পুড়িয়ে দাও চিঠি। কোনো প্রয়োজন নেই। যা জানবার তা জেনে নিয়েছি। তখন চিঠিটা ফেলে দিলে। এতেই কি শেষ হল? হল না। এখন ..বার বেরুতে হবে সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড়ে।'

রামকৃষ্ণ যে কথার চারুকারু তার প্রমাণ তাঁর কাছে কাপড় শুধু কাপড় নয়, রেলপেড়ে কাপড়।

তেমনি, তুমি যে আছ এ খবর কেমন করে যেন এসে গিয়েছে আমাদের কাছে। এত বেগচাঞ্চল্যের মধ্যে কোথায় একটি মৌন হয়ে বিরাজ করছ তুমি। এত সংশয়বাধার মধ্যে কোথায় একান্ত সহজে হাসছ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে। তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে জন্মেছ বলেই তুমি সহ-জ। সহজেই তোমাকে আমি উদ্ধার করব, আবিষ্কার করব। সন্ধান জেনে ডুব দেবো নিজের মধ্যে। তুমি তো অন্তরে নও, তুমি অন্তরে। তোমার তত্ত্ব মানে আমারই তত্ত্ব। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান।

আরো অন্তরঙ্গ করে বললেন কথাটা। ভাষায় আরো চমক ফুটিয়ে!

'সিদ্ধি-সিদ্ধি মুখে বললেই হবে না। সাধন চাই, তবেই তো বস্তু। সিদ্ধি গায়ে মাখলেও হবে না, কুলকুচো করলেও হবে না। নেশা করতে হলে সিদ্ধি খেতে হবে।'

বালিতে-চিনিতে মিশেল হয়ে আছে শাস্ত্রে। 'যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর।'

সা চাতুরী চাতুরী।

॥ ৩৯ ॥

শাস্ত্র জোটে কিন্তু সাধুসঙ্গ জোটে কই?

শাস্ত্র নিষ্প্রাণ কথা, সাধু প্রাণময় উদাহরণ।

দুটো প্রাণের কথা কইবার জন্যে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি! শুধু কইবার

জন্যে নয়, শোনবার জন্যে। একা ঘরে বসে তোমাকে যখন ডাকি তখন তো কথা কই। কথার প্রীতি জিভে লেগে থাকে। কিন্তু কান শোনে না যে অন্য কারু কান্না। আমার মত আর কেউ কাঁদছে এ শোনবার জন্যে কান উন্মুখ হয়ে আছে। কানে কে করে সে রোদন-মধু-বর্ষণ?

স্বচ্ছ ঘটে একটি প্রদীপ জ্বলছে, সেই হচ্ছে সাধু। সেই দীপটি হচ্ছে ভক্তির আলো। আমার মাটির ঘরটি অন্ধকার। প্রদীপ কবে নিবে গিয়েছে ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায়। আমার দীপমুখে লাগুক একবার সেই বহ্নি-চুম্বন, আমি জ্বলে উঠি। আলোকিত হই। আমি আলোকিত না হলে তুমি অবলোকিত হবে কি করে?

তাই তো বলি, জীবনের মরুভূমিতে পাঠিয়ে দাও দু একটি নির্জন নদীধারা। সাধুরাই নদী, তোমার রসই তাদের সলিল, সেখানে অবগাহন করে শীতল হই। জলও শীতল নয়, শিশিরও শীতল নয়, যে ভগবানের প্রেমে প্রেমিক একমাত্র শীতল সে-ই। আমার জীবনের উৎসবে দাও সেই শীতল-ভোগ।

পরশমণির খনি নেই, চন্দনের বন নেই, তেমনি সাধুও নেই স্তূপাকার হয়ে। তাই তো সেই দুর্লভের জন্যে এত দুর্লোভ। পরশমণি নিজে থেকে বলে না, আমার স্পর্শে সোনা। চন্দন নিজে থেকে বলে না আমার মধ্যে সুগন্ধ। কিন্তু দৈবাৎ যদি সে পরশমণির সঙ্গ পাই স্বর্ণ হয়ে যাব। যদি চন্দনের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে জীবনের সর্বক্ষণ চলবে শুধু সুগন্ধ-বন্দনা। যেদিকে পরশমণি সেইদিকেই কনকদ্যুতি। যেদিকে চন্দন সেইদিকেই সুবাসের আবাস।

সাধু দেখলে ভগবানের ভাব উদ্দীপন হয়।

'যেমন,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'উকিল দেখলে মামলা ও কাছারির কথা মনে আসে। ডাক্তার কবরেজ দেখলে মনে পড়ে রোগ আর ওষুধের কথা।'

সাধুর যত কাছে যাব ততই পাব মাধুর্যনদীর সংবাদ। আবার উপমা দিলেন : 'গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই পাবে শীতল হাওয়া। স্নান করলে আরো শান্তি।'

হায়, পড়ে আছি বিষয়বিষের অরণ্যে, কোথায় সেই শীতলবাহিনী গঙ্গা। শুধু উপদেশ শুনিয়ে কী হবে? লেকচারে কিছুই করতে পারবে না। রামকৃষ্ণ উপমা দিলেন : 'পাথরের দেয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের

চোট মারলে কুমিরের কী হবে? সাধুর কমণ্ডলু চারধাম ঘুরে আসে কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো।'

অন্তরে যদি একটি অস্থিরতা না আসে, যদি শুধু ভোগে-রোগেই মন জুরে থাকে, তা হলে কোথায় পাব সে অমৃতপানের পিপাসা? না, মাঝে মাঝে ঘোরতর সংসারীও মাথা তুলে তাকায় চারদিকে, জলে পড়লে লোকে যেমন হাত তোলে ঊর্ধ্বাকাশে। কোথায় কে একটু আশ্রয়-আশার সংবাদ দেবে, নিশ্বাসে আশ্বাস আনবে জড় দেহে! রামকৃষ্ণ বললেন, 'কুমির জলে চোট মারলে কুমিরের কী হবে? সাধুর কমণ্ডলু চারধাম ঘুরে আসে সেই তার সাধুসঙ্গ। তখন সে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।'

জ্যৈষ্ঠের রোদে সেই তার শ্রাবণমেঘের স্নিগ্ধ ছায়া।

সাধুসঙ্গের পিপাসা এলেই সদগুরু এসে জোটে। এ গুরু লেকচার দেয় না, চৈতন্য দেয়। রামকৃষ্ণের সরল-গভীর ভাষায় 'সেথোর মত হাত ধরে নিয়ে যায়।' একবার নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতে পারলে আর গুরু-শিষ্য ভেদ নেই। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।

গুরু নাম দেন। বিশ্বাস করে সেই নামটি নিয়ে গুঞ্জরিত হও। একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে বর্তিত হও তরঙ্গে-তরঙ্গে। তনুমনকে নামমালা করে তোল।

গুরুদত্ত নামটি নিয়ে সাধনভজন করো—এই তো কথা! কিন্তু কী একটি বিস্ময়কর কবিতা রচনা করলেন রামকৃষ্ণ :

'সমুদ্রে একরকম শামুক আছে। তার ভিতর মুক্তো তৈরি হয়। তারা সর্বদা স্বাতীনক্ষত্রের এক ফোঁটা বৃষ্টির জলের জন্যে হাঁ করে জলের উপর ভাসে। যেই এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়ে অমনি মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নিচে চলে যায়। যতদিন না মুক্তো হয় ততদিন আর উপরে আসে না।'

আমি কোথায় পাব সেই নামবৃষ্টিবিন্দু! তোমার নামটি ঠিক কি, কে আমাকে বলে দেবে! আমি শুধু তুমি-তুমি বলে কাঁদি। কে জানে, তারই জন্যে হয়তো নিরুত্তর হয়ে থাকো। তোমার নামটি পৌঁছে দাও আমার কানে-কানে। তোমার নাম পেলে ঠিকানাও জুটে যাবে। তখন আমার ডাকে সাড়া না দিয়ে আর পারবে না। পিঁপড়েও যদি এসে সমুদ্র স্পর্শ করে, তার স্পর্শে সমুদ্রে মৃদুতম হলেও একটি কম্পন তো ওঠে। আমার ক্ষীণ-কণ্ঠের কান্নাভরা ডাকে তোমার মৌনের সমুদ্রও কেঁপে উঠবে। তুমি উঠে

বসবে। এ কি, এ পথ চিনল কি করে, কি করে আমার নাম জানল!

উপেক্ষার পাহাড় হয়ে থেকো না, কৃপার বাতাস হয়ে বয়ে এস। আমি তোমার দয়া চাইতে জানিনে বলেই কি তুমি নির্দয় হয়ে থাকবে? তুমি গুরুরূপে চলে এস। যে গুরু সেই তুমি। গুরু তোমারই কৃপার ঘনীভূত বিগ্রহ। যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার সরিয়ে আলোকের পথ দেখায় সে তুমি ছাড়া আর কে। সে আলোর স্পর্শে হাজার বছরের বন্ধ ঘরের অন্ধকার এক পলকে পালিয়ে যাবে। আলো জ্বললে সঞ্চিত-পুঞ্জিত অন্ধকার একটু-একটু করে যায় না। সম্পূর্ণটাই এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়। তেমনি তোমার স্পর্শে এক মুহূর্তেই আমার গ্রন্থিমোচন হবে— দৃষ্টির গ্রন্থি, স্পর্শের গ্রন্থি, আকাঙ্ক্ষার গ্রন্থি।

সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'ভেলকিবাজিতে একগাছা দড়ি একটা জায়গায় বাঁধে, তাতে অনেক গেরো দেওয়া থাকে। তার নিজের হাতে এক-ধার ধরে দড়িটাকে নাড়া দেয়, অমনি গেরোগুলো সব খুলে যায়। কিন্তু আর কেউ খুলতে পারে না সেই গেরোগুলো। গুরুর কৃপা হলে খুলে যায় এক মুহূর্তে।'

কিন্তু গুরু যদি লোকশিক্ষা দিতে নামে, আদেশ পেয়ে, চাপ-রাশ পরে নামতে হয়। নিজের অভিমানের প্রভাবে কিছু হবে না। কবির ভাষায় বললেন রামকৃষ্ণ, 'বাগবাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে তা হলে তার এমন শক্তি হয় যে বড়-বড় পণ্ডিতগুলো তার কাছে কেঁচোর মত হয়ে যায়।'

আর, তুমি ষোলো টাং করলে তো লোককে এক টাং করতে বলবে! তুমি যদি ষোলো আনা 'ত্যাগী' না হও তবে লোককে কী করে বলবে 'গীতা'র কথা।

এইখানে একটা গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'এক রুগী এসেছিল এক কবরেজের কাছে। ওষুধ দিয়ে কবরেজ বললে, আর একদিন এসো, পথ্যের কথা বলে দেব। রুগীর বাড়ি অনেক দূর। কি আর করে, আরেক দিন এসে দেখা করল। কবরেজ বললে, খাওয়া দাওয়া সাবধানে করবে, গুড় খাবে না। রুগী চলে গেলে একজন বৈদ্য বললে, ওকে এত কষ্ট দিয়ে ফের আনা কেন? সেইদিন বললেই তো হত। কবরেজ হেসে বললে, ওর মানে আছে। সেইদিন আমার এ ঘরে অনেক-গুলি গুড়ের নাগরি ছিল। সেদিন যদি বলতাম, রুগীর বিশ্বাস হত না।

মনে করত, ওঁর ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগরি, উনি নিশ্চয় কিছু-কিছু খান। তা হলে গুড় জিনিসটা তত খারাপ নয়! আজ আমি গুড়ের নাগরি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।'

পরকে যদি প্রকাশিত দেখতে চাও নিজে উদ্ঘাটিত হও। যদি তোমার মধ্যে সত্যি-সত্যি ভাব আসে তবে তোমারও অজানতে অন্যের উপর প্রভাব পড়বে। কত কবিত্বময় ব্যঞ্জনায় রূপ দিলেন ভাবটিকে :

'চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বলতে হয় না। লোহা তার টানে আপনি ছুটে আসে। লোককে না ভজিয়ে আপনি ভজলে যথেষ্ট প্রচার হয়। যে আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করে সে যথার্থ প্রচার করে। মুক্ত হলে, শত-শত লোক কোথা হতে আপনি এসে তার কাছে শিক্ষা নেয়। ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে। একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়।'

আর যদি নিজের অভিমানে প্রচার করতে যাও, সে কেমনতরো হবে?

'দিনকতক লোকে শুনবে, আর বলবে, আহা, ধনি বেশ বলছেন। তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি।' তারপরেই উপমা : 'দুধের নিচে যতক্ষণ জ্বাল দেওয়া যায় ততক্ষণ দুধটা ফোঁস করে ফুলে ওঠে। জ্বাল টেনে নিলেই যেমন তেমনি কমে যায়।'

॥ ৪০ ॥

জ্ঞানীকে দিয়ে হবে না। প্রেমীকে দিয়ে হবে। মস্তিষ্ক দিয়ে হবে না, হবে হৃদয় দিয়ে।

আমরা এমন জিনিস চাই যা আমাদের নেই। যা সংসার আমাদের দিতে পারে না। সে হচ্ছে সুখ। ভগবান এমন জিনিস চান যা আমাদের প্রত্যেকের আছে। যা আমরা ইচ্ছে করলেই দিয়ে দিতে পারি। সে হচ্ছে ভালোবাসা।

জ্ঞান দিয়ে বোঝাতে পারব কিনা জানি না, ভালোবাসা দিয়ে পারব ভোলাতে।

হৃদয় সব চেয়ে বড় জায়গা। হৃদয়ের দিগন্ত নেই।

বললেন রামকৃষ্ণ, 'পৃথিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়,

আকাশ তার চেয়ে বড়, কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পদে স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। সাধুর হৃদয়মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ।'

তাই ভগবানকে যে হৃদয়ে এনে বসিয়েছে, মাথায় নয়, তার কথাই লোকে শোনে। যে শোনে সেও যে হৃদয়াসীন।

উপমা দিয়ে বোঝালেন রামকৃষ্ণ :

'জ্ঞানীর আমার হলেই হল। তিনি আপ্তসার। আর যারা প্রেমী তারা ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, আবার কেউ দশজনকে খাওয়ায়। ঝুড়ি কোদাল পাতকুয়ো খোঁড়বার সময় আনা হয়, কেউ কাজ হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল কুয়োতেই ফেলে দেয়, কেউ আবার পরের দরকারের জন্যে তুলে রাখে।'

জ্ঞান নির্বিচল থাকে, ভক্তি-ভালোবাসা ঢুকলে তোলপাড় হয়ে যায়।

অপূর্ব দুটি উপমা দিয়ে বোঝালেন রামকৃষ্ণ :

'জ্ঞানী যেন কামারশালার লোহা, হাতুড়ি পিটছে, তবু নির্বিকার। আর ভক্তি যেন কুঁড়েঘরে হাতি প্রবেশ করার মত। কুঁড়েঘরে হাতি প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙেচুরে দেয়। ভাবহস্তীও তেমনি। শরীরকে সুস্থ থাকতে দেয় না। বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যাবার সময় কিছু বোঝা যায় না। খানিক পরে দেখা যায়, কিনারার উপর জল ধপাস-ধপাস করছে—হয়তো কিনারার খানিকটা মাটি ভেঙেই পড়ে গেল জলে।'

এই দেহ তো তোমাকে দেখবার জন্যে। বাহুপাশে তোমাকে ধরবার জন্যে। যতদিন তুমি না আস ততদিন তোমার নামমন্ত্র গুঞ্জরণ করবার জন্যে। আমার উপাসনা অর্থ তোমার কাছে বসা। আমার উপবাস মানে তোমার কাছে থাকা। আমার উপরতি মানে তোমাকে স্পর্শ করা। কিন্তু তুমি যদি আমার মধ্যে এসে ধরা দাও তবে এ মাটির শরীর রেখে কী হবে? ভাবহস্তী এসে ঢুকলে কুঁড়েঘরকে সামলানো যাবে না।

বললেন রামকৃষ্ণ, 'আপনাকে আপনার ভেতর দেখতে পাবার জন্যেই সাধনা। আপনাকে আপনার ভেতর দেখতে পেলে তো সব হয়ে গেল। ঐ সাধনার জন্যেই শরীর। মাটির ছাঁচ ততক্ষণ দরকার যতক্ষণ না সোনার প্রতিমা ঢালাই করে নেওয়া হয়। ঢালাই কাজ হয়ে গেলে কারিকর মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙে ফেলতেও পারে।'

বলে আরেকটি অভিনব উপমা দিলেন। কত বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, কি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ!

'কবরেজ মকরধ্বজ তৈরি করবার সময় বোতলের চারদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভেতরের সোনা আগুনের ঝাঁজে অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তখন কবরেজ বোতলটি আগুন থেকে তুলে নিয়ে ভেঙে ফেলে মকরধ্বজ বার করে নেয়। তখন বোতল থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি। ভগবান লাভের পর শরীর থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি।'

কিন্তু যতদিন তোমাকে না পাই ততদিন দেহবৃক্ষমূলে বসে হাত-তালি দিয়ে পাপ-পক্ষী তাড়াতে থাকি। 'তাঁর নামগুণকীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহবৃক্ষে পাপ-পাখি—তাঁর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন গাছের উপরের পাখি সব পালায় তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণগানে চলে যায়।' ততদিন বীণা করি এই দেহকে। গভীরের যে গুঞ্জনটি মৃদু-মৃদু শুনতে পাচ্ছি তাকে সঙ্গীতে তরঙ্গায়িত করি। এই দেহকেই পুঁথি করে প্রতি রক্তবিন্দুতে শ্রীহরির মহিমা লিখি। সেই যে এক সাধু প্রকাণ্ড এক পুঁথি নিয়ে প্রত্যহ পড়ত প্রত্যেক পৃষ্ঠা, প্রথম থেকে শেষ—প্রতি পৃষ্ঠায় শুধু এক কথা, ওঁ রাম লেখা—তার মত। তেমনি রক্তের প্রতিটি রণনে তোমারই গুণঝঙ্কার।

তারপর প্রেমভরে এই দেহ যদি একদিন ছোঁও, তখন কি আর বোধ থাকবে স্পর্শের মধ্যে কোনটি আমার আর কোনটি তোমার দেহ! নুনের পুতুল হয়ে গলে যাব সমুদ্রের মধ্যে।

চার বন্ধুর গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'চার বন্ধু বেড়াতে-বেড়াতে পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উঁচু পাঁচিল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্যে সকলে বড় উৎসুক হল। পাঁচিল বেয়ে উঠল একজন। উঁকি মেরে যা দেখল তাতে অবাক হয়ে হাহাহাহা বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোনো খবর দিল না। যেই ওঠে সেই হাহাহাহা করে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দেবে!'

একেই বলে মনের নাশ হওয়া। মনের লয় হলেই ব্রহ্ম। দেহকে শাসন করা যায় কিন্তু মন দুঃশাসন। সময় বা স্থানের ব্যবধান মানে না, সমুদ্র-পর্বত কিছুই তার বাধা নয়, তাকে বশে আনা সুদুষ্কর। শুধু আসে আর যায়, দিনেরাতে নানা রূপ ধরে। কখনো সিংহ কখনো কীট। মনের এই যাওয়া-আসা বন্ধ করার জন্যই সাধন।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'মন কতক দিল্লি কতক ঢাকা কতক কুচবিহারে

ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মনকে কুড়িয়ে এক জায়গায় করে পরমাত্মাতে স্থির করতে হবে। ষোলো আনা মন তাঁকে দিলে তবে তাঁকে পাবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার উপায় নেই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে তা হলে আর খবর পেঁছুবে না।'

শুধু একটু ফুটো? হায়, টেলিগ্রাফের তারই এখনো খাটানো হয়নি। বেতারে যে খবর নেব এ জীবন নয় সেই নিখুঁত বেতারযন্ত্র। জীবনের জল কেবল হেলছে-দুলছে, তোমার স্থির প্রতিবিম্বটি আর দেখতে পাই না।

তাই তো বাসনাগুলো একে-একে ভোগ করে নিয়ে ছুঁড়ে দাও বাসন। পান হয়ে গিয়েছে কি হবে আর পীত-পাত্রে? বাসনা কি, কত তো দেখলাম। এখন নির্বাসনা কি একবার দেখি।

ভোগ করতে-করতে ভোগ ছাড়তে-ছাড়তেই আমার যোগ হবে। কী অপূর্ব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'বাসনাগুলো ভোগ হয়ে গেলেই আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে। আবার সেই যোগের অবস্থা। সটকা কল জানো? বাঁশ নুইয়ে তাতে সুতো বেঁধে বঁড়শি লাগিয়ে রাখে। আর সেই বঁড়শিতে টোপ গাঁথে। মাছ যেই সেই টোপ খায়, বাঁশটাও অমনি সড়াৎ করে আগের মত উঁচু হয়ে উঠে পড়ে। মাছ ধরে সেই সটকা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা, তবে নোয়ানো হয়েছে কেন? মাছ ধরবে বলে। বাসনা হচ্ছে মাছ। তাই মন নোয়ানো হয়েছে সংসারে। বাসনা না থাকলে মনের সহজেই ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয় ঈশ্বরের দিকে।'

বাসনা যখন শান্ত হয়ে আসে, জল যখন স্থির হয়, স্বচ্ছ বা সরল হয়, ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে।

সেই স্থির হওয়া শান্ত হওয়ার জন্যেই যোগ।

সেই স্থির হওয়াটিকেই বোঝাচ্ছেন নানা উপমা দিয়ে।

'দীপশিখা দেখনি? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল। সংসারহাওয়া মন-রূপ দীপকে চঞ্চল করছে। যোগাবস্থা দীপশিখার মত, সেখানে হাওয়া নেই তাই কম্পনও নেই।'

তারপর কটি ঘরোয়া ছবি, নিপুণ শিল্পীর রচনা :

'মেয়েদের ভেতর যদি কেউ অবাক হয়ে কোনো কিছু দেখে বা শোনে, তখন অন্য মেয়েরা তাকে বলে, কি লো তোর ভাব লেগেছে নাকি? বায়ু স্থির হওয়াতেই সে অমনি অবাক হয়ে হাঁ করে থাকে।

তেমনি বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার সময় মানুষ বাক্যশূন্য হয়। তার বায়ু স্থির হয়ে যায়।

একজন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, এমন সময় খবর পেলে যে অমুক লোকটা মারা গেছে। সে লোকটা যদি আপনার কেউ না হয় তা হলে সে ঝাঁটও দিচ্ছে আবার মুখে বলছে, আহা, খুব ভালো লোক ছিল! আর যদি সে লোকটা আপনার কেউ হয় তাহলে খবর শোনামাত্র তার হাত থেকে ঝাঁটা পড়ে যায়, আর সে এ্যাঁ বলে বসে পড়ে। মুখে আর কোনো কথা নেই। তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে। কোনো কাজ বা চিন্তা করতে পারে না।'

তেমনি তুমি আমাকে স্থির করে দাও। যাতে বুঝতে পারি তুমি নিরন্তর হয়ে আছ, নিরন্তরাল হয়ে। তৈলধারার মত আমার ধ্যান। অমৃতধারার মত তোমার আবির্ভাব।

আমার যুক্ত হয়ে মুক্ত হওয়া। তাই তো আমি ভক্ত। ফুলের মুক্তি ফলে। আর ফলের মুক্তি? ফলের মুক্তি তখনি যখন সে রসে আর বর্ণে নিটোল হয়েছে, যখন ভরপুর হয়েছে গন্ধে আর মধুরতায়। সব মিলে ফলের যেটি প্রকাশ, সেটি আনন্দের প্রকাশ।

আমিও তোমাকে, সেই আনন্দময়কেই, প্রকাশ করব।

॥ ৪১ ॥

কিন্তু যোগ করবে কি সিদ্ধাই দেখাবার জন্যে? ব্যায়াম বা ম্যাজিক দেখিয়ে অর্থোপার্জনের জন্যে? হায়, শুধু অষ্ট সিদ্ধি নিয়ে করবে কি, সর্বসিদ্ধির জন্যে যোগ।

একটি বিস্ময়কর গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ :

'দুই ভাই। বড় ভাই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে। ছোটটি লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে বিয়ে-থা করে সংসার করছে। সন্ন্যাসীদের রীতি আছে, বারো বছর অন্তে ইচ্ছে করলে একবার দেশে ফিরতে পারে। তাই বারো বছর পর বড় ভাই বাড়ি এসেছে। দাদাকে দেখে ছোট ভাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। আহারান্তে কথাপ্রসঙ্গে ছোট ভাই বড় ভাইকে প্রশ্ন করলে, দাদা, এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি জ্ঞান লাভ করলে আমাকে বলো। দাদা বললে, দেখবি? তবে আয় আমার সঙ্গে।

ছোট ভাইকে নিয়ে গেল নদীর ধারে। মন্ত্রবলে জলের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে এপার হতে ওপার চলে গেল। আবার ফিরে এল ওপার থেকে এপারে। গর্বভরে বললে, দেখলি? অল্প একটু হাসল ছোট ভাই। বললে, দাদা, কি দেখলুম! আমি খেয়ার নৌকোর মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে ঐ নদী পারাপার হই। তা তুমি বারো বছর এত কষ্ট করে এই পেয়েছ? ও ক্ষমতার দাম তো তা হলে মোটে আধ পয়সা!'

বারো বছরের তপস্যা ছার হয়ে গেল। ভোজবাজি দেখাবার জন্যেই কি কুম্ভক-প্রাণায়াম? সংসারে আছি বহু কর্মের আহ্বানে, ও-সব ব্যায়াম করবার সময় কোথায়, স্নায়ু কোথায়? ভগবান কাজের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, সে কাজের থেকে পালালে রেহাই পাব কেন? অকর্মা হয়ে কি নৈষ্কর্ম্য পাব?

কাজ করব না তো কি! দিবারাত্রি ভগবান কত কাজ করছেন চোখের সমুখে! সূর্য আলো দিচ্ছে, বাতাস জীবন দিচ্ছে, মাটি ফসল ফলাচ্ছে। ঈশ্বরই বা এত কাজ করছেন কেন? শুধু অহেতুক ভালোবাসার অজস্রতায়। কী তাঁর প্রয়োজন ছিল এত অনন্ত অকার্পণ্যের? একেই বলে ভালোবাসা। যে আমাদের এত ভালোবাসে তার প্রতি আমাদের কোনো প্রেমের দায় নেই? আছে। সেই দায়েই আমরা কাজ করব। এই কাজের মধ্যে দান করব নিজেদের। সেবা দিয়ে উৎসর্গ দিয়ে আত্মনিবেদন দিয়ে কর্ম আমাদের প্রেমকেই প্রকাশ করবে।

তোমাকে ভালোবাসি এ শুধু মুখের কথায় বলে-বলে কি তৃপ্তি পাব? তোমার জন্যে কাজ করে যাব, দিয়ে যাব এ জীবন।

সব কিছু তুমি একা-একা সৃষ্টি করেছ। কিন্তু একটি সৃষ্টি আমাতে-তোমাতে যুক্ত হয়ে করতে হবে। সেটি আমার সংসার। একা-একা স্বর্গ তৈরি করার তোমার সাধ্য নেই। তখন ডাক পড়েছে আমাকে। কেননা স্বর্গ তো এই সংসারে। গেরুয়ার পতাকা-ওড়ানো মঠে-মন্দিরে নয়।

যে মা-বাপ নরদেহে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সে তো সংসারে। যে শিশুর স্বভাব ঈশ্বরের স্বভাব সেও সংসারেরই উপহার।

'কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালোবাসো বলো দেখি? ভাইপোকে? বেশ তো, তার জন্যে যা কিছু করবে, খাওয়ানো-পরানো সব গোপাল ভেবে কোরো। যেন গোপালরূপী ভগবান তারই ভেতর রয়েছেন, তুমি তাঁকেই খাওয়াচ্ছ-পরাচ্ছ সেবা করছ—এই রকম ভাব নিয়ে

করো। মানুষের করছি ভাববে কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।'

রামকৃষ্ণ মহত্তম গৃহী। সন্ন্যাসীর চেয়ে গৃহীকে বৃহত্তর সম্মান দিয়েছেন।

'তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা! যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে আর বাহাদুরি কি! সংসারে থেকে যে ডাকে সেই ধন্য। সে বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।'

কী শক্তিশালী উপমা! বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে। সন্ন্যাসীরা তো নির্ঝঞ্ঝাট। ছেলে মানুষ করতে হয় না, মেয়ে বিয়ে দিতে হয় না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে হয় না প্রাণান্ত। শোক নেই দারিদ্র্য নেই অপমানের ভয় নেই। গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কী সুন্দর বর্ণনা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন, অনেক ব্যাঘাত। তা তোমাদের বলতে হবে না। রোগ-শোক দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে সর্বদাই অমিল, ছেলে মূর্খ গোঁয়ার অবাধ্য। নানা গোল, ওদিকে যাবি ঝাঁটা ফেলে মারবো, এদিকে যাবি জুতো ফেলে মারবো—'

এই অবস্থায় যোগস্থ হওয়া! এ কি চারটিখানি কথা?

তার পরেই গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ :

'নারদ ভাবল তার মত ভক্ত নেই আর ত্রিসংসারে। তার মনের ভাব বুঝতে পারলেন ভগবান। বললেন, অমুক জায়গায় অমুক লোক আছে। সে আমাকে খুব ভক্তি করে। তার সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারো। তখুনি নারদ হাজির হল সেখানে—দেখি কেমন ভক্তির চেহারা! ওমা, সামান্য একটা চাষা, ভোরে ঘুম থেকে উঠে একবারমাত্র হরি-নাম উচ্চারণ করে লাঙল নিয়ে মাঠে যায় আর দিনমান চাষ করে। রাত হলে শুতে যায়, আর শোবার আগে আরেকবার হরি আওড়ায়। এই ভক্ত? সারাদিন সংসার নিয়ে ব্যস্ত, সাধু-সন্ন্যাসীর ধরনধারণ কিছুই নেই কোথাও। এ আবার কেমন ধারা ভক্ত? ভগবানের কাছে ফিরে গেল নারদ। চাষার সম্বন্ধে উপহাস করলে। ভগবান তখন নারদের হাতে একবাটি তেল দিলেন। বললেন, এই তেলের বাটিটা হাতে করে আমার বাড়ির চার-দিকে ঘুরে এস। দেখো, সাবধান, এক ফোঁটা তেলও যেন না পড়ে। তথাস্তু। তেলের বাটি হাতে করে নারদ ঘুরে এল। ভগবান জিগগেস

করলেন, বাটি নিয়ে ঘোরবার সময় কবার আমার নাম করেছিলে? একবারও না। বললে নারদ। কি করে করি? কানায়-কানায় ভরতি তেলের বাটির দিকে তাকাব না আপনার নাম করব? তবেই দেখতে পাচ্ছ, বললেন ভগবান, তুমি হেন যে নারদ, তোমাকে এই এক সামান্য তেলের বাটি ঈশ্বরবিস্মৃত করে দিয়েছে। আর গরিব ওই চাষা, কত বড় সংসার কত বড় তেলের বাটি বহন করছে মাথায় করে। তবু অন্তত দুবার আমার নাম করে প্রত্যহ।'

সন্ন্যাসী তো আছে প্রত্যয়ের শান্তিতে। সংসারী সংশয়ের ঘা খাচ্ছে আবার বিশ্বাসে এসে নিশ্বাস ফেলছে। যে নিরাশ্রয় করছে তাকেই আবার ধরছে আশ্রয়স্বরূপ বলে। যাকে দেখে ভয় পাবার কথা তাকেই দেখতে চাচ্ছে মধুর বলে।

এই সংসারী লোকের ব্রত কি? ব্রত সহিষ্ণুতা।

একটি অপূর্ব মন্ত্রের মত করে বললেন রামকৃষ্ণ : 'স, স, স।'

'বর্ণের মধ্যে তিনটে স কেন? শ ষ স। শুধু এই কথা বলবার জন্যে,—তিন সত্য বলার মত করে—স স স। সহ্য কর সহ্য কর সহ্য কর। যার সহ্য করবার শক্তি নেই কোনো সাধনাই তার সফল হবার নয়।'

বলে ছন্দ দুলিয়ে দিলেন :

'যে সয় সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়।'

শ ষ স—তার পরে কী? তার পরে হ। যে সহ্য করে সেই হয়, মানুষ হয়। যে মানুষ দেবতার চেয়েও বড়।

সেই সহিষ্ণুতা, সেই তন্ময়তাই তো ধ্যান।

গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'একজন পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। তার ফাতনা তখন নড়ছে, সে তখন টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় পথ-চলতি কে এক লোক তার কাছে এসে জিগগেস করলে, মশাই, বাঁড়ুয্যেদের বাড়িটা কোন দিকে বলে দিতে পারেন? কোনো উত্তর নেই। ও মশাই, শুনছেন? বলুন না। তবুও মাছ-ধরা লোকের হুঁস নেই। হাত কাঁপছে, শুধু ফাতনার দিকে দৃষ্টি। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে—মাছটাকে টান মেরে ডাঙায় তুললে। ও মশাই শুনুন-শুনুন—চীৎকার করে পথিককে ডাকতে লাগল। অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল পথিক। কেন, আবার ডাকাডাকি কেন? তখন মাছ-ধরা লোক জিগগেস করলে, তখন

আপনি আমাকে কী বলছিলেন? পথিক তো চটে আগুন! তখন অতবার করে জিগগেস করলুম—আর এখন বলছেন, কী বলছিলেন? মাছ-ধরা লোকে বললে, ভাই, তখন যে ফাতনা ডুবছিল।'

॥ ৪২ ॥

চাই এই নিবিড় একাগ্রতা, উদ্দাম আগ্রহ।

ধ্যানে বসা, মানে, রামকৃষ্ণের ভাষায়, 'যেন বার বাড়িতে কপাট পড়ল!'

'আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা—'

সংসারে থাকতে গেলে কখনো উঁচু কখনো নিচু। কখনো ঈশ্বর-চিন্তা হরিনাম করে, কখনো বা কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। 'যেমন সাধারণ মাছি,' উপমা বুনলেন রামকৃষ্ণ : 'কখনো সন্দেশে বসছে, কখনো বা পচা ঘায়ে।'

কিন্তু ভক্তি যদি আসে তখন উন্মাদ।

এই উন্মাদ ভক্তির অপরূপ বর্ণনা দিলেন, 'যখন ভক্তি উন্মাদ হয়, তখন বেদবিধি মানে না। দুর্বা তোলে তো বাছে না। যা হাতে আসে তাই লয়। তুলসী তোলে, পড়-পড় করে ডাল ভাঙে। ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় এক বাঁশ জল—'

তারপর, 'মিছরির পানা পেলে চিটেগুড়ের পানা কে চায়!'

কিন্তু সংসার কি থাকতে দেয় স্ববশে? 'পাখি এই হয় তো একটু দাঁড়ে বসে রাম নাম করছে, বনে উড়ে গেলেই আবার ক্যাঁ-ক্যাঁ শুরু করবে।' এই আছে হয়তো একটু ভালো মনে আবার পরক্ষণেই হয়তো 'কাজলের ঘরের' কালি লাগিয়ে বসল। সদসৎ বিচার করবে কজন? কোথায় সেই জ্ঞানী সংসারী!

জ্ঞানী সংসারীর সুন্দর বর্ণনা দিলেন রামকৃষ্ণ। 'কি রকম জানো? যেন সারসির ঘরে কেউ আছে। ভিতর-বার দুইই দেখতে পায়।'

মায়ার ভেলকিতে ভোলে না এমন জ্ঞানী সংসারী দু-একজন। জোর-দার ভাষায় গ্রাম্য উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'আঁতুড় ঘরের ধুলহাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে তার বাজিকরের ড্যাম-ড্যাম শব্দের ভেল্কি লাগে না। বাজিকর কী করছে সে ঠিক দেখতে পায়।'

কিন্তু আসল কথা কি, বিষয়চিন্তাই সংসারীযোগীকে যোগভ্রষ্ট করে। অভিনব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ :

'ও দেশে দেয়ালে গর্তের ভেতর নেউলগুলো বেশ আরামে থাকে। কেউ-কেউ ল্যাজে ইঁট বেঁধে দেয়, তখন ইঁটের ভারে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গর্তের ভেতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে, ততবারই ইঁটের ভারে এসে পড়ে বাইরে। বিষয়চিন্তা এমনি।'

এই বিকার কাটবে কি করে? শুধু ভক্তিতে। ব্যাকুলতায়। বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতায়।

নতুন কথায় গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ :

'ভক্ত বিল্বমঙ্গল রোজ বেশ্যালয়ে যায়। একদিন বাড়িতে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ, বেশ্যালয়ে যেতে অনেক রাত হয়েছে। তা হোক; রাজ্যের খাবার নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে করে। ছুটছে দিশেহারার মত। বেশ্যার উপর মন এত একাগ্র, কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে কিছু হুঁস নেই। যে পথ দিয়ে যাচ্ছে সেই পথে চোখ বুজে ধ্যান করছে এক যোগী। তার উপর দিয়ে, গায়ে পা দিয়েই চলে যাচ্ছে। যোগী রেগে উঠল। আমি ঈশ্বর চিন্তা করছি, আর তুই কিনা আমায় মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিস? কানা নাকি? তখন বিল্বমঙ্গল বললে, আমায় মাপ করবেন। কিন্তু একটা কথা জিগগেস করতে পারি কি? বেশ্যাকে চিন্তা করে আমার তো কোনো হুঁস নেই, কিন্তু আপনি ঈশ্বরচিন্তা করছেন, আপনার তো দেখছি বাইরের সব হুঁসই রয়েছে! এ কি রকম ঈশ্বরচিন্তা? বিল্বমঙ্গল শেষে বেশ্যাকে গুরু বলে ঈশ্বরলাভের জন্যে সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আর বেশ্যাকে বলেছিল, কি করে ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয় তা তুমিই আমায় শিখিয়েছ।'

দাও এই নির্বিচল সম্মুখগতি, দাও চক্ষুহীন উন্মুখতা। পথকে অপ্রতিবন্ধ করে দাও। যদি বাধা পড়ে পথে সে-বাধা অনতিক্রম্য করো না। বাধার মধ্যে যে বেদনা সে বেদনা প্রেরণার মত আমার গায়ে লাগুক। আমার উৎসাহকে নিরলস করো। যে ছিল দুর্বল সে আজ তোমার স্পর্শে দুর্জয় হয়ে উঠুক। যাকে এতদিন প্রলুব্ধ করেছ তাকে এবার প্রবুদ্ধ করো। আমার যাত্রা ভূমা পর্যন্ত, তাই আমার পথও অপরিসীম। আমার পথ-চলাতেই আনন্দ। তুমি তো শুধু ইতিতে নও, গতিতেও। শুধু তো প্রাপ্তিতে নও, পথেও। তুমি যে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছ

এই জন্যেই তো পথ আমার বাঁশি। রথের রথী হও তুমি, আমি পথের পন্থী হব।

গণিকাকে মা বলেছিল বিল্বমঙ্গল। যাকে দেখেছিল ভোগবতীরূপে তাকেই আবার দেখল ভগবতীরূপে।

অবধূতের কাছে পিঙ্গলাও গুরু।

জনকের রাজত্বের বেশ্যা এই পিঙ্গলা। লোকের আশায় সারা-রাত ঘর-বার করছে। কেউই নেই, কেউই আসবে না। হতাশ হয়ে ঘুমুতে গেল শেষ রাত্রে। নিকটেই অবধূত ছিলেন, বলে উঠলেন পিঙ্গলাকে উদ্দেশ করে, তুমি সমস্ত আশা ত্যাগ করে সুখে নিদ্রিত হয়েছ, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার গুরু।

দাও আমাকে এই আশারাহিত্য। তোমার যদি আসা নেই, আমারও আশা নেই। আমার তো উত্তরণ নয়, আমার যাত্রা। আমার তো পৌঁছুনো নয়, আমার শুধু চলা।

তেমনি গুরু কুমারী। গুরু কুমারীর কঙ্কণ। কুমারীর কাছ থেকে শিখবে সঙ্গরাহিত্য। তার কঙ্কণের কাছ থেকে একচারিতা।

এক কুমারীর হাতে কয়েক গাছি কঙ্কণ। ধান কুটছে কুমারী আর কঙ্কণের শব্দ হচ্ছে। বাইরের লোক শুনতে পাচ্ছে সে কঙ্কণের আওয়াজ। উন্মনা হয়ে উসখুস করছে। বুঝতে পেরেছে কুমারী। হাতে দু-দুগাছি করে রেখে বাকি চুড়ি খুলে ফেলল। তবুও মৃদু-মৃদু শব্দ হচ্ছে। শেষে এক গাছি করে রেখে বাকি গাছিও খুলে ফেলল। তখন আর শব্দ নেই। পথিকও নেই বাইরে।

এই কুমারীর হাতের একক কঙ্কণ হও। একা-একা থাকো।

পুরুষসিংহ হও।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'সিংহ একলা থাকতে একলা বেড়াতে ভালোবাসে।'

অবধূতের চব্বিশ গুরু। তার মধ্যে এক হচ্ছে চিল। বাসনাত্যাগের গুরু। চিলের মুখে যতক্ষণ মাছ থাকে ততক্ষণ অন্য পাখিরা তাকে তাড়া করে। যেই মাছ ফেলে দেয় অমনি নিশ্চিন্ত। কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ : 'এখন মাছ কাছে নেই, নিশ্চিন্ত হলুম।'

'অবধূতের আরেক গুরু মৌমাছি। মৌমাছি সঞ্চয় করে ভোগ করে না। আর একজন এসে তার চাক ভেঙে নিয়ে যায়।'

মধুকরের কাছ থেকে শেখ এই মাধুকরী। সঞ্চয়েই সন্ন্যাসীর নাশ।

'কিন্তু সংসারীর পক্ষে নয়।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'পাখির ছানা হলে সঞ্চয় করে। ছানার জন্যে মুখে করে খাবার আনে। কিন্তু বড় হলে ঠোঁটের খোঁচা মেরে তাড়িয়ে দেয় বাসা থেকে। নিজে-নিজে উড়ে-উড়ে খা গে।'

কিন্তু প্রথমা গুরু হচ্ছে পৃথিবী। সে শেখায় ক্ষমা। সহিষ্ণুতা।

'গুরু সকলেই হতে চায়, শিষ্য হতে কে চায়?'

সেই এক গল্প আছে, গুরুর কাছে একজন চেলা হতে গিয়েছিল। বললে, আমাকে চেলা বানিয়ে নাও। তুমি কি পারবে চেলা হতে? চেলা হতে হলে জল তুলতে হয়, কাঠ কাটতে হয়, সেবা করতে হয়—এসব কি তুমি পারবে? আজ্ঞে গুরুর কী করতে হয়? গুরুর আর কী করতে হবে? তিনি বসে থাকেন, কখনো-সখনো একটু-আধটু উপদেশ দেন, এই আর কি। বেশতো, লোকটা তখন বললে, চেলা বনা যদি কষ্ট হয়, আমাকে গুরু করে নিন না।

'যে লোক শিক্ষা দেবে তার চাপরাশ চাই।' বলেই একটা সুন্দর উপমা দিলেন : 'অপরকে বধ করবার জন্যে ঢাল-তরোয়াল চাই। আপনাকে বধ করবার জন্যে একটি ছুঁচ বা নরুন হলেই যথেষ্ট।'

একটি নাম বা একটি স্বপ্ন নিয়ে নিজে বিভোর থাকতে পারি কিন্তু অন্যকে দলে টানতে গেলে অনেক বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার। বাক্য দিয়ে যাঁকে প্রকাশ করা যায় না, বাক্যই আবার তাঁর বিভূতি। অকথনীয়ের সীমা নেই, কিন্তু কথারই বা কি শেষ আছে? আর কথা ছাড়াই বা অকথনীয়ের আভাস আনি কি করে?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'গুরু যেন সেখো।'

নমস্যকে নিয়ে এলেন একেবারে বয়স্য করে। বললেন, 'যেন হাত ধরে নিয়ে যায়। ভগবান দর্শন হলে আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকে না। তাই গুরু জনক শিষ্য শুকদেবকে বললেন, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও আগে দক্ষিণা দাও। কেননা ব্রহ্মজ্ঞান একবার হয়ে গেলে গুরু-শিষ্য ভেদ-বুদ্ধি থাকবে না।'

মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে, জগদগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।

কানের মন্ত্র অনেক শুনেছি। এখন প্রাণের মন্ত্র দাও।

গভীর মাটির নিচে প্রসুপ্ত আছে জলধারা। মন্ত্র হবে সেই মাটির মধ্যে ছিদ্র, যে-ছিদ্র দিয়ে উদ্রিক্ত হবে প্রস্রবণ।

॥ ৪৩ ॥

'গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না। নদীরই হিল্লোল, হিল্লোলের কি নদী?'

আবার এই কথাটাই বললেন অন্য বিন্যাসে : 'ভগবান আমাদের হাতে পড়েননি, আমরাই ওঁর হাতে পড়েছি।'

সমস্তই তাঁর, সমস্তই তিনি। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

এই কথাটাই বোঝালেন আবার অন্য উপমায়। শক্তিশালী উপমা : 'সেই কামার, সেই বলি, সেই হাড়িকাঠ।'

এবার সর্বভূতে নারায়ণের গল্পটি শোনো। মাহুত-নারায়ণের গল্প।

'গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিলেন, সর্বভূতে নারায়ণ। শিষ্যও তাই বুঝলে। একদিন পথের মধ্যে এক হাতির সঙ্গে দেখা। উপর থেকে মাহুত বললে, সরে যাও। শিষ্য ভাবলে, সরব কেন? সবই তো নারায়ণ। সে সরল না, হাতি শুঁড়ে করে তাকে দূরে ফেলে দিলে ছুঁড়ে। হাড়গোড় সব ভেঙে গেল শিষ্যের। সুস্থ হয়ে এল সে গুরুর কাছে, সমস্ত জানালে আদ্যোপান্ত। গুরু বললেন, ভালো বলেছ! তুমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, কিন্তু মাহুত কি? সে নারায়ণ নয়? হাতি যে চালাচ্ছিল সেই মাহুতরূপী নারায়ণ তোমাকে সাবধান হতে বলেছিলেন। বলো, বলেছিলেন কিনা? তুমি মাহুত-নারায়ণের কথা শুনলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।'

সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। বিবেক এই মাহুতরূপী নারায়ণ। বিবেকের কথাই যে শুনতে হবে, আর কোনো কথা নয়—এ কথা বোঝাবার জন্যে এমন সারালো গল্প বাংলা ভাষায় আর দুটি নেই। এই বিবেক-মাহুতের হাতেই ডাঙশ। তাই আবার উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'হাতি পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে ডাঙশ মারে।'

সুখের রাজপথ দিয়ে গজেন্দ্রগমনে চলে যাব এ আকাঙ্ক্ষা আমার নয়। তুমি ডাঙশ মারো। তুমি দুঃখ দাও। দৈন্যে-দুর্দিনে ফেলে রাখো। মুখের কাছে পূর্ণ পাত্র তুলে নিমেষে শূন্যমাত্র করে ফেল। ঘাটে এনে ভরাডুবি করো। কেনই বা না-করবে? আমরা তো নিষ্কণ্টক সুখের পথে

যাত্রা করিনি। আমরা যাত্রা করেছি মঙ্গলের পথে। আমাদের তো দেবতা বানাতে চাওনি, মানুষ বানাতে চেয়েছ। তাই আমরা চলেছি ধৈর্যের পথে, বীর্যের পথে, মাধুর্যের পথে। যে মাধুর্য অশ্রুজল দিয়ে তৈরি। দেবতারা কি কাঁদে?

ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব কেমন সহজ কথায় বোঝালেন রামকৃষ্ণ :

'শাস্ত্রে আছে জল নারায়ণ। কিন্তু সকল জল কি খাওয়া যায়? কোনো জল ঠাকুর সেবায় চলে, আবার কোনো জলে পা ধোয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা চলে। কিন্তু মুখ ধোয়া, খাওয়া, ঠাকুর পুজো চলে না। তেমনি সর্বত্র ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু কোনো-কোনো জায়গায় যাওয়া যায়, আবার কোনো জায়গায় দূর থেকে গড় করে পালাতে হয়।'

দূর থেকে গড় করে পালাতে হয়—এইটিই হচ্ছে রামকৃষ্ণের ভাষার তুলিতে ছবি আঁকা।

ঈশ্বর যে আবার বুদ্ধিরূপে বিরাজমান। তাই সদসৎ নিত্যানিত্য বিচার দরকার। তা না হলে মানুষ কেন?

এই বিচারের জন্যে বিবেককে ডাকো। জাগাও তোমার সেই অঙ্কুশ-ধারী মাহুতকে। গজকুম্ভে আঘাত নাও, নইলে গজমুক্তা পাবে কি করে?

সোনার সঙ্গে যেমন সোহাগ, তেমনি বিবেকের সঙ্গে একটু বৈরাগ্য মেশাও। বিচারের সঙ্গে একটু অনাসক্তি।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'বিবেকবৈরাগ্য নির্মলি। সংসারী জীবের মন ঘোলা হয়ে আছে বটে, কিন্তু তাতে নির্মলি দিলে আবার পরিষ্কার হতে পারে।'

বিবেকের আর এক নাম জল-ছাঁকা। বললেন, 'জল-ছাঁকা দিয়ে ছেঁকে নিলে ময়লাটা একদিকে পড়ে, ভালো জল আরেক দিকে। বিবেক-রূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমার তাঁকে জেনে সংসার করো। সেই হবে বিদ্যার সংসার।'

কিন্তু কী সংসারই পেতেছি আমরা! রামকৃষ্ণের কথায়, 'সব দেখছি কলায়ের ডালের খদ্দের।'

আবার বললেন, 'বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার জো নেই।'

বাগান বাঁচাবার জন্যে বেড়া দিয়েছিলাম এখন বেড়াই বাগান খাচ্ছে। মাঠের চারধারে আল বেঁধেছিলাম, আলের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জল।

শোনো রামকৃষ্ণের গল্প :

'একজন তার খেতে জল ছেঁচছে। সমস্ত দিন জল ছেঁচে সন্ধ্যার সময় মনে করলে, একবার দেখি কতটা জমি ভিজল। এসে দেখে একটা আলের মধ্যে একটা গর্ত দিয়ে বেরিয়ে গেছে সব জল। এক ছটাক জমিও ভেজেনি।'

এই গর্তই হচ্ছে বিষয়বুদ্ধির গর্ত। বিষয়েই বিষিয়ে গেল সব মানসবারি। 'বিনা স্বাতীকি জল সব ধূর'। এই হল চাতকের কান্না। স্বাতী-নক্ষত্রের জল ছাড়া সব ধূলো। ঈশ্বরের কৃপা-বারি ছাড়া নিষ্ফল জীবনের মাঠ-ঘাট। কোথায় বা পাব ফসল কোথায় বা মিটবে পিপাসা।

'জয়পুরের গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম-প্রথম বিয়ে করেনি। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা ডেকে পাঠালেন তো গেল না। বললে, রাজাকে আসতে বলো। তারপর, রাজা আর পাঁচজনে ধরে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে হুড়োহুড়ি। আর ডাকতে হয় না কাউকে। নিজে-নিজেই উপস্থিত। মহারাজ, আশীর্বাদ করতে এসেছি, নির্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন। কাজে-কাজেই আসতে হয়, আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ ছেলের হাতে খড়ি—এই সব।'

কাম-কাঞ্চনেই যদি ডুবে থাকব তবে তোমাকে দেখব কখন। তুমি যে বাসনার মধ্যে সোনা। তুমি রাম-কাঞ্চন।

'কামিনী-কাঞ্চনের সংশ্রবে থাকলে কোনো কালেও তাদের ঈশ্বর-লাভ হবে না।' বলেই সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'যেমন খই ভাজবার সময় যে খইটি খোলার উপর থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ে তাতে কোনো দাগ লাগে না। কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোনো না কোনো জায়গায় কালো দাগ লাগবেই।'

কাজলের ঘরে থেকে কালি লাগার কথা বলেছেন আগে, কিন্তু সে-সঙ্গে এও বললেন, 'ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না।'

পাপ স্পর্শ করতে পারে না আত্মাকে। শরীরে রোগ হয়, বলি আমার অসুখ। আসলে অসুখ আমার নয়, অসুখ শরীরের।

তাই রামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরের বাগানে ব্যাধির কঠোর কবলে কষ্ট পাচ্ছেন তখন তিনি বলে উঠলেন, শুধু সাধকের উক্তিতে নয়, সুধাস্যন্দী কবির কবিতায় : 'দুঃখ জানে শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।'

আমার মনের আনন্দ কে হরণ করে? বাইরে আমি নিষ্কিঞ্চন, কিন্তু অন্তরে আমি রাজ্যেশ্বর। বাইরে আমি আঘাতে জর্জর কিন্তু অন্তরে আমার অগাধ শান্তি। যা কিছু বোঝাপড়া দুঃখ আর শরীরের মধ্যে, মন তুমি অসম্পৃক্ত। মন, তুমি অনাবিল। মন, তুমি অনাময়!

'বালিশ ও তার খোল—দেহী আর দেহ।' আবার বললেন অন্য ভাবে, 'দেহটি আবরণ, লণ্ঠনের মধ্যে আলো জ্বলছে।'

দেহ থাকতে কর্মত্যাগের উপায় নেই। রামকৃষ্ণের উপমায় : 'পাঁক থাকতে ভুড়ভুড়ি হবেই।'

দেহকে কষ্ট দিও না। তোমার বীণাযন্ত্রটিকে যত্ন করে বাঁচাও। ধুলো থেকে তুলে রাখো। যখন যাবার যাবে, কিন্তু যতক্ষণ বাজাবার, ততক্ষণ বাজাতে হবে তো।

কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ : 'তবে দেহের যত্ন করি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করব, তার জন্যে।'

আমার তনুমালা নামমালা হয়ে উঠুক। যতদিন তা না হয়, ততদিন বসে-বসে মন-মালা ফেরাই।

॥ ৪৪ ॥

কামিনীকে ত্যাগ করো, দামিনীকে নয়। ভোগিনীকে ত্যাগ করো, যোগিনীকে নয়। তামসীর মধ্যে তাপসীকে উদ্বুদ্ধ করো। লোভিনীর মাঝে প্রতিষ্ঠিত করো শোভিনীকে।

বিদ্যার সংসারে বিদ্যমান থাকো। যে স্ত্রী বৃহতের দিকে নিয়ে যায়, মহতের দিকে নিয়ে যায়, সেই বিদ্যা। সে জগদ্ভাসিনী জগদ্ধাত্রী। তাকেই অভিষেক করো প্রত্যেক নারীদেহে। রমণীর মধ্যে জননীকে দেখ।

রামকৃষ্ণের স্ত্রী সারদামণি যখন জিগগেস করলেন রামকৃষ্ণকে, আমি তোমার কে, তখন কী অপরূপ বললেন রামকৃষ্ণ!

বললেন, তুমি আমার আনন্দময়ী!

একেবারে কবির মত বললেন।

অনেক গদ্যময় সংকীর্ণ সংজ্ঞা দিতে পারতেন, কিন্তু দিলেন একটি বিশ্বব্যাপিনী অভিধা। তুমি আমার আনন্দময়ী। জীবনে আনন্দের

নীহারকণাই হোক বা নির্ঝরিণীই হোক, তুমিই তার দিব্য প্রতিমা। তুমিই তার ব্যাখ্যাস্বরূপা সরস্বতী। অমিতা, অপরাজিতা। সর্বমন্ত্রময়ী দীপ্ত চেতনা।

আবার রমণী, রতির মা-র বেশেও দেখা দিলেন মহামায়া। তেমনি মেথর রসিকের মধ্যে দেখলেন সচ্চিদানন্দকে।

বলছেন রামকৃষ্ণ, 'ধ্যান করছিলাম। ধ্যান করতে-করতে মন চলে গেল রসকের বাড়ি। রসকে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা, ঐখানে থাক। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোলমাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষটচক্র।'

কবি চণ্ডীদাস মানুষকে সবার উপরে সত্য বলেছেন। কবি রামকৃষ্ণও তাই বললেন বটে, কিন্তু অনেক চমকপ্রদ ব্যঞ্জনায় :

'প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর মানুষে হবে না? শালগ্রাম হতেও বড়ো মানুষ। নরনারায়ণ।'

ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু ঝাড়ুদার নয়।

তাই জনে-জনে প্রত্যেককে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরের শিরোপা দিলেন। যে পতিত-ব্যথিত, অধম-অধন তাকেও।

বললেন, এমন কথা কোথাও আর কেউ বলেছে কিনা জানি না, 'সাধু-রূপ নারায়ণ, ডাকাতরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চারূপ নারায়ণ—'

ডাকাতিটাই তার দেখছ প্রকটরূপে, দেখছ না হয়তো সে কত পরোপকারী, কত মাতৃভক্ত। ছলনাটাই দেখছ, দেখছ না হয়তো তার কত সত্যরূপ। বিচ্যুতিটাই দেখছ, দেখছ না কত সংগ্রামে কত বার তার কঠিন চিত্তদমন!

সুতরাং, যখন কিছুই জানো না, প্রণাম করো। অসহিষ্ণু হোয়ো না। মরুপ্রান্তরেই মিলবে নির্জন নীরধারা।

শুধু কামিনীই নয়, আছে আবার টাকার টঙ্কার। কিন্তু কত তুমি জাঁক করবে? তোমার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও আরেকজনের প্রাপ্তি বড়। তোমার নাগালের চেয়েও আরেকজনের গ্রাস বড়। ভেবো না তুমিই এক মস্ত ধনী। মস্ত জ্ঞানী। মস্ত সাধু। তোমার চেয়েও ঢের-ঢের বড় লোক আছে, জ্ঞানী-গুণী আছে, ভক্ত-সন্ত আছে। কবির ভাষায় সুন্দর বর্ণনা করলেন রামকৃষ্ণ :

'সন্ধ্যার পর জোনাকিরা মনে করে, আমা হতেই জগৎ আলো পাচ্ছে। তারপর যাই তারা ফুটল জোনাকিরা ম্লান হয়ে গেল। তখন তারাগুলো ভাবলে, আমরাই জগৎকে আলো দিচ্ছি। তারপর চাঁদ উঠল আকাশে। নিমেষে তারাগুলো ম্লান হয়ে গেল লজ্জায়। চাঁদ মনে করল আমারই জয়-জয়কার, আমার আলোয় জগৎ হাসছে। দেখতে-দেখতে অরুণোদয় হল। সূর্য উঠলে কোথায় বা চাঁদ, কোথায় বা কি!'

এবার এক গল্প শোনো রামকৃষ্ণের :

'এক ফকির বনে কুটির করে থাকে, বড় ইচ্ছে অতিথিসৎকার করে। তখন আকবর শা দিল্লির বাদশা। ফকির ভাবলে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন করে অতিথিসৎকার করি। তাই একবার যাই আকবর শা'র কাছে। বাদশার কাছে সাধু-ফকিরের অবারিত দ্বার। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসল। দেখলে আকবর শা নমাজের শেষে বলছে, হে আল্লা, ধন দাও, দৌলৎ দাও, আরও কত কি! এই শুনে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করল ফকির। আকবর শা ইশারা করে বসতে বললেন। নমাজ শেষ হলে বাদশা জিগগেস করলেন, আপনি এসে বসলেন, আবার চলে যাচ্ছেন কেন? ফকির বললে, সে আর মহা-রাজের শুনে কাজ নেই। আমি চললুম। বাদশা অনেক জিদ করাতে ফকির বললে, আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই কিছু টাকা প্রার্থনা করতে এসেছিলাম আপনার কাছে। তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন? জিগগেস করল আকবর শা। ফকির বললে, যখন দেখলুম আপনিও ধন দৌলতের ভিখারি, তখন মনে করলুম ভিখিরির কাছে চেয়ে আর কী হবে? চাইতে হয় তো আল্লার কাছেই চাইব।'

চাইতে হয় তো তোমার কাছেই চাইব। কিন্তু তোমার কাছে চাইতে বসে কি তুমি-ছাড়া আর কিছুতে মন উঠবে? কাঞ্চনের খনির কাছে কেন আমি কাঁচ কামনা করব? যদি ভালোবাসতেই হয় তুমি ছাড়া আর আমার ভালোবাসবার কে আছে? রাজার বেটা হয়ে কোটাল-কোটাল খেলব না।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'এক রাজার চার বেটা। কিন্তু খেলা করছে, কেউ মন্ত্রী কেউ পাত্র কেউ মিত্র কেউ কোটাল। রাজার বেটা হয়ে কোটাল-কোটাল খেলছে।'

আমরা অমৃতের সন্তান হয়ে কেন অনৃত নিয়ে খেলব? হৃদয়ে যদি সুবাস আসে ভালোবাসার, সে খবর পাঠিয়ে দেব বাতাসে। সে

সুঘ্রাণ যদি একবার টের পাও তুমি, থাকতে পারবে কি স্থির হয়ে?

কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ : 'গন্ধ পেয়ে "গম্ভীর" জল থেকে মাছ আসবে।'

তুমি আমার গম্ভীর, আমার অগাধ। তুমি গহন-নিবিড়, তুমি দুরবগাহ। কিন্তু যতই তুমি অতলস্পর্শ হও, যে মুহূর্তে আমি সরল হব সে মুহূর্তেই তুমি তরলীকৃত হয়ে যাবে। হয়ে উঠবে সুধাসরস। ফুলের মধ্যে গোপন গন্ধটির মত যে মুহূর্তে পাবে তুমি আমার হৃদয়ের প্রেমমধু, সে মুহূর্তেই তুমি অনন্ত হয়েও একান্ত হয়ে উঠবে আমার।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'অনুরাগের লক্ষণ দেখলেই ঠিক বলতে পারা যায় ঈশ্বর-দর্শনের আর দেরি নেই।'

সুন্দর একটি রেখাচিত্র আঁকলেন :

'বাবু খানসামার বাড়ি যাবেন এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ির অবস্থা দেখে ঠিক ঠাহর করা যায়। প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয়, ঝুল ঝাড়া হয়, ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। তারপর বাবু নিজেই সতরঞ্চ গুড়গুড়ি এইসব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এইসব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না বাবু এই এসে পড়লেন বলে।'

কিন্তু যদি দুঃখ আসে, অপমান আসে, অকৃতার্থতা আসে—তা হলেও কি তুমিই আসছ না?

তাই তো বলি, প্রেমকে একবার আনো। যদি প্রেম আসে, তবে কিসের বা দুঃখ কিসের বা ব্যর্থতা?

কিন্তু প্রেম হওয়া কি সহজ?

বললেন রামকৃষ্ণ, 'চামড়ার ভিতর মাংস, মাংসের ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা, তারপর আরো কত কি! সকলের ভিতর প্রেম! প্রেমে কোমল, নরম হয়ে যায়। প্রেমে কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়েছেন। প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যাই দেখতে চাইবে দড়ি ধরে টানলেই হয়। যখন ডাকবে তখন পাবে।'

এই প্রেমের কথাটিই আবার বলেছেন রসের মাধ্যমে :

'যত রস জ্বাল দেবে তত "রেফাইন" হবে। প্রথম আকের রস—তারপর গুড়—তারপর দোলো—তারপর চিনি—তারপর মিছরি, ওলা এইসব। ক্রমে-ক্রমে আরো রেফাইন হচ্ছে। কিন্তু খোলা নামবে কখন? তার মানে সাধন কবে শেষ হবে? যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে।'

খালি জ্বলো, খালি জ্বাল দাও। কেবল এগোও। মনের চোর-কুঠুরিতে গিয়ে প্রবেশ করো।

ভক্তি যার পাকা হয়ে গেছে তার ভক্তসঙ্গও আর দরকার হয় না। বরং কখনো-কখনো ভালোই লাগে না ভক্তকে।

এ ভাবটির জন্যেও রামকৃষ্ণের উপমা আছে :

'পঙ্খের কাজের উপরে চুনকাম ফেটে যায়।'

অর্থাৎ, যার অন্তরে-বাইরে ভগবান, সর্বত্র যার ব্রহ্মস্বাদ, তার আবার কী প্রয়োজন সাধুসঙ্গের, কী প্রয়োজন সাধন-ভজনের?

কিন্তু রামকৃষ্ণ কী?

কী কবিত্বময় করে বললেন কথাটি : 'আমি ভক্তের রেণুর রেণু।'

॥ ৪৫ ॥

এমন করে কে আর কবে বলেছে। আমি তোমার পথের ধুলোর ধুলো। আমি তোমার ছিন্ন মালার বাসিফুলের পাপড়ি। তোমার চকিত-চাওয়ার একটি ক্ষণিক দৃষ্টি-কণা।

রামকৃষ্ণ বললেন, তোমার আপনার কেবল একজন।

আমার একতারার সেই একটিমাত্র তার। আমার কাননের সেই একটি-মাত্র ফুল। আমার ঘরের অন্ধকারে সেই একটিমাত্র দীপ। আমার ভোরের আকাশের সেই একমাত্র শুকতারা।

শুকতারা না সুখ-তারা!

যখন আলো নিবে যায় তখন তোমাকে অন্তরে দেখি, আর যখন আলো জ্বলে তখন দেখি বাহিরে-প্রান্তরে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়।'

ধু-ধু করছে মাঠ, দিগন্তকে যেখানে ছোঁয়-ছোঁয় রেখা সেখানে ধূসর হয়ে গেছে। কোথাও একটি বৃক্ষের বাধা নেই। মানুষের সংকীর্ণবাসের প্রাচীর কোথাও উদ্ধত হয়ে দাঁড়ায়নি। অব্যাহত, অবিঘ্নিত মাঠ। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে, চারদিক দেখতে-দেখতে মনে হয়, বুকটা খুব বড় হয়ে গেছে, বড় হয়ে গেছে আলিঙ্গনের পরিসর। মনে হবে সকলকে যেন দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে পারি বুকের মধ্যে। যেন বুকে

করে রাখলেও বুকের ব্যথা হবে না কোনোদিন। যেন ছুটতে পারি দিগন্তকে ধরতে।

আর, এইটিই তো ঈশ্বরীয় ভাব!

'আমায় বেলঘোরে মতি শীলের ঝিলে গাড়ি করে নিয়ে যাবে?' শুধোলেন রামকৃষ্ণ : 'সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি খাবে। আহা! মাছগুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হবে, যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে।'

কী সুন্দর উপমা! সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে। যেন ভক্তির সমুদ্রে উঠছে কতগুলো নিশ্বাসের বুদ্বুদ!

পুকুরের মাছ হয়ে হাঁড়িতে এসে বাসা নিয়েছি। হাঁড়ি ছেড়ে কবে আবার পুকুরে যাব?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।'

তেমনি প্রতিমা দেখলে মনে হয় ভগবতী। যদি মাটির মূর্তিতে তোমাকে দেখি তবে হাড়-মাংসের মূর্তিতেই বা তোমাকে দেখব না কেন?

আর তাই তো সর্বজীবে শিবদর্শন।

তাই তো তীর্থে-মন্দিরে যাই এই উদ্দীপনাটুকুর আশায়। তাই তো সমুদ্রে যাই পাহাড়ে যাই এই বিরাটের সংগস্পর্শের আভাস পেতে। তাই তো প্রেম-পবিত্র সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে থাকি সেই অমল-কোমল অনুভূতির আস্বাদটি জাগবে বলে।

কিন্তু সংসারশৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছি। বেরুতে পারি না শিকল কেটে। কোথায় বা মন্দির, কোথায় বা তীর্থ! কতদূরে সেই নীলকান্ত সমুদ্র, কত দূরে বা শ্যামকান্ত পাহাড়। মনশ্চিত্রে নেই, সব মানচিত্রে আছে। নাই বা বেরুতে পারলুম! আমার চোখের সামনে ভোরবেলাটি তো আছে, আছে তো আমার মধ্যরাত্রির অনিদ্রা। আছে তো বাদলের বেদনার দিন, আছে তো দক্ষিণের সুদক্ষিণ হাওয়া! আছে তো শিশুর কলকণ্ঠ। আছে তো মা'র ব্যথাভরা কথাহারা স্নেহচক্ষু। এই ঘরে বসেই আমার হবে। খুব বেশি চাই, ঘরের জানলাটি খুলে দিলেই হবে!

অনুভব করব এই দেহমন ভূমানন্দে ভরে গিয়েছে!

কত সহজ করে বললেন রামকৃষ্ণ :

'একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে-যেতে দেখে, কতকগুলি বাবলা গাছ রয়েছে। দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হয়েছিল ঐ কাঠে শ্যামসুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ বাঁট হয়। অমনি শ্যামসুন্দরকে মনে পড়েছে। যখন গড়ের মাঠে বেলুন দেখতে আমায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেই দেখা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হল।'

কেন শিশিরশুভ্র ফুলটি দেখে তোমার প্রেমমুখচ্ছবি মনে পড়বে না? কেন বিহঙ্গের গান শুনে ভাবব না তোমার কণ্ঠস্বর! আমারই মনোবীণায় তোমারই বনবাণী! ফুল-পাখি না পাই, আমার আকাশের তারা ক'টি তো আছে। এমন দেশ তো কোথাও নেই যেখানে আকাশ নেই। আকাশের দূর ক'টি তারা দেখে কেন ভাবব না এ তোমারই অতন্দ্র ইশারা! আকাশ যদি বা মেঘে মুছে যায়, আমার রুদ্ধ কক্ষের অন্ধকারটি তো আছে! আছে তো আমার রুদ্ধ বক্ষের শূন্যতা! তোমার উদ্দীপনা পেতে কোথায় আমাকে যেতে হবে, কোন উদ্দেশে। আমার ঘরেই তো তোমার আনাগোনা। আমার দিন-রাত্রেই তো তোমার হাসি-অশ্রুর টানা-পোড়েন।

আমি যদি তোমাকে ভুলে থাকি, তাতে তোমার ভয় নেই। কেননা তুমি অপেক্ষা করতে জানো, তোমার প্রেম অফুরন্ত, ক্ষমা অফুরন্ত। তুমি যদি আমাকে ভুলে থাকো, তাতে আমারও ভয় নেই। কেননা আমি জানি তুমি নিমেষের তরেও ভুলতে পারো না আমাকে। আমি বন্ধ কুঁড়ি খুলি আর না খুলি তোমার অকৃপণ বসন্তবায়ু বন্ধ হবে না। আমি বন্ধ জানলা খুলি আর না খুলি তোমার তারা-ফোটানো তারা-ছড়ানোর খেলা চলবে সারা রাত, রাতের পর রাত। আমি যতই দূর-পথে ঘুর-পথে চলে যাই না কেন, তুমি আছ একেবারে কাছে-কাছে। আমার কাছেই দূর, তোমার কাছে দ্বারপ্রান্ত।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখি—গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া!'

এ কি একটি কাব্যাশ্রিত বর্ণনা নয়? বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া! প্রকৃতির যা কিছু শোভাশ্রী সব ঐ বিরাটের পূজোপকরণ! তেমনি কবে আমার প্রাণ বিরাটের পূজার পুষ্পার্ঘ্য হবে। কবে ফুটবে তাতে শোভা,

কবে জাগবে তাতে গন্ধ, কবে ছিন্ন করতে পারব তাকে কাম-কণ্টকের বৃন্ত থেকে!

যার ভিতরে যেটুকু শক্তি সেটুকু ঐ বিরাটেরই আত্মপ্রকাশ। যেমন আধার তেমনি ওজন। যেমন কাঁচ তেমনি প্রতিবিম্ব। রামকৃষ্ণ বললেন, 'সব সেই একই পুলি, কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর বা কলায়ের ডালের।'

সবই সেই ঈশ্বরের শক্তি। ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য। সদরালা জজকে বলছেন রামকৃষ্ণ : 'আপনি জজ, তা বেশ। এটি জানবেন ঈশ্বরের শক্তি। বড় পদ তিনিই দিয়েছেন, তাই হয়েছে। ছাদের জল সিংহের মুখওলা নল দিয়ে পড়ে, মনে হয় সিংহটাই বুঝি মুখ দিয়ে জল বার করছে! কিন্তু দেখ তো কোথাকার জল! কোথা আকাশে মেঘ, জল বেরুচ্ছে সিংহের মুখ দিয়ে।'

শুধু অভিমান! অহংকারের ঝংকার। আমিই ডিক্রি-ডিসমিস করলুম। ঠুকে দিলুম সাত বচ্ছর! হয়তো রায় গেল উলটে, আসামী খালাস হয়ে গেল। কার কর্ম কে করে। সিংহের মুখের জল হয়তো চলে গেল নর্দমা দিয়ে।

কিন্তু সেই তাঁতি কী বলেছিল? গল্প বললেন রামকৃষ্ণ :

'এক তাঁতি থাকে এক গাঁয়ে। বড় ধার্মিক। হাটে গিয়ে কাপড় বেচে। যা দাম ধরে বা মুনফা নেয় সব রামের ইচ্ছেয়। একদিন, রাত হয়েছে, ঘুম হচ্ছে না বলে বসে-বসে তামাক খাচ্ছে তাঁতি। একদল ডাকাত যাচ্ছে ডাকাতি করতে। মাল বইবার একটা মুটে দরকার। এই, তুই চল আমাদের সঙ্গে। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল তাঁতিকে। তারপর এক গৃহস্থবাড়িতে গিয়ে ডাকাতি করলে। তাঁতি মোট মাথায় নিয়ে চলেছে, পুলিশে ধরলে। আর সব ডাকাতরা পালিয়ে গেল। তাঁতি চালান হল বিচারের জন্যে। গাঁয়ের লোক হাকিমকে এসে বললে, হুজুর, এ লোক কখনো ডাকাতি করতে পারে না। কেন, কি হয়েছে? তাঁতিকে জিগগেস করলে হাকিম।

তাঁতি বললে, হুজুর, রামের ইচ্ছে, রাত্রে ভাত খেলুম। রামের ইচ্ছে, বসে আছি চণ্ডিমণ্ডপে; রামের ইচ্ছে, তামাক খাচ্ছি আর নাম করছি; রামের ইচ্ছে, একদল ডাকাত এসে উপস্থিত। রামের ইচ্ছে, তারা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল; রামের ইচ্ছে, ডাকাতি করলে গৃহস্থবাড়িতে।

রামের ইচ্ছে, আমার মাথায় মোট দিলে; রামের ইচ্ছে, পুলিশ এসে পড়ল আচমকা। রামের ইচ্ছে, আমি ধরা পড়লুম, রামের ইচ্ছে, আমাকে হাজতে ঠেললে। আজ সকালে, রামের ইচ্ছে, হুজুরের কাছে নিয়ে এসেছে আমাকে।

তাঁতিকে ছেড়ে দিল হাকিম।

রাস্তায় নেমে গ্রামবাসীদের বললে, তাঁতি, রামের ইচ্ছে, আমাকে ছেড়ে দিলে।'

যা কিছু হচ্ছে-ঘটছে সব তাঁর ইচ্ছে। শুধু রোদটুকু হলেই চলে না, চাই বৃষ্টিবিন্দু। ধান গাছ যে বাঁচবে, জল চাই। প্রাণ যে বাঁচবে দুঃখ চাই। যিনি তুষের মধ্যে তণ্ডুল আনছেন তিনিই ঢালছেন বর্ষা-বন্যা। জীবনে অশ্রুর বাদল আনছেন আনন্দের নীলকান্ত আকাশটি ফোটাবার জন্যে। এক ছত্র দুঃখ এক ছত্র সুখ—এমনি ছন্দে বেজে চলেছে সৃষ্টির কবিতা—এক ছত্র আঘাত এক ছত্র উপশম, এক ছত্র বা রিক্ততা এক ছত্র বা ঐশ্বর্য—কিন্তু সব মিলিয়ে হল কি? সব মিলিয়ে কল্যাণ। সব মিলিয়ে শিব।

সর্বত্রই যেন তোমার প্রসন্ন স্থিতিটি দেখতে পাই, তোমার শাশ্বতী স্থিতি। তুমি যখন রুদ্র হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দাও, তখনো, সেটাও যে তোমার মঙ্গলমূর্তি তা যেন বুঝতে পারি। তোমার আগুনের ইন্ধন আমাদের পাপ, তবে সে আগুনকে অবাঞ্ছনীয় বলব কেন? সে আগুন পবিত্রতা নিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে ক্ষতশান্তির অনাময়। আমার যে শোক, সে তো তোমার শুচিস্পর্শ, তবে কেন তাকে আস্বাদনীয় বলব না? কেন দুঃখকে এড়িয়ে বেড়াব? আমি তো তোমার সংসারে সুখী হতে আসিনি, আমি বড়ো হতে এসেছি। না ছাড়লে না হারালে বড়ো হব কি করে?

তাই সর্বত্রই রামের ইচ্ছে। আমার জীবন-সংসারে আমার ইচ্ছেই কাজ করছে এমনি একটা অহঙ্কারের বিকারে আচ্ছন্ন আছি। সূচীমুখে ঘা মেরে-মেরে বোঝাও যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটি হল না। আবার এক চাকা ছেড়ে আরেক চাকায় পাক দিই। আবার দেখি, মনের মত ঘোরে না। চাকা ঘোরে তো গাড়ি চলে না। আবার ঠেলাঠেলি শুরু করি। শেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে আমার ইচ্ছাটি তোমার করতলে তুলে দিই। বলি, তোমার ইচ্ছে।

আমার ইচ্ছাটি তোমার ইচ্ছার সঙ্গে এসে মেশে। আমার ইচ্ছা যখন তোমার ইচ্ছার সঙ্গে এসে মিশল তখনই তো প্রেম।

সর্বত্র রামের ইচ্ছে, তার মানেই তো সর্বত্র প্রেমের রমণীয়তা।

॥ ৪৬ ॥

এই ভাবটিই আবার অন্য কথায় বলেছেন :

'উকিল বলে, আমি যা বলবার বলেছি, এখন হাকিমের হাত।'

যা কর্তব্য দিয়েছ করেছি, এখন তার ফলাফল তোমার হাতে। আমি শুধু মাটি কোপাতে পারি ফল ফলাবার ভারটি তোমার উপরে। বাইরে তুমি ফল না দাও অন্তরে দাও সন্তোষের সরসতা। তোমার দেওয়া কাজটুকু আমি করেছি বীরের মত, এই তপস্যার তৃপ্তি। অহরহ অন্তরে বসে তুমি আমার এই তপস্যাটুকু দেখেছ এই আমার পুরস্কার। তুমি যদি আমাকে কিছু না-ও দাও, তবু তা তোমার হাতের পুরস্কার হয়েই থাকবে।

যা আমার করবার কাজ, তা তুমিই দিয়েছ করতে, তুমিই তা বুঝে নাও। ফাঁকি দিয়ে আর যাকে ঠকাই তোমাকে ঠকাতে পারব না। তোমাকে ঠকাতে গেলে শুধু নিজেকেই ঠকানো হবে, আনন্দের ভাগে কম পড়ে যাবে আমার। কর্মই তো আমার পূজা, কর্মের মধ্য দিয়েই তো আমার আত্মনিবেদন। যে মুহূর্তে ভাবি এ কর্ম তোমারই নির্বাচন, তখনই কর্মকে ভার মনে হয় না, মনে হয় ছুটির দিনের গন্ধ-ভরা মন-পবনের খেলা। মালা কণ্ঠে ভার হয়ে ওঠে যদি তা শুধু জয়ৈশ্বর্যই বহন করে; যদি তাতে প্রেমের স্পর্শ লাগে তখনই সে মালা বরমালা। আমার কর্মে তোমার প্রেমের স্পর্শ লাগুক। যতই শৃঙ্খল থাক সে কর্মে, তোমার প্রেমের স্পর্শে তাতে গান ঝরুক, যেন তারে বাঁধা বীণাযন্ত্র। বন্ধনের ক্রন্দনে আনন্দের স্পন্দন।

এমনি করে জীবনের জানলাটি খুলে রাখো যেন তাঁর দক্ষিণসমীরটি গায়ে লাগে। বললেন রামকৃষ্ণ, 'মলয় পর্বতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয়।'

আমাকে চন্দন করো। অকারণ আনন্দে আমি যেন তোমার সুগন্ধ

ছড়িয়ে দিতে পারি। সেই সুগন্ধই তো তোমার জয়ধ্বনি। তুমি যে আছ তা যেন লোকে বুঝতে পারে আমার এই আনন্দের সংস্পর্শে, এই সুগন্ধের সংবাদে। চন্দন দেখে লোকে যেন মলয়হাওয়ার খবর নেয়। ফলভারনত লতার নম্রতায় লোকে যেন বুঝতে পারে তোমার রসের শ্রাবণ-উৎসারের কথা। আমার হৃৎস্পন্দনে বাজে যেন নক্ষত্রের প্রাণযাত্রা। আমি যেন তোমারই ঠিকানাটি বহন করে বেড়াই। পাখি দেখে কলম্বস যেমন মনে করেছিল মানুষ আছে তেমনি আমাকে দেখে অন্ধপথযাত্রীরা যেন বিশ্বাস করে তুমি আছ!

আমি যেন হই তোমার ডাকহরকরা। জনে-জনে আমি যেন তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াই। তোমারই স্পর্শের ঢেউয়ে ভেসে-ভেসে বেড়াই তট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, তোমার ডাক মাঠ-ভরা, ঘর-ভরা, আকাশ-ভরা। সেই ডাকটি যেমন জেগেছে ফুলের রঙে পাখির কাকলীতে জলের কলস্বরে তেমনি আমার বেঁচে থাকায়। আমি তো একা-একা বাঁচি না, সবাইকে নিয়ে বাঁচি। তাই সবাইকে নিয়েই তোমার কাছে আসি। আবার তোমাকে নিয়ে সবাইর কাছে গিয়ে হাজির হই। তোমাকে ধরেই সব। আবার, সবকে ধরেই তুমি।

তাই রামকৃষ্ণ বললেন সুন্দর করে, 'সেইখানে সন্তোষ করলে সকলেই সন্তুষ্ট।'

কিন্তু কি করে তোমাকে সন্তুষ্ট করি? আমার কী আছে যা দেখে তুমি আকৃষ্ট হবে? আমার কি ধন আছে না ধ্যান আছে? আমার কি ভজন আছে না ভক্তি আছে? সাধন কি আমার সাধ্য? কোথায় পাব আমি বিশ্বাস-ব্যাকুলতা, কোথায় বা বিবেক-বৈরাগ্য? আমার থাকার মধ্যে আছে এক কর্ম, যাতে তুমি কৃপা করে নিযুক্ত করেছ আমাকে। তোমার সঙ্গে যোগ নেই তাই বলে অভিযোগও নেই। কাজ দিয়েছ, হোক তা অগণ্য, হোক তা নগণ্য, তাই করে যাব আপন মনে, ফলাফল বিচার না করে। কাজ করে-করে ক্লান্ত হব। ক্লান্ত হয়েই খুশি করব তোমাকে। ক্লান্ত হলেই তুমি আমাকে ধরবে। তোমার সে স্পর্শ ক্ষান্তি-ভরা শান্তি-ভরা। তোমার সে স্পর্শ মার্জনামধুর।

তোমাকে কাছে টানবার আমার আর কোনো উপায় নেই। শুধু এই কর্মক্লান্তি। শুধু এই ক্লেশগ্লানি। কর্মেই আমার গতিমুক্তি। না ছুটলে ক্লান্ত হব কি করে? ক্লান্ত না হলে তো তুমি ধরবে না, করবে না ক্লেশ-

মোচন। তাই শিখার মধ্য দিয়ে আগুন যেমন ছোটে তেমনি করে ছুটব, তারপরে একদিন নামবে তোমার করুণার ধারাশ্রাবণ। নদীর মধ্য দিয়ে স্রোত যেমন ছোটে তেমনি করে ছুটব, তারপরে একদিন জাগবে তোমার স্নেহ-সঞ্চিত শ্যামল মৃত্তিকা।

কর্ম-নদীই প্রীতি-প্রবাহিনী। ছুটতে-ছুটতে ছুঁয়ে যাব সবাইকে, ধুয়ে যাব সবাইকে। নিযুক্ত থেকেই সংযুক্ত হব সবার সঙ্গে। নিয়োগে তোমাকে না বুঝি, যেন বুঝি সংযোগে। শ্রমে না বুঝি, বুঝি যেন বিশ্রামে।

তুমি বায়ু, আর আমি বায়ু-ভরে ওড়া একটি পাখি—এমনি অনুভব করতে দাও। তুমি জল, আর আমি অগাধসঞ্চারী মাছ—এমনি দাও আমাকে একটি আপন-বোধের আবেষ্টন। তুমি শুধু আমার গানের নীলাকাশ নও, আমার স্নানের সরোবর, পানের নির্ঝরধারা। নিজের আচ্ছাদনটি যেমন নিজের সঙ্গে সহজ হয়ে আছে তুমি তেমনি হয়ে থাকো। যেমন হাড়কে জড়িয়ে আছে মাংস, মাংসকে চামড়া তেমনি। হয়ে থাকো ঘুমের মধ্যে নির্ভুল নিশ্বাসের মত। তুমি সাধনার ধন এ কে না জানে! তুমি একবার বিনা-সাধনার ধন হও। তুমি অনন্ত এ কে না জানে! তুমি একবার আমার একান্ত হও।

মণির মধ্যে যে আলোটি সহজ হয়ে আছে স্নিগ্ধ হয়ে আছে তুমি তেমনি করে অনুস্যূত হও। তোমাকে ধরতে পারি এমন সাধ্য কি। তোমাকে শুধু দেখি। তুমি আমার পরশ-মণি না হও, দরশ-মণি হও।

বললেন রামকৃষ্ণ, 'ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায় সে মণির আলো। মণির আলো উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পোড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয় আনন্দ হয়।'

তুমি উজ্জ্বল, এর মধ্যে বাহাদুরি কী! তুমি উজ্জ্বল হয়েও শীতল, এইখানেই তুমি তুলনাহীন।

তাই তো রামকৃষ্ণ বললেন, জ্ঞানে কতদূর যাবি, ভক্তিতে চলে আয়! জ্ঞান বড় প্রখর, সইবে না তার প্রদীপ্তি। ভক্তি বড় পেলব, সুধাননা বধূটির মত। নির্জন মাঠে অশ্রুসিক্ত জ্যোৎস্নারাত্রি।

মন্ত্রের মত বললেন রামকৃষ্ণ :

'জ্ঞান সূর্য, ভক্তি চন্দ্র।'

পরিব্যাপী অর্থকে সহজ একটি উক্তিতে সংহত করলেন। জ্ঞান হলে

তো নিজেকে প্রধান ভেবে স্পর্ধা—রামকৃষ্ণের ভাষায় 'জ্ঞানী যেন গোঁপে চাড়া দিয়ে বসে'—আর ভক্তি হলে, প্রেম হলে নিজেকে অধম ভেবে পরিতৃপ্তি।

আমি যদি না দীন হই তুমি দীনবন্ধু হও কি করে? আমি যদি না ধুলোয় গড়াগড়ি দিই, তবে কি করে তোমার কোলে উঠি!

'নিচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়।' সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'চাতক পাখির বাসা নিচে, কিন্তু ওঠে উঁচুয়।'

তাই তো বলি, আমি নিজে না আনত হই তুমি আমাকে প্রণত করে দাও। আমার সমস্ত জীবন একটি নমস্কারে ভরে উঠুক। যেন পথহারা বৈশাখের মেঘের মত নিরুদ্দেশ হয়ে না উড়ে যায়, শ্রাবণের স্থির মেঘের মত যেন জলে ভরে ওঠে। যেন বর্ণের বিদ্যুৎ খেলিয়ে ফুল হয়েই না ঝরে পড়ে, যেন পর্যাপ্ত ও পরিণত ফলের মত রসে ভরে ওঠে। সেই জলে আর রসে শুধু সেই নমস্কারের নম্রতা। জীবনে সেই নমস্কারের নম্রতাটিই তোমার প্রসাদ-সুধা, তোমার প্রসাদ-পরিমল।

'কলঙ্ক সাগরে ভাসো, কলঙ্ক না লাগে গায়।' বললেন তাই রামকৃষ্ণ। কি করে লাগবে। সে সাগর তো আর অহঙ্কারের সাগর নয়, নমস্কারের সাগর।

ভগবান কিছুই নেন না, কেবল দিয়েই যাচ্ছেন। যেখানে দান সেই-খানেই তো ঐশ্বর্য। আমরা কেবল নেবার জন্যে হাত বাড়াই, আর সে নেওয়াও শুধু নিজের জন্যে নেওয়া। নিয়ে-নিয়ে ঘর ভরে গিয়েছে, কিন্তু চেয়েও দেখি না যা জমিয়েছি এত দিন তা শুধু শ্মশানের ভস্মমুষ্টি।

কাউকেই কিছু দিইনি। জনে-জনে কাকেই বা কী দেব কিছুই জানি না। শুধু তোমাকে একটি জিনিস দিই আজ। তোমাকে দিলেই সকলকে দেওয়া হবে।

সেটি আমার নমস্কার।

'ওরে তারে কেউ চিনলি না রে ।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'সে পাগলের বেশে, দীনহীন কাঙালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে-ঘরে।'

এটিই তো ভগবানের নিরুপাধি মাধুর্য-বিগ্রহ। ঐশ্বর্য চমৎকৃত করে, মাধুর্য করে আকর্ষণ। রাজ্যেশ্বর যখন কাঙালের বেশ ধরে তখন তাকে মধুরবন্ধু বলে মনে হয়। যদি কেউ তখন তাকে দোর খুলে ভিতরে ডেকে আশ্রয় দেয় দয়া করে!

॥ ৪৭ ॥

জ্ঞানীর কাছে মায়া, ভক্তের কাছে মহামায়া।

ভক্তের জন্যে একটি মূর্তি চাই, ভাব চাই, মমতা চাই। হনুমানের চাই সীতারাম, যশোদার চাই গোপাল, গোপিনীদের চাই রাখাল-রাজা। রুক্মিনী-কৃষ্ণে হনুমানের মন ওঠে না, যশোদার দরকার নেই গোবিন্দে-নারায়ণে, পাগড়ি-পরা মথুরার রাজাকে মানে না গোপীরা—তাদের চাই পীতধড়া-মোহনচূড়া-পরা।

উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'কি রকম জানো? যেমন বাড়ির বউ। দেওর, ভাসুর, শ্বশুর, স্বামী সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়. পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই সম্বন্ধ।'

তাই, আবার বললেন রামকৃষ্ণ, 'জ্ঞানীর কাছে সংসার ধোঁকার টাটি, ভক্তের কাছে তা মজার কুঠি।'

ভক্তের জন্যে ভগবান ভাবের স্বভাব ধরেছেন। তিনি ভাবগ্রাহী। যদি তাঁকে ভাব করে ডাকা যায় তিনি জ্ঞানহীন ভাবেন না।

'যেমন ভাব তেমন লাভ।' এবার একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'একজন বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে-মাঝে বলছে, রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও। বলতে-বলতে তার জিভ তালুর মূলের কাছে উলটে গেল। অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নেই, শব্দ নেই, স্পন্দ নেই। তখন সবাই ইটের কবর তৈরি করে তাকে সেই ভাবেই পুঁতে রাখল। হাজার বৎসর পর সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে কে একজন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। সবাই তাকে সাধু মনে করে পুজো করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া খেতে-খেতে জিভ সরে এল তালু থেকে। যেই চৈতন্য ফিরে এল, চীৎকার করে বলতে লাগল, লাগ ভেলকি লাগ! রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও।'

হায়, আমাদেরও কি তেমনি ভাবের অচিরদ্যুতি? রামকৃষ্ণ যাকে বলেছেন, 'যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে?' মা'র কোলে নগ্ন শিশুর মত খানিকক্ষণ বসে আবার আমাদের মোহ-আবরণ? কুম্ভকের সমাধি কেটে যাবার পর আবার আমরা বাজিকরের মতই ভেলকির মুনফা চাইব?

স্নান করে এসে আবার গড়াগড়ি দেব ধুলোয়? একবার পরশমাণিক ছুঁয়ে সোনা হয়ে মাটির নিচে গেলে কি আবার মাটি হয়ে যাব?

আমাকে ভাব দাও। তোমার ভাবের সায়রে মৎস্য করো আমাকে। রঙ্গমঞ্চের যে তুমি সে জ্ঞানের তুমি, নেপথ্যের যে তুমি সে ভাবের তুমি। রঙ্গালয়ের নর্তকীকে যেন তার সাজ-ঘরে ধরে ফেলেছি এবার। তুমি আমার রঙ্গমঞ্চের নর্তকী নও, সাজঘরের নর্তকী। তোমার সঙ্গে আমার ধামলীলা নয়, নিত্যলীলা। তুমি আমার সাধারণ প্রভাতটিতে, সাধারণ প্রাত্যহিকতায়, ক্লান্তিশেষের স্বাভাবিক ঘুমটুকুতে। সাজগোজ করে ঐশ্বর্যে আরূঢ় হবার আগেই তুমি ধরা পড়েছ। ধরা পড়েছ আমার দৈন্যে, আমার শূন্যতায়, আমার এ একাকীত্বে। তুমি তো পৃথক কিছু নও যে তোমাকে স্বতন্ত্র করে দেখব। মাটির নিচে জলধারার মত, বল্কলের নিচে রসধারার মত, ত্বকের নিচে রক্তধারার মত তুমি মিশে আছ, খন্ড-খন্ড গীতিকবিতার মধ্যে একটি অমেয় মহাকাব্য।

তুমিই সমস্ত মাল্যের গ্রন্থি, সমস্ত ব্যঞ্জনের নুন।

তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙে রাঙিয়ে দাও।

একটি অপূর্ব গল্প বললেন রামকৃষ্ণ। সাধকের জন্যে ভগবান যে নানা ভাবে নানা রূপে দেখা দেন তার কাহিনী :

‘একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড়ে রঙ করাতে আসে। একজন বললে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। তাকে তাই ছুপিয়ে দিলে রঙওয়ালা। তুমি? আমি চাই নীল। এই নাও তোমার নীল রঙের কাপড়। আমি বেগনি, আমি হলদে, আমি সবুজ। যে যেমন চায় তার তেমনি রঙ। যার যেমন ছাঁচ তার তেমনি গড়ন। যার যেমন পুঁজি তার তেমন পসরা। একজন দূরে থেকে দেখছিল এই আশ্চর্য ব্যাপার। তার দিকে তাকিয়ে রঙওয়ালা বললে, কেমন হে, তোমার কী রঙে ছোপাতে হবে? তখন সে লোকটি বললে, ভাই, তুমি যে রঙে রঙেছ, আমাকে সেই রঙে রাঙিয়ে দাও।’

গভীর ব্যঞ্জনাভরা একটি আনন্দঘন কথা : আমাকে তোমার রঙে রঙিন করো। আমাকে তুমি-ময় করে দাও। জলের মধ্যে যেমন জল, তেমনি তোমার স্বভাবসমুদ্রে আমার স্বভাবটি ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, মিশিয়ে দাও। তুমি-আমি একীকৃত হয়ে যাই!

ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি। যে জলে উৎপত্তি সেই

জলেই লয়। বললেন রামকৃষ্ণ : 'তবু জলই সত্য। ভুড়ভুড়ি এই আছে এই নেই।'

নাই বা থাকল ভুড়ভুড়ি, তবু জল থাক। জলের মধ্যেই আছি আমি বুদ্বুদ। সাধ্য কি জল স্থির হয়ে থাকে? জলকে যে খেলতে হবে, হেলতে-দুলতে হবে। তখন ভুড়ভুড়ি না ফুটিয়ে তার উপায় কি? আমি ছাড়া তিনি হন কি করে? ভক্ত নেই তো ভগবানও নেই।

সেই ভাবটিই বললেন আবার কাব্য করে : 'চন্দ্র যেখানে তারাগণও সেখানে।'

কিন্তু আমরা তো শুদ্ধ জল নই, ঘটের মধ্যে জল! তাই জলের সঙ্গে জল হয়ে মিশতে পাচ্ছি না। ঘট আমাদের আবৃত, অবরুদ্ধ করে রাখছে। ঘট না ভেঙে ফেলা পর্যন্ত মুক্তি নেই, মিশ্রণ নেই।

এই ঘট হচ্ছে অহঙ্কার। আর যে মহাসমুদ্রের মধ্যে ঘটটি বসিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর, সেটা হচ্ছে তাঁর কৃপার পয়োনিধি। অহঙ্কার যতক্ষণ না ত্যাগ হচ্ছে ততক্ষণ লাগছে না এই কৃপাস্পর্শ।

ঘরোয়া উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'কর্মের বাড়িতে যদি একজনকে ভাঁড়ারি করা যায়, যতক্ষণ সে ভাঁড়ারে থাকে ততক্ষণ কর্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছে করে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।'

তারপর বললেন সেই লক্ষ্মীনারায়ণের গল্প :

'বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী বললেন, কোথা যাও? নারায়ণ বললেন, আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি। কতদূর গিয়ে ফের ফিরে এলেন নারায়ণ। এ কি, এত শিগগির ফিরলে যে? জিগগেস করলেন লক্ষ্মী। নারায়ণ বললেন, ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকোতে দিয়েছিল, ভক্তটি পায়ে মাড়িয়ে দিলে। তাই দেখে লাঠি নিয়ে তাকে মারতে গিয়েছিল ধোপারা। তাই আমি তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু, লক্ষ্মী উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, ফিরে এলে কেন? নারায়ণ হাসতে-হাসতে বললেন, ভক্তটি নিজেই ধোপাদের মারবার জন্যে ইঁট তুলেছে দেখলাম।'

আমার হাতের ইঁট তুমি কেড়ে নাও। আমি যে তোমার শক্তিতে শক্তিমান এইটি বুঝতে দাও। তুমিই যে আমাকে সমস্ত পাপ সমস্ত

দৌর্বল্য সমস্ত পীড়ন-পেষণ থেকে মুক্ত করবে দাও আমাকে সেই শরণাগতির দুর্গাশ্রয়। যার তুমি আছ তার আর কিসের ভয়, কিসের কাতরতা! তার সর্বত্র জয়-জ্যোতি।

॥ ৪৮ ॥

তাই শুধু জয় চাই তোমার কাছে। রূপং দেহি জয়ং দেহি বলে প্রার্থনা করি।

তুমি যদি আমার আপনার লোক হও তবে চাইবই তো তোমার কাছে। আর দ্বিতীয় কে আছে তুমি ছাড়া? তোমার কাছেই যে চাই তার একমাত্র কারণ তোমাকেই একান্ত বলে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, তোমার অনন্ত ভান্ডার, ইচ্ছে করলেই তুমি দিতে পারো। প্রার্থনা পূর্ণ হলেই তো বুঝি আমার বিশ্বাসটি সত্য হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ঠিক-ঠিক স্থির হয়েছে তাই দেখাবার জন্যে তুমি কল্পতরু হও।

সকাম প্রার্থনাই সরল প্রার্থনা। সকাম না হলে নিষ্কাম হব কি করে? সব ঘর না ঘুরলে ঘুঁটি পাকবে কোথায়?

তাই বললেন রামকৃষ্ণ : 'সকাম ভজন করতে-করতেই নিষ্কাম হয়। ধ্রুব রাজ্যের জন্যে তপস্যা করেছিলেন, ভগবানকে পেয়ে গেলেন।' বলেই একটি উপমা দিলেন : 'যদি কাঁচ কুড়ুতে এসে কেউ কাঞ্চন পায়, তা ছাড়বে কেন?'

আমরাও কাঁচ কুড়িয়ে চলেছি। কিন্তু এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোথাও কি এক কণা সোনা লুকিয়ে নেই? আছে, কুড়ুতে-কুড়ুতে যদি মিলে যায়! কামনার আগুন জ্বালাতে-জ্বালাতে যদি জ্বলে ওঠে প্রেমপ্রদীপ। যদি ক্লান্তির পর ক্ষমা মেলে।

কাঁচ কুড়োচ্ছি বটে, কিন্তু লক্ষ্য, যদি একবিন্দু সোনা পাই! এই কথাটিই আবার বলেছেন অন্য ভাবে : 'যে শুধু পাখির চোখটি দেখতে পায়, সেই বিঁধতে পারে লক্ষ্য।'

পাখির পুচ্ছ দেখেই আমরা মজে আছি। গাছের পাতার আড়ালে চোখটি তার ঢাকা পড়েছে। পাতার আবরণ সরিয়ে স্থির করতে হবে চোখ। তার পরে লক্ষ্যভেদ।

নাটকীয় ভাবে বললেন সেই লক্ষ্যভেদের কাহিনী :

'দ্রোণাচার্য জিগগেস করলেন অর্জুনকে, কি-কি দেখতে পাচ্ছ? রাজাদের চেহারা? অর্জুন বললে, না। আমাকে দেখতে পাচ্ছ? উত্তর হ না। গাছ দেখতে পাচ্ছ? না। গাছের উপর পাখি দেখতে পাচ্ছ? ত না। তবে কি দেখতে পাচ্ছ? শুধু পাখির চোখ।'

একেই বলে বুদ্ধিমান। রামকৃষ্ণের ভাষায় : 'যে কেবল দেখে ঈশ্ব বস্তু, আর সব অবস্তু, সেই চতুর।'

তোমাকে ছাড়া আমার কী করে চলবে? তরু ছাড়া কি ফল থাক পারে? আকাশ ছাড়া কি বায়ু? মৃত্তিকা ছাড়া কি জল? রামকৃষ্ণ বলছে 'তিনি ইঞ্জিনিয়র, আমি গাড়ি।' প্রাণ ছাড়া কি দেহ চলে, রশ্মি ছাড়া অশ্ব? রথ কি চক্রে চলে? গান ধরলেন রামকৃষ্ণ, 'যে চক্রের চক্রী হরি, য চক্রে জগৎ চলে!' তাই রথ দেখব না, সারথি দেখব। ঢেউ দেখব না, সম দেখব। মেঘ দেখব না দেখব অন্তরীক্ষ।

আমাকে দেখব না, দেখব তোমাকে।

তোমার তীর্থমন্দিরচূড়ে পতাকা দেখতে পাচ্ছি। আর কে ম করে রাখে পথশ্রম? যত কাঁটা বিঁধেছে পায়ে-পায়ে কে আর তার যন্ত্রণ হিসেব করে? সময়ও নেই, যদি পথের মাঝে বসে এখন কাঁটা তুল যাই! তোমার মন্দিরে পেঁছুতে দেরি হয়ে যাবে। পথই বেশি হ আমার মন্দিরের চেয়ে! আমার অন্তরের আনন্দের চাইতে বেশি হ আমার শরীরের কণ্টকক্লেশ! শুধু কাঁটাই যদি তুলব, কুসুমচয়ন ক কখন?

তাই দেহ-গহন-বন ছেড়ে চলো যাই মানসতীর্থের মন্দিরে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকে একটি ছন্দে বাঁধা ছত্র।

একা হয়ে যাও। মনকে নিয়ে একা-একা বিচরণ করো। তিনিও ে একা-একা ঘুরছেন। যে অদ্বিতীয় তাকে পেতে হলে তোমাবে অদ্বিতীয় হতে হবে। তারপর একা পেয়ে যখন তোমাকে ডাকবেন ত যে-মনটি নিয়ে এতক্ষণ ছিলে সে-মনটি ফেলে দিয়ে তাঁর কোলে গি উঠবে, তাঁতে নিলীন হয়ে যাবে। দেখবে যে একা ছিল সেই এখন ে হয়ে উঠল।

আগে একা হবার সাধনা। শেষে এক হবার।

আমার কেউ নেই, আমি একা—আগে এই ভাব। শেষে আমিই সমস্ত, আমিই সম্পূর্ণ, আমিই আদ্যোপান্ত। তাই আবার বললেন অন্য উপমায় : 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে খুশি চলে যা।'

যার কায়া তারই ছায়া। আর এই কায়চ্ছায়াটিই মায়াময়।

'একই ব্রাহ্মণ।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যখন পূজা করে তখন পূজারী, যখন রাঁধে, তখন রাঁধুনি বামুন।'

মরুভূমিতে যেমন জলভ্রম, আকাশে যেমন নীলিমাভ্রম, ব্রহ্মেও তেমনি জগৎভ্রম। ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল যেমন একই মানুষ, হীরক আর অংগার যেমন একই পদার্থ, তেমনি ঈশ্বর আর জীব একই প্রতিচ্ছায়া।

কিন্তু ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ মানুষে। তাঁর শ্রেষ্ঠ লীলা নরলীলা।

'অবতার যেন গাভীর বাঁট।' অদ্ভুত একটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ।

গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর। আর এই ক্ষীর হচ্ছে প্রেম আর ভক্তি। আর শুষ্ক জ্ঞান? আবার একটি সার্থক উপমা। 'শুষ্ক জ্ঞান যেন ভস-করে-ওঠা তুবড়ি। খানিকটা ফুল কেটে ভস করে ভেঙে যায়।'

ব্রহ্মকে শক্তির এলাকা মানতে হয়। অবতারকে মানতে হয় পঞ্চভূতের শৃংখলা। সেইটেই বোঝালেন ছন্দে গেঁথে। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' আবার অন্য উপমায় বোঝালেন, আদালতী উপমায়। 'জজসাহেব পর্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে এসে দাঁড়াতে হয়।' দেহ ধরে মানতে হয় সব দেহের শাসন।

কিন্তু তোমাকে চিনি কি করে? অর্জুন দেখল বিশ্বরূপ। দুর্যোধন দেখল ভোজবাজি। বুঝি কি করে? কাঁটা-বৃক্ষের তলা ছেড়ে কি করে দাঁড়াই এসে কল্পতরুর ছায়াসত্রে?

এই গহন-ঘন অন্ধকারে কোথায় তোমাকে হাতড়ে বেড়াব? শুধু হাতটি বাড়িয়ে দিলাম অন্ধকারে। আমি না ধরতে পারি তুমি পারবে। তুমিই আমার হাত ধরে পথ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যাও।

॥ ৪৯ ॥

ভক্ত যখন ভগবানের কাছাকাছি আসে তখন তার কেমন অবস্থা? কে একজন জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে।

'মনে করো উত্তাল সমুদ্র।' বর্ণাঢ্য উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'তার মধ্য দিয়ে জাহাজ চলেছে। সমুদ্রের তীরে কোথায় রয়েছে এক চুম্বকের পাহাড়। সহসা সেই চুম্বক পাহাড়ের কাছে এসে জাহাজের যেমন অবস্থা, ভক্তেরও তেমনি।'

জাহাজের কেমন অবস্থা?

যখনই সেই চুম্বক পাহাড়ের টানের মধ্যে এসে পড়বে জাহাজ, তখনই জাহাজের যা কিছু দামী পদার্থ যা কিছু ভারি পদার্থ—লোহা-লক্কড় ইস্‌ক্রুপ-পেরেক নাট-বলটু—সব কাঠ উপড়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পাহাড়ে লেগে থাকবে। তেমনি ভক্ত যেই ঈশ্বরের এলেকার মধ্যে এসে পড়বে অমনি হবে তার সর্বনাশা বিস্ফোরণ। জীবনে তার যা কিছু মূল্যবান যা কিছু সারবান—তার কামনা-বাসনা সাধনা-আরাধনা সব গিয়ে ঈশ্বরে লগ্ন, লিপ্ত, লীন হয়ে থাকবে। আর যা কিছু তার অসার পদার্থ, যা কিছু অবস্তু—তার কাঠ-বাঁশ, চট-দড়ি—সব পড়ে থাকবে জলের উপর। আর পড়ে থাকবে, জীবনভোর জাহাজে যা এতদিন সে বোঝাই করেছে, তার মাল-পত্র, পণ্যাপণ্য, তার সব অভিমানের আসবাব। তার সব কাঠ-কুটা নেতা-কাতা হাঁড়িকুঁড়ি, তার সব বাঁধন-ছাঁদন। যা কিছু বিজ্ঞাপনের জারিজুরি। সোনার অক্ষরের সাইনবোর্ড।

উপমার উপাদান তিনটি বিবেচনা করুন : উত্তাল সমুদ্র, মালবাহী জাহাজ, আর, চুম্বকের পর্বত। চুম্বকের সূচিকা নয়, শলাকা নয়, চুম্বকের গিরিরাজ। মহিমময় প্রতীক। সমুদ্র হচ্ছে সংসার, জাহাজ হচ্ছে মানুষ আর চুম্বকের পাহাড় হচ্ছেন ভগবান।

যেতে হবে আরো তাৎপর্যের গভীরে।

যদি জানি ঐ সমুদ্রতটে বিজন-বিদেশে রয়েছে এক চুম্বকের পাহাড়, তবে কে যায় আর ঐ দিক দিয়ে! যেখান দিয়ে গেলে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাব, কাঠ-লোহা আলাদা হয়ে যাবে, সে পথ কে মাড়ায়! সমুদ্রের কি অন্য তীর নেই? যাব সেই অন্য তীরের গা ঘেঁষে। যাব সেই নিরিবিলে, নিরাপদের ছায়ায়-ছায়ায়। পলানে খাতকের মতো এড়িয়ে যাব মহাজনকে। যেখানে অমন সর্বস্বহরণ সর্বনাশ কে সেদিকে মরতে যাবে? পাশ কাটিয়ে এলেকা বাঁচিয়ে চলে যাব নির্ভাবনায়।

কিন্তু হায়, আমরা কি জানি কোথায় চলেছি জল ঠেলে-ঠেলে? কোথায় আমাদের বন্দর? কোথায় আমাদের নোঙর নামাবার ঠিকানা?

পথ জানা নেই, শুধু ভেসে চলেছি স্রোতের টানে, উজিয়ে-ভাটিয়ে। জীবনের সরজমিন-তদন্ত হয়নি, হয়নি মাপ-জরিপ, হয়নি কাঠা-কালি। কেউ জানি না সীমা-সরহদ্দ, কেউ জানি না চিঠে-খতেন। শুধু ভোগ-দখল করে চলেছি, শুধু চলেছি ভাসতে-ভাসতে। কেউ জানি না জীবনের কোন মোড়ে, কোথায় কোন বাঁক নিতেই, সহসা দেখা হয়ে যাবে সেই চুম্বক পাহাড়ের সঙ্গে। কেউ জানে না। কেউ বলতে পারে না। সহসা একটা সশব্দ বিদারণে জেগে দেখব, কোথায় জাহাজ, কোথায় সেই সম্ভার-সঞ্চয়!

হে অয়স্কান্ত, হে কান্তপাষাণ, আমাকে টানো, আমাকে আকর্ষণ করো। তুমি আকর্ষণ করো বলেই তো তুমি কৃষ্ণ। তুমি আমার সমস্ত ভেঙে-চুরে আমার সমস্ত ভাঙা-চোরা দূর করে দাও। আমার পাত্র ভেঙে যাক, শুধু আমার রিক্ত অঞ্জলি তোমার প্রসাদে পূর্ণ হয়ে উঠুক। সর্বনাশের আশায় আমি আমার সমস্ত নিয়ে বসে আছি কেননা আমি জানি আমার সর্ব গেলেই তুমি আমার সর্ব হয়ে উঠবে।

'জোয়ার-ভাঁটা কি আশ্চর্য!' বললে একজন ভক্ত।

'কিন্তু দ্যাখো, সমুদ্রের কাছেই নদীর ভিতর জোয়ার-ভাঁটা খেলে। সমুদ্রের থেকে অনেক দূর হয়ে গেলে একটানা হয়ে যায়।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'তার মানে কি? যারা ঈশ্বরের খুব কাছে তাদেরই ভাব-ভক্তি এইসব হয়। আর যারা দূরে—'

অনেক দূরে পড়ে আছি, তাই শুধু অভ্যাসের একটানা। এবার টান দাও, ছিঁড়ে ফেল টানাপোড়েন। শেষ করে দাও গতাগতি।

কিন্তু যতক্ষণ আছ দুই হাতে কাজ করে যাও। আর অন্তরে রাখো একটি আনন্দধ্বনি। বিশ্বাসের অমৃতবর্তি।

'কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। সে আনন্দের অনুভবেই তার কর্মের প্রবৃত্তি।' উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'যেমন সাধু গাঁজা তয়ের করছে। তার সাজতে-সাজতে আনন্দ।'

গৃহ-অঙ্গন সাজাচ্ছি কবে থেকে, সাজাচ্ছি গীত-গন্ধে, লীলা-ছন্দে, বিচিত্র দীপাবলীতে। তুমি আসবে বলে। নিজেকে সাজাচ্ছি কত আবরণে-আভরণে, পরছি উৎসববেশ। তোমার সঙ্গে মিলব বলে। মরুস্থলীতে ফোটাচ্ছি প্রেমের মাধবী-মঞ্জরী। বরবর্ণিনী অশোক-মঞ্জরী। শুধু তোমার হাতে উপহার দেব বলে। এইটিই আমার বিশ্বাস। আমার

আঁচলের আড়ালে কম্পমান দীপশিখা। তোমার প্রেমমুখটিই তো আমার প্রতীক্ষার স্বপ্ন। আমার এ ঘর তো তোমারই ঘর। যতই কেননা অর্গল রুদ্ধ করে রাখি তুমি বলভরে প্রবেশ করবে। আমাকে হরণ করে নেবে। হে আমার জীবনশেষের শেষজাগরণ, তোমার জন্যে আমি জেগে থাকব।

তুমি আমাকে উন্মূলিত করো। তুমি যখন আমার মূলে, তখন উন্মূলিত হতে পারলে তোমারই কোলে আশ্রয় পাব। তাই আমার আর ভয় নেই। তুমি যদি টানো আমার উৎপাটনেই আমার উদ্ঘাটন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড়শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পাবে বলে গাছ ভালো করে গজাবে।'

দাও দুঃখের মন্থনবেগ। অশ্রুর অশান্ত বর্ষণ। তারপর ফোটাও সে আরক্ত গোলাপ।

আঘাত দাও। কিন্তু জানি সে আঘাত তোমার সকরুণ করপল্লবের স্পর্শ। দাও রৌদ্রতেজ। কিন্তু জানি সে নির্দয়তাই তোমার প্রেমদৃষ্টি।

হে মহাদুঃখ, তুমিই আমার মহাদেব।

॥ ৫০ ॥

আসল কথা, সহজ কথা, ছোট কথা : বিশ্বাস চাই।

'সাত চোনার বিচার এক চোনায় যায়।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'বিশ্বাস চাই। বালকের মত বিশ্বাস! মা বলেছে ওখানে ভূত আছে, তা ঠিক জেনে আছে যে ভূত আছে! মা বলেছে, ও তোর দাদা হয়, তো জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা।'

তেমনি কোথা থেকে একটি সংবাদ এসে যাবে জীবনে, দুর্যোগের রাত্রে বিদ্যুৎরেখার মত, আর সমস্ত মন-প্রাণ বলে উঠবে তুমি আছ! চাকা একটা ঘুরছে বটে কিন্তু চাকার আছে কোথাও ধ্রুব বিন্দু। সেই ধ্রুব বিন্দুটিই তুমি। আবর্তের মধ্যে কোথাও আছে একটি স্থৈর্য, কোলাহলের অন্তরে আছে কোথাও শান্তি। হাল নেই পাল নেই চলেছি ভেসে অজানা জলের উপর দিয়ে, কিন্তু জানি, কূল আছে।

শুধু রঙিন স্বপ্ন নয়, দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধপরিকর বিশ্বাস। যা শূন্য দেখছি তা আসলে শূন্য নয়, পূর্ণেরই উদ্ঘাটন। বুকের রুদ্ধ অন্ধকারে

অতন্দ্র করাঘাত, জাগো এবার প্রসুপ্ত বহ্নি। দৈন্যশীর্ণ শুষ্ক শাখায় বাতাসের ব্যাকুলতা, জাগো এবার বনশোভনা পুষ্পমঞ্জরী। কঠিন-মলিন মৃত্তিকায় নখের আঁচড় কাটছি, দাও এবার তাপভঞ্জন তৃষ্ণার পানীয়।

ক্ষণে-ক্ষণে নিশ্বাসে-নিশ্বাসে এই শুধুই বিশ্বাস যে, কোথাও কিছু একটা আছে। একটা ছন্দ, একটা শক্তি, একটা নীতি। সেটাকে পরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে না রেখে নিয়ে আসি গভীর-গোচরে। একেবারে সহজ পাশটিতে। জ্ঞানকে প্রেম বলে সম্ভাষণ করি। জানাকে নিয়ে আসি ভালোবাসার সামীপ্যে। দূরের আকাশ ধরা দিলো এখন দুটি আঁখির তারকায়। পরিচয়ের জিনিস হয়ে উঠল এবার স্পর্শের প্রসাদ। দেখি শক্তিটি তোমার আকর্ষণে, নীতিটি তোমার অন্তহীনতায়, ছন্দটি তোমার মিলনে-বিরহে।

তুমি নেই, শীত-দরিদ্র দিনে নেই তবে আর বসন্তের লাবণ্যলেখা, গ্রীষ্মের বহ্নিবৃষ্টির পরে নেই তবে আর বন্ধন-বিদারিণী বর্ষার উচ্ছলতা। তুমি নেই, আমার চোখে তবে এই আনন্দদৃষ্টিটিও নেই। যদি তুমি কোথাও আনন্দের ধারণাটি হয়ে না থাকো, তবে, কেন তবে এই প্রাণ-ধারণ?

ধারাসিক্ত বাতাসে ফুলের সৌরভটি যেমন বেঁচে থাকে, তেমনি জীবনের ব্যথার সমুদ্রে এই বিশ্বাসটি বাঁচিয়ে রাখব, তুমি আছ!

সরল বিশ্বাসে কী না হয়! শোনো এবার সেই গুরুপুত্রের অন্ন-প্রাশনের গল্প। গল্পটিও সরল।

'গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশনে—শিষ্যেরা যে যেমন পারে, উৎসবের আয়োজন করেছে। একটি গরিব বিধবা—সেও শিষ্য। তার থাকবার মধ্যে আছে একটি গরু, সে একঘটি দুধ এনেছে। শুধু একঘটি? গুরু ভেবে-ছিলেন দুধ-দধির সমস্ত ভারই বুঝি মেয়েটি নেবে। তাই ঘটি দেখে চটে গেলেন। দুধ ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন—তুই জলে ডুবে মরতে পারিসনি? এই বুঝি গুরুর আজ্ঞা, মেয়েটি নদীতে ডুবতে গেল। সরলতার সমুদ্র থেকে উঠে এলেন নারায়ণ, দর্শন দিলেন মেয়েটিকে। বললেন, এই পাত্রটি নিয়ে যাও, এতে দধি আছে, যত ঢালবে ততই বেরুবে, গুরু সন্তুষ্ট হবেন। পাত্র দেখে গুরু তো অবাক, দধির ভাণ্ডার যে অফুরন্ত। সব শুনলেন মেয়েটির কাছে। বললেন, নারায়ণকে যদি দর্শন না করাও তবে আমি জলে ডুবব। গুরুকে নিয়ে মেয়েটি এল সেই

নদীর ধারে। নারায়ণ দর্শন দিলেন কিন্তু গুরু দেখতে পেলেন না। মেয়েটি বললে, প্রভু, গুরুদেব যদি তোমার দর্শন না পেয়ে প্রাণ ত্যাগ করে তবে আমিও জলে ডুবব। তখন অনুপায়, নারায়ণ দর্শন দিলেন গুরুকে।'

কিন্তু কোথায় পাব এই বিশ্বাস? বন্দী হয়ে আছি, থাকলামই বা! কেন বিশ্বাস করতে পারব না, আমারও আছে কারামোচন! অন্ধকারের সনদে জ্যোতি-মুক্তির স্বর্ণস্বাক্ষর।

'যেন গুটিপোকা।' উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'মনে করলেই কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু অনেক যত্ন করে গুটি তৈরি করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না।'

আবার উপমা :

'যেন ঘুনির মধ্যে মাছ। যে পথে ঢুকেছে সেই পথেই বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু মাছের সঙ্গে খেলা, জলের মিষ্টি শব্দ—এই সব পেয়ে ভুলে থাকে। বেরিয়ে আসার চেষ্টাও করে না। মাছ হচ্ছে পরিবার-পরিজন। আর জলের মধুর শব্দ হচ্ছে ছেলে-মেয়ের আধ-আধ কথা—'

আবার বললেন অন্যভাবে :

'জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে। তার যে ক'টি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা আস্ত থাকে, পিষে যায় না। ঈশ্বরকে ধরে থাকো, নইলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।'

কিন্তু তোমাকে ধরি কি করে? আমার কি ধন-মান আছে, না কি সৈন্যসামন্ত আছে? শাস্ত্র আছে না কি আছে অস্ত্রবল? আমার যে আছে শুধু তোমার পুত্র হবার অধিকার। তাই আমি ধরতে না পারি টানতে পারব। স্তবগান দিয়ে নয়, শুধু হৃদয়ের গীতহারা স্তব্ধতা দিয়ে। আমার তো যাত্রা নয়, আমার শুধু অভিমুখিতা। আমি যে তোমার দিকে মুখ করে চেয়েছি এই তো আমার অভিসার। আমার একটি নির্জন দীপশিখার জন্যে তোমার গগন-মগন-করা অগণন তারাবলী।

আমার একটি অলিখিত চিঠির উত্তরে তোমার এত আলোকিত অক্ষর!

কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ : 'মনে করো এক বাপের অনেক ছেলে। বড় ছেলেরা কেউ বাবা কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি-শিশু ছোট ছেলে হদ্দ "বা" কি "পা" বলতে পারে।

তাই বলে তার উপর বাবা কি রাগ করবেন? বাবা জানেন ও আমাকেই ডাকছে তবে ভালো উচ্চারণ করতে পারে না—'

তেমনি যে কথাটি বলি-বলি করেও বলতে পারছি না সেটি তুমি বুঝেছ। যে কান্নাটি কাঁদতে পারলাম না এখনো তার ব্যথাটি পেঁৗছেছে তোমার কাছে। এত আলোকের কণা বিকীর্ণ করছ দিকে-দিকে, অথচ হৃদয়ের দীপমুখে পড়ল না তার ক্ষণিকস্পর্শ। কিন্তু বিশ্বময় তোমার অস্তিত্বের যে উত্তাপ সেটি রেখেছ সেই অনুভবের অন্ধকারে।

একবার তোমাকে যদি ছুঁতে পারি, আর আমাকে কে ছোঁয়!

বললেন রামকৃষ্ণ, 'যে বুড়ি ছুঁয়েছে তাকে আর চোর করবার জো নেই। ইট বা টালি যদি ছাপশুদ্ধ পোড়ানো হয় তো সে ছাপ আর কিছুতেই ওঠে না।'

আমি শুকনো শূন্য বাঁশ, তুমি দুঃখের তপ্ত শলাকা দিয়ে আমাকে সছিদ্র করো, তবেই তো বাঁশি হয়ে বাজতে পারব! যখন দগ্ধ করছিলে তখনো জানিনি এ দগ্ধমুখে তোমার অধরস্পর্শ রাখবে। হায় মোটে সপ্তস্বরের জন্যে সাতটি ছিদ্র! এখন আবার কাঁদছি তোমার হাতে উঠে। আমায় তুমি শতচ্ছিদ্র কেন করোনি?

শুধু সংগ্রাম করে যাব। সংগ্রামই মন্ত্র। কর্মই পূজা। ক্লান্তিই নৈবেদ্য।

মুক্তিতে যেমন তিনি, বন্ধনেও তিনি। যাঁর রোগ তাঁরই চিকিৎসা। বন্ধনে রেখেছেন ক্রন্দন শোনবার জন্যে। সংগ্রামে রেখেছেন সন্ধি করবার জন্যে। কারাগারে শুধু করাঘাত করে যাব। করাঘাতই প্রণিপাত।

বলো, ভালো আছি, ভালোবাসি। আলোও ভালো কালোও ভালো। কষ্টিপাথরের রাত যেমন ভালো তেমনি ভালো পাকা সোনার টকটকে ভোর। জীবনভোর ভোর হবার স্বপ্নেই বিভোর থাকো।

॥ ৫১ ॥

'ছিলে দিগম্বর, হলে সাম্বর—আবার হবে দিগম্বর।'

শুধু বারে-বারে ফিরে-ফিরে আসা। ঘুরতে-ঘুরতে প্রথম বিন্দুতে। গান যেমন ফিরে আসে প্রথম কলিতে। শিশু যেমন মা'র কোলে। দেশ বেড়িয়ে নিজের ঘরটিতে।

গতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে প্রগতি। প্রগতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আগতি। এই ফিরে-আসা। শুধু ছোটা নয়। ছুটতে-ছুটতে ছুটি নেওয়া। ঢেউয়ের মধ্যেই অবগাহন।

আনন্দ থেকে যাত্রা, আনন্দেই প্রত্যাবর্তন। যে বিন্দুতে আরম্ভ, সেই বিন্দুতেই শেষ। আবার যা শেষ তাই আরম্ভ। আমার কাছে তুমি আরম্ভ, তোমার কাছে আমি শেষ। আবার, তোমার কাছে আমি তোমার তুমি। আমার কাছে তুমি আমার তুমি।

তাই শুধু ঈশ্বরের দিকে চোখ রাখো।

কি রকম?

উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'পথে যাচ্ছে, যেন সঙ্গিন চড়ানো। কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি।'

এর নামই যোগ।

সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন : 'থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পরদা ওঠে, ততক্ষণ লোকে বসে নানারকম গল্প করে—বাড়ির কথা, আফিসের কথা, ইস্কুলের কথা, এই সব। যাই পরদা ওঠে অমনি কথাবার্তা সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক-আধটা কথা কয়, সে ঐ নাটকেরই কথা।'

ঈশ্বরেরই কথা।

এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন : 'মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দেরই কথা কয়।'

দাও আমাকে এবার শুধু আনন্দের কথা কইতে। দুঃখের মধ্যে যে আমার কান্না সে তো আমার দুঃখের মুহূর্তের আনন্দ। যদি কান্নাটিও না দিতে, তবে সে দুঃখের পাহাড় দীর্ণ করতুম কি করে? যদি না থাকত চোখের জলের ধারা কি করে হত তবে এই দাবাগ্নিনির্বাণ? পৃথিবীর সমস্ত কান্না ছাপিয়ে ভেসে আসছে একটি হাসির কলরোল। সমস্ত শব-গন্ধ ছাপিয়ে একটি অম্লান ফুলসৌরভ। সমস্ত মৃত্যু ছাপিয়ে একটি নব-জন্মের শঙ্খধ্বনি। একমাত্র আনন্দেই সৃষ্টির নিশ্চয়স্থিতি। সর্বস্থাবর-জঙ্গম একমাত্র আনন্দেই স্থাণু-চরিষ্ণু। সমস্ত অন্ধকারের অন্তরলোকে একটি তমোহারী সুপ্রভাত।

চক্ষুচকোর অতৃপ্ত হয়ে আছে, কেন দেখতে পাই না তোমাকে?

অপরূপ করে বললেন রামকৃষ্ণ, 'ছেলে চুসি নিয়ে যতক্ষণ চোষে, মা

ততক্ষণ আসে না। লাল চুষি। খানিকক্ষণ পরে চুষি ফেলে যখন চীৎকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে।'

রঙিন চুষি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। নাম-যশ টাকা-কড়ি কুল-বিদ্যা। কিন্তু অমৃতস্তন্যবঞ্চিত হয়ে আছি এই উপবাসের বোধ যদি একবার জাগে আর যদি একবার চুষি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেঁদে উঠতে পারি দিগন্ত পর্যন্ত, তুমি কি না এসে থাকতে পারবে? আর কিছুর জন্যেই নয় কাঁদছি তোমার উত্তপ্ত উৎসঙ্গের পিপাসায়। সেই যে উত্তাপের অনুভব এইটিই কি দেখা নয় তোমাকে?

কান্নার চাবি দিয়ে খুলব সেই আনন্দের সিন্দুক। কান্নাই সেই উদ্ঘাটিনী কুঞ্চিকা।

'তবু সব সন্দেহ যায় কই?' জিগগেস করলেন ডাক্তার।

'আমার কাছে এই পর্যন্ত শুনে যাও।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'তারপর বেশি কিছু শুনতে চাও, তাঁর কাছে একলা-একলা বলবে। তাঁকে জিগগেস করবে কেন তিনি এমন করেছেন।'

বলেই অপূর্ব উপমা দিলেন : 'ছেলে ভিখারীকে এক কুনকে চাল দিতে পারে। রেলভাড়া যদি দিতে হয় তো কর্তাকে জানাতে হয়।'

তাই বলি কর্তাকে ধরো। করণ-কারণ-কর্তা বিকর্তা গহন-গূঢ়কে। একের পিঠের শূন্যগুলোকে ধোরো না। এককে ধরো। এক বই দুই নেই। এক থেকেই অনেক। 'এক সের চালেই চৌদ্দগুণ খই।'

তারপর বললেন কবির মত : 'একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে যদি তাঁর উপর ভালোবাসা হয় তা হলেই হল।'

পথটা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ভালোবাসা। ভালোবাসার আলো জ্বললেই সব ভালো হয়ে যাবে, সব আলো হয়ে যাবে। অন্তর-খনির সে মণির মাল্যটি তোমাকে উপহার দিতে পারলেই পাব তোমার কণ্ঠের বরমাল্য। শুধু একটু ভালোবাসা, চকিতের আভাসে চিরকালের চাহনি। কিন্তু কি করে ঘুমের গহন থেকে উদ্ধার করি সেই স্বপ্নকে, অন্ধকারের কষ-পাষাণে সেই বিদ্যুতের লেখা। আমার মূল্যহীন শুক্তির অন্তরালে রয়েছে সেই মুক্তাকণা। কি করে উদ্ঘাটন করি সেই অমিয়রতন!

ব্যথা দিয়ে জাগাবো সেই ভালোবাসাকে। আঘাত দিয়ে জাগাবো সেই শৃঙ্খলিত ঝঙ্কার। অখ্যাত অন্ধকারের তপস্যায় জাগাবো সেই অবরুদ্ধ মুকুল।

কিন্তু তার আগে একটু ভোগরাগ দরকার।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলেই বলে, মা যাবো। হৃদের ছেলে পায়রা নিয়ে খেলা করছিল। আয় আয় তি-তি! ডাকছে কত পায়রাকে। যেই খেলায় তৃপ্তি হল, অমনি কাঁদতে আরম্ভ করলে। তখন একজন অচেনা লোক এসে বললে, আমি তোকে মা'র কাছে নিয়ে যাচ্ছি আয়। বলা-কওয়া নেই, উঠে পড়ল তার কাঁধের উপর।'

কিন্তু কই সেই অচেনা লোক যে মা'র খবর দিয়ে নিয়ে যাবে কাঁধে তুলে। ঘরের ঠিকানাই জানি না তো পথের ঠিকানা জানব! তবু যে মুহূর্তে শুনলাম এ আমার মাকে চেনে, নিয়ে যাবে মা'র কাছে, উড়িয়ে দিলাম সব সুখের পায়রা। রিক্ত হলাম লঘু হলাম। পুঁটলি বাঁধার বস্ত্র-খণ্ডটি তুলে দিলাম কর্ণধারের হাতে। বললাম একে কাজে লাগাও, তোমার নৌকোর পাল করো। অচেনা মানুষ অজানা পথ তবু ভয় নেই এতটুকু। কেননা মা যে সর্বব্যাপিনী, চিরপ্রতীক্ষমানা। নৌকো যদি কোথাও ভেড়ে সেই ঘাটেও মা আছেন, আর যদি ডুবে যায় তবে সেই অতলতলেও মা'র কোল। সর্বত্রই তাঁর আশ্রয় তাঁর অঞ্চলছায়া। সমস্ত গতির মধ্যেই তাঁর শান্তি। সমস্ত যবনিকার অন্তরালেই তাঁর প্রতীক্ষা।

সমতল কলকাতা বেড়িয়ে এসে ওঠো এবার মনুমেণ্টে। 'ঈশ্বর আমাদের মনুমেণ্ট।' বললেন রামকৃষ্ণ।

'মনুমেণ্টের নিচে যতক্ষণ থাকো ততক্ষণ গাড়ি-ঘোড়া সাহেব-মেম এই সব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশসমুদ্র—সব ধূধূ করছে। তখন গাড়ি-ঘোড়া বাড়ি-মানুষ এ সব আর ভালো লাগে না—এ সব পিঁপড়ের মতন দেখায়।'

ঐ সিঁড়ি ভাঙাটিই সাধন। ঘোড়া না দেখে সওয়ার দেখাই আসল দেখা। 'ঘোড়ায় চড়ে সওয়ার আসছে। খুব সাজগোজ, হাতে অস্ত্রশস্ত্র।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'কিন্তু এর মধ্যে সত্য কি? ঘোড়া সত্য নয়, সাজগোজ অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়। সত্য হচ্ছে সওয়ার। শেষকালে দেখবে সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে।'

একটি বর্ণারূঢ় চিত্র।

'সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায়।'

ঐ মেঘ হচ্ছে বিষয়বাসনা, ইন্দ্রিয়সুখ। বালিশ-চাপা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন মা। মোহের বালিশ, অহঙ্কারের বালিশ, বিষয়-বিকারের বালিশ। ঘুমের মধ্যে যে কেঁদে উঠি না তা নয়, কিন্তু কান্নার মধ্যেই আবার বালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ি। বালিশকেই মা ভাবি। কিন্তু যদি একবার ছুঁড়ে ফেলতে পারি বালিশ, দূরে ফেলতে পারি মেঘ তখন সেই জাগরণের মুক্তিতে মাকে জাগরিত দেখব, তাঁর বিনিদ্র দুই নয়নে অক্ষান্ত ক্ষান্তি পরিপূর্ণ করুণা।

ছোট্ট একটি গল্প বললেন এখানে :

'ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্তে নেউল থাকে। গর্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ এসে ন্যাজে ইট বেঁধে দেয়—তখন ইটের জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গর্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে—ততবারই ইটের জোরে এসে পড়ে বাইরে। বিষয়চিন্তা এমনি। ইটের ভার। যোগীও যোগভ্রষ্ট হয়।'

কিন্তু কি করে কাটি এই বন্ধন? কোথায় মিলবে সেই নিবন্ধছেদনী কর্তরী?

প্রথমে হও নির্বিকার। শেষে তেজস্বী। সহ্যশক্তি আর পুরুষকার।

'নির্বিকার, হাজার দুঃখকষ্ট বিঘ্নবিপদ হোক, নির্বিকার।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যেমন কামারশালার লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর দ্বিতীয়, পুরুষকার, দারুণ রোখ। কাম-ক্রোধ আমার অনিষ্ট করছে তো একেবারে ত্যাগ। কি রকম? যেমন কচ্ছপ যদি হাত পা ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না।'

তারপর বললেন একটি আশ্চর্য গল্প :

'একজনের পরিবার বললে, তুমি কোনো কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখনো তুমি আমাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারো না। কিন্তু অমুক লোকের ভারি বৈরাগ্য হয়েছে, তার ষোলো স্ত্রী—এক-একজন করে ত্যাগ করছে ক্রমে-ক্রমে। স্বামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা—বললে, ক্ষেপি, সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না। একটু-একটু করে কি ত্যাগ হয়? এই দেখ, আমি ত্যাগ করতে পারব। এই দেখ, আমি চললুম ত্যাগ করে। বাড়ির কোনো গোছগাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গামছা—বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেল। বাড়ির দিকে স্ত্রীর দিকে একবার পিছন ফিরেও চাইল না!'

গল্পটির মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে ঐ "ক্ষেপি" সম্বোধন!

॥ ৫২ ॥

নরেন্দ্রনাথকে বোঝাবার জন্যে উপমার মালা গাঁথছেন রামকৃষ্ণ। যেমন রসে ঠাসা তেমনি শুনতে নতুন। জল-জীয়ন্ত। গ্রাম্য পরিবেশটি থাকার দরুন শ্যামল সজীবতা মাখানো। অকাপট্যে পরিস্ফুট।

'অন্যেরা কলসী ঘটি, নরেন্দ্র জালা।'

'ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘি। যেমন হালদার-পুকুর।'

'আর সবাই পোনা কাঠিবাটা, নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই।'

'বড় ফুটোওলা বাঁশ—অনেক জিনিস ধরে।'

সব গ্রাম্য ছবি। শুধু নরেনের প্রতি স্নেহ নয়, গ্রামের প্রতি মমতা।

অন্যরকমও আছে।

'যেন খাপখোলা তলোয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'ও বসানো শিব নয়, পাতাল-ফোঁড়া শিব।'

'ও পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়—মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।'

'ও পদ্ম মধ্যে সহস্রদল।'

কেশব সেনকে বলেছিলেন, 'ল্যাজ খসেছে।'

বেঙাচির যতক্ষণ ল্যাজ না খসে ততক্ষণ তাকে জলে থাকতে হয়। ল্যাজ খসলে সে জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও থাকতে পারে। অবিদ্যাই হচ্ছে ল্যাজ। অবিদ্যা চলে গেলে মুক্ত হয়েও বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে সংসারেও থাকতে পারে।

বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, 'বিদ্যার সাগর। ক্ষীর-সমুদ্র।' বলেছিলেন, 'আমরা জেলে ডিঙি, আপনি জাহাজ—'

গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন, 'রসুন-গোলা বাটি।'

বাবুরামকে, 'নতুন হাঁড়ি। দুধ রাখলে খারাপ হবে না।'

রাখালের বাপকে বলেছিলেন, 'ওল যদি ভালো হয় তার মুখীটিও ভালো হয়।'

শশধর পণ্ডিতকে পূর্ণচন্দ্র না বলে 'দ্বিতীয়ার চাঁদ।'

দ্বিতীয়ার চাঁদই দিনে-দিনে বাড়ে। পূর্ণচন্দ্র ক্ষয় পায়।

শ্রীমাকে বলেছিলেন, 'ছাইচাপা বেড়াল।'

আর নিজেকে, 'ঢাল নেই তরোয়াল নেই শান্তিরাম সিং।'

সিংহ অথচ শান্ত।

ভানু অথচ অণু।

অণু না থাকলে ভানু দীপ্যমান হত না। পৃথিবীর ধুলোবালি আকাশের দিকে উড়ছে বলেই তো তাকে আশ্রয় করে সূর্য জ্যোতির্ময় হয়েছে। সূর্য যদি সোজাসুজি আমাদের কাছে আসত, কালো দেখাত। আলো দেখাবার জন্যেই তো ধুলোর প্রয়োজন। আমি আছি বলেই তো তুমি প্রতিভাত।

আমি অণু বলেই তো তুমি আমার অনুধ্যানে।

॥ ৫৩ ॥

বাংলা সাহিত্যে একটা বড় রকম ত্রুটি, এতে হাসি কম। কিন্তু রামকৃষ্ণ হাসির রসে ভরপুর। দুরূহকে সহজ করবেন, গম্ভীরকে সরস, না হাসলে তা হবে কেন? হাসতে পারাই তো বন্ধু হয়ে যাওয়া, নিজের অন্তরের কাছে টেনে নিয়ে আসা। হাসিই তো সমস্ত বাণীর নির্মল প্রাণ-শক্তি। একমাত্র সদানন্দ বালকই তো হাসে। আর যে ঈশ্বরের সন্নিহিত সে তো বালক।

'ওরে এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদুর মা তাই বলে, অন্য সাধু কেবল দাঁও-দাও করে; বাবা, তোমার উটি নাই।' বলে এক মজার গল্প ফাঁদলেন :

'এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের বসে শোনবার ভারি ইচ্ছে। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখল যে আসরে প্যালা পড়েছে, তখন সেখান থেকে আস্তে-আস্তে পালিয়ে গেল। খোঁজ নিয়ে জানলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারি ভিড়। সে দুই হাতে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে-ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভালো করে বসে গোঁফে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল।'

আমাদেরও এমনি সস্তায় কিস্তি হাসিলের মতলব। তীর্থকৃত্য করতে এসেও চাই যথাসম্ভব ফাঁকি দিতে। অর্থাৎ যত কম আয়াসে

প্রসাদের বড় ঠোঙাটা হাতানো যায়। নোট পড়ে যেমন পাশ, তেমনি নমো-নমো করে পুজো।

কিন্তু যেখানে আন্তরিকতার অনন্ত আকাশ সেখানেই আমরা আশ্রয় নেব। তুমি যেমন অজস্র প্রশ্রয় মেলে রেখেছ তেমনি আমরাও মেলে ধরব আমাদের নিরবকাশ তন্ময়তা। তোমাকে শুধু দেখব বসে-বসে। তোমার অভিমুখে পথ-যাত্রা করতে না পারি, তোমার উন্মুক্ত আকাশের দিকে মুখ করে যেন বসে থাকতে পারি। তুমি শুধু আমার চলার মধ্যে নেই, আমার বসে থাকার মধ্যেও তুমি। তুমি শুধু প্রয়াস নও, তুমি প্রতীক্ষা।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার ভাব কি জানো? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালোবাসি। মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি, এ সবতাতেই আছি। আবার মুড়ি ঘণ্টতেও আছি, কালিয়া-পোলোয়াতেও আছি।'

বিচিত্রতমকে বিবিধ ভাবে আস্বাদ। যে ভাবেই মাছ রান্না করো সর্বত্রই সেই অমোচ্য আমিষ। আমি সাকারে আছি, নিরাকারে আছি, মন্দিরে আছি, মসজিদে আছি, গির্জায় আছি, গুরুদ্বারে আছি। আবার আছি এই মুক্ত আকাশের অংগনে, আমার হৃদয়ের নিভৃতে। সব পথই পথ, কিন্তু পথটাই ঈশ্বর নয়। আসল হচ্ছে আন্তরিকতা, পথে-রথে এক হওয়া। যদি, 'যাব' এই বাণীটি সত্যিই ব্যাকুল হয়ে ওঠে তবে পথই ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। অন্তর যদি সরল হয়, ভুল পথও সোজা হয়ে উঠবে। 'যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তা হলে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'একদিন-না-একদিন পথে কেউ নিশ্চয় বলে দেবে, ওহে ওদিকে নয়, দক্ষিণ দিকে যাও। তার জগন্নাথ দর্শন হবেই হবে একদিন।'

আন্তরিকতার গুণে ভুলও ফুল হয়ে ফোটে।

'ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়।' তারপর কী পরিহাস-সরস করেই আঁকলেন সেই বালকের ছবিটি!

'বালক কোনো গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। দেখ, তমোগুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তক্ষুনি তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! রজোগুণের বশ নয়। এই খেলাঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল, মা'র কাছে ছুটেছে। হয়তো একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে; খানিক পরে কাপড় খুলে পড়ে

গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় তো কাপড়খানি বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে। যদি ছেলেটাকে বলো, বেশ কাপড়খানি তো, কার কাপড় রে? অমনি বলবে, আমার কাপড়। আমার বাবা দিয়েছে। যদি বলো, লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড়খানি দাও না, অমনি ফোঁস করে উঠবে, ঈস? তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি আর একটি বাঁশি যদি হাতে দাও তা হলে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার সেই ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নেই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালোবাসা, একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না—কিন্তু বাপ-মা'র সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল তখন নতুন খেলুড়ে হল। তাদের উপর ভালোবাসা পড়ল, পুরোনো খেলুড়েদের একরকম ভুলে গেল। তারপর দেখ, জাত-অভিমান নেই। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোলো আনা জানে যে এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয় আরেকজন যদি কামারের ছেলে হয় তো এক পাতে বসে ভাত খাবে।'

এই হচ্ছে বালকের আমি, পাকা আমি। এবারে 'বুড়ো আমি'র ছবি আঁকলেন :

'বুড়োর আমি কাঁচা আমি। সেটা কিরকম জান? আমি কর্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান, ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে! এইসব ভাব! যদি কেউ বাড়িতে চুরি করে, আর তাকে যদি ধরতে পারে, প্রথমে সব জিনিসপত্র কেড়ে নেয়, তারপর উত্তম-মধ্যম মারে, তারপর পুলিশে দেয়। বলে, কি, জানে না! কার চুরি করেছে? যদি কারু উপর আক্রোশ হয় তো সহজে যায় না, হয়তো যতদিন বাঁচে তত-দিন যায় না। যদি বলা যায়, অমুক জায়গায় একটি সাধু আছে, দেখতে যাবে? অমনি নানা ওজর করে বলবে, যাবে না। আর মনে-মনে বলবে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব? সব তমোগুণের খরিদদার। তমো-গুণের লক্ষণ হচ্ছে, অহঙ্কার, ক্রোধ। প্রায় হনুমানের মত।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। লঙ্কা পোড়ালেন, অথচ এ জ্ঞান নেই সীতার কুটিরখানাও নষ্ট হবে।'

'আমি' কি আর যায়? কিছুতেই যায় না। এই যায় তো আবার আসে। তাই বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি একান্তই আমি না যাস, থাক শালা দাস-আমি হয়ে।'

সোঽহং নয়, দাসোঽহং। আমি কর্তা-ভোক্তা কেউ নই, আমি সেবক, আমি পরিচারক।

'আমি বই-টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ মা'র নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নেই তরোয়াল নেই, শান্তিরাম সিং।'

তুমি শান্তি আর আরামের অক্ষয় উৎস। তুমি নরসিংহ। তুমি ভারত-বর্ষের তপোবনে জ্যোতির্ময় পুরাণ পুরুষ। তুমি রাজচক্রবর্তী।

॥ ৫৪ ॥

বদ্ধজীবের কথা আর বোলো না।

'যদি অবসর পায়, হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয়তো মিছে কাজ করে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি; হয়তো সময় কাটে না দেখে তাশ খেলতে আরম্ভ করে! আবার এমনি মায়া যে মৃত্যুশয্যায় শুয়েও যদি দেখে প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বলছে তো বলে, তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও। যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বরচিন্তা করবার সময় পায় না, কেবল পরিবারের পুঁটলি বইতে-বইতে প্রাণ যায়।'

'সকলকেই দেখি, মেয়েমানুষের বশ।' একদিনের ঘটনা বলছেন রামকৃষ্ণ : 'কাপ্তেনের বাড়ি গিছলাম। তার বাড়ি হয়ে রামের বাড়ি যাব। তাই কাপ্তেনকে বললাম, গাড়ি-ভাড়া দাও। কাপ্তেন তার মাগকে বললে। সে মাগও তেমনি—ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বললে যে রামেরাই দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে!'

আবার :

'যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, আজ্ঞে, হ্যাঁ, আমার স্ত্রীটি ভালো। এক জনেরও স্ত্রী মন্দ নয়। সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে।'

কিন্তু সংসারে থেকে সাধন-ভজন করতে হলে সংসারকে ঠাণ্ডা রাখা চাই। সেইটি বোঝাবার জন্যে একটি অপূর্ব কৌতুককর উপমা গাঁথলেন :

'শবসাধন করতে হলে পাশে চাল ভাজা ছোলা ভাজা রাখতে হয়। সাধনার সময় মাঝে-মাঝে ঐ শব হাঁ করে ভয় দেখায়। তখন ঐ চাল

ছোলা ভাজা তার মুখে দিতে হয় মাঝে-মাঝে। শবটা ঠাণ্ডা হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তেমনি সংসারের মধ্যে থেকে সাধন করতে হলে আগে পরিবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবেই সাধন-ভজনের সুবিধে।'

সংসার-কর্তব্যে উদাসীন থাকো, সংসারই দেবে না তোমাকে স্থির থাকতে। আগে ওর ব্যবস্থা, পরে তোমার নির্লিপ্তি।

'ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমন কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিন কুলে কেউ নেই তাকে দিয়ে একটা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে! সেও বেড়ালের মাছ-দুধ ঘুরে-ঘুরে যোগাড় করবে আর বলবে, মাছ-দুধ না হলে বেড়ালটা খায় না, কি করি।'

কী অকিঞ্চিৎকর রঙিন খেলনাতেই ভুলিয়ে রেখেছ! তোমার থেকে বিমুখ করে রেখেছ! আমার দৃষ্টিটি জাগল না, অঞ্জনটি ঠিক লাগল না নয়নে। ঘরের তাপে বাইরে এসে দাঁড়ালুম কতবার, কিন্তু তোমার নীলাম্বর আর চোখে পড়ল না। আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। তুমি যদি আমার দিকে চোখ না ফেরাও, তবে সাধ্য কি তোমাকে দেখি। যেদিকে আসল তুমি সেদিকেই যে পিঠ ফিরিয়ে রয়েছি। যেদিকে চোখ মেলা, সেদিকে শুধু ধু-ধু বালুচর—শুধু দিন-রাত্রির মরুভূমি।

আবার রসিকতা করলেন রামকৃষ্ণ : 'হয়তো বড় বনেদি ঘর। পতি-পুত্তুর সব মরে গেল। কেউ নেই, রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি। তাদের মরণ নেই। বাড়ির এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধ্বসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ—তার সঙ্গে দু-চার গাছা ডেঙ্গো-ডাঁটাও জন্মেছে—রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধছে আর সংসার করছে। কেন? ভগবানকে ডাক না কেন? তা হবে না।'

তুমি যদি না ডাকাও তবে কি করে ডাকি? যদি তুমি না বাজাও হাতে তুলে নিয়ে তবে কি করে বাঁশি হই। আমার জীবনকে যে এত দুঃখে-কষ্টে বিদ্ধ করছ, কি করে বুঝি এ তোমার শিল্পরচনার সূচী-ছিদ্র। এই যে দুর্বহ শূন্যতা, কি করে বুঝি এ তোমারই আলিঙ্গন। তোমাকে আমি দেখি না বলে তুমিও কি আমাকে দেখবে না? ঘরে-বারান্দায় বিজলীর তার আর বাতি বসালেই চলবে না, তোমার হেড-আপিসের সঙ্গে যদি সংস্পর্শ না হয়, তবে যে তিমির সেই তিমির!

আবার পরিহাস করছেন :

'হয়তো বা কারুর বিয়ের পর স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাক না কেন? তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হল। মাথায় কাগাখোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিন্নিপন্না করছেন—সর্বনাশীকে দেখলে পাড়াশুদ্ধু লোক ডরায়! আর বলে বেড়াচ্ছেন—আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না। মর, তোর কি হল তা দ্যাখ—তা না।'

সর্বদা বহিরঙ্গেই আছি, হরি-রঙ্গে থাকি কই? কেবল কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের লোভ, কেবল কৃত্রিমের রূপচর্যা। তোমার পরিচর্যা নয়, নিজের রূপচর্যা। তোমার জন্যে সাধন নয়, নিজের প্রসাধন। কৃত্রিমকে লঙ্ঘন করে চলো যাই সহজের মধ্যে। বলাটাই সহজ, কিন্তু তুমি নিজে যদি না হাত ধরো তবে চলাটাই অসাধ্য। আমি প্রদীপ জেবলে কী করব যদি আমার নয়নই না জ্বালতে পারি?

তাই, ঠিক শিশিরবিন্দুটি না পড়লে পুষ্প বিকশিত হবে না। চাই ঠিক আলোকের চুম্বন। তেমনি যখন তোমার কৃপার বারিবিন্দুটি পড়বে আমার জীবনে, তখনই আমি জাগব, তার আগে নয়। তোমার করুণার মুহূর্তটিই হবে আমার জাগরণের লগ্ন।

এই কথাটিই রামকৃষ্ণ বোঝালেন একটি গ্রাম্য উপমায়। কথাচ্ছলে কথা, তাই গ্রাম্যতাটি উপেক্ষনীয়। আর যাকে গ্রাম্যতা বলছি আসলে সেটি সারল্যের রূপ, অন্য চোখে দেখতে গেলে প্রসাদরম্যতা।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'ছেলে বলেছিল, মা, এখন আমি ঘুমুই, আমার যখন হাগা পাবে তখন আমায় তুলে দিও। মা বললে, বাবা, আমায় তুলতে হবে না। হাগাতেই তোমায় তুলবে।'

যখন আসবে তোমার ডাক, তখন কে আর বাঁধবে আমাকে? সেই ভাবজলতরঙ্গ রোধবন্ধহীন। তখন আরাম-বিরামের সংকীর্ণ শয্যা ছেড়ে চলে আসব ব্যথার মুক্ত-দীপ্ত আকাশের নিচে। তখন যা পেয়েছি তার তুলনায় যা পাইনি তাই বড় হয়ে উঠবে। এতদিন শুধু অনুকূলের দিকেই চলেছি, যা সহজ সুখ সংকীর্ণ আরাম তার দিকে—এখন, তুমি যদি ডাকো, তবে যাব প্রতিকূলের দিকে, যেদিকে দুঃখ, আঘাত, অস্বীকার। এই প্রতিকূলের পথেই তুমি, তুমি যে অকূলে থেকেও প্রতিকূলে! তাই তুমি রিক্ত করে দাও, ভারমুক্ত করে দাও। সরল করে দাও,

হালকা করে দাও। তোমার ডাক যে শুধু চলার ডাক। যদি রিক্ত না হই, ত্যক্তভার না হই তবে চলব কি করে? যদি সরল না হই তবে তোমার দেওয়া ব্যথাটির ব্যাখ্যা সরল হয়ে প্রতিভাত হবে কি করে?

॥ ৫৫ ॥

কাজ করো, কাজের সঙ্গে-সঙ্গে আবার নাম করো।

ভেবো না কাজটি তোমাকে তোমার আপিসের বড়বাবু দিয়েছেন যে তাঁরই নাম করবে।

কাজটি ভগবান পাইয়ে দিয়েছেন। কাজটি তাঁরই। এই বিশ্বসংসারটি তাঁরই আপিসখানা। সুতরাং, তাঁরই যখন কাজ, তাঁরই নাম করো।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'নামের অনন্ত মাহাত্ম্য। তবে অনুরাগ না থাকলে হয় না। ঈশ্বরের জন্যে মন ব্যাকুল হওয়া চাই। মন পড়ে রইল কামকাঞ্চনে অথচ নাম করছি, তাতে কী ফল হবে? রুচি চাই, বিশ্বাস চাই।' বলেই পরিহাসপ্রসন্ন উপমা দিলেন : 'বিছে বা ডাকুর কামড় শুধু মন্ত্রে সারে না, ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়।'

আবার বললেন, 'সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে বিকারের খেয়ালে হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা বলে চেঁচায়। শুকপাখি সহজবেলা বেশ রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধরলেই নিজের বুলি বেরোয়, ক্যাঁ-ক্যাঁ করে।'

তাই নামের সঙ্গে-সঙ্গে অনুরাগ বাড়াও। শুধু একটা অভ্যস্ত নিষ্প্রাণ বুলি নয়, একটা প্রজ্জ্বলন্ত প্রেম-মন্ত্র। যাকে ভালোবাসি তার ডাক-নামটিকে যেন হৃদয়ের সুর দিয়ে ডাকা। সেই ডাকের সংঘর্ষে বাতাস সমীরিত হবে, সঞ্জীবিত হবে সেই নিরুত্তর নিষ্ঠুর কাষ্ঠ। তারই প্রত্যুত্তর একদিন পুষ্পায়িত হবে সেই কাষ্ঠে।

বারবার এই তনু পাবে না, পাবে না এই বিরহবারিভরা মানস-সরোবর। কত তীর্থ তুমি ঘুরে বেড়াবে, তোমার এই মানবদেহেই সেই নবনবীন নরনারায়ণের মিলনতীর্থ। তোমার ধনকাঞ্চন দিয়ে কী হবে, কী হবে তোমার বৈভবভার নিয়ে? এই মানবজন্ম পেয়েছ এইই তো তোমার পরম ঐশ্বর্য। এই যে বুকভরা ব্যাকুলতা পেয়েছ, এই যে পেয়েছ ভালোবাসবার শক্তি, এইই তো তোমার মহান সম্ভাবনা।

নামের সঙ্গে অনুরাগ চাই। ভাষায় কি হবে, চাই প্রচ্ছন্ন ভালোবাসাটুকু। যত পোশাকী ভাষাই ব্যবহার করো না কেন, অন্তরে ঠিক ভালোবাসাটি আছে কিনা এটি ঠিক বুঝতে পারেন অন্তর্যামী।

রামকৃষ্ণ গল্প বললেন, 'একজনের শ্বশুর-ভাশুরের নাম হরি-কৃষ্ণ। এখন হরিনাম তো করতে হবে, কিন্তু হরেকৃষ্ণ বলবার যো নেই। তাই সে জপ করছে :

ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে।
ফরে রাম ফরে রাম রাম রাম ফরে ফরে॥'

অনুরাগ নিয়ে কথা। মাটি যতই শক্ত হোক, যদি অনুরাগের বর্ষণ থাকে, তবে নাম-বীজ, বীজের অংকুর যতই কোমল হোক, মাটি ঠিক ভেদ করে উঠবে।

নামে আর প্রণামে তফাত নেই। নামটি প্রকৃষ্ট হলেই প্রণাম। নম অর্থ যা নামায়, অহংকার থেকে অবিদ্যা থেকে নামায়, নামায় চিরচলার পথে, রিক্ততার পথে উন্মুক্তির আহ্বানে।

যা নমনীয় করে নমস্কারে তাই নাম।

কিন্তু সংসারী লোকদের ব্যবহারটা দেখেছ? বলছেন রামকৃষ্ণ :

'অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, কিন্তু কথা কইতে নেই বলে মুখ বুজে যত রকম ইশারা করতে থাকে। আবার কেউ-কেউ মালা জপ করবার সময় তার ভেতরেই মাছ দর করে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ঐ মাছটা। নারায়ণ পূজা হবে, পূজার আয়োজন সব হচ্ছে—ঈশ্বরের কথাটি নেই, কেবল সংসারের কথা। গঙ্গাস্নান করতে এসেছে, কোথায় ভগবানের চিন্তা করবে, তা না, যত রাজ্যের গল্প জুড়ে দিলে। তোর ছেলের বিয়ে হল, কি গয়না দিলে? কেউ আবার বললে, হরিশ আমার বড় নেওটা। আবার কেউ বললে, মা, দুর্গাপূজো আমি না হলে হয় না! শ্রীটি গড়া পর্যন্ত। দেখ দেখি কোথা গঙ্গাস্নান করতে এসেছে, যত রাজ্যের সংসারের কথা। বিশ্বাস নেই তবু পাখি-পড়ার মত করে যাচ্ছে জপ-তপ।'

আর, গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ কী চমৎকার বললেন :

'গঙ্গাস্নান করলেই পাপমুক্তি হয়, না? কিন্তু আসলে গঙ্গাস্নানের

সময় পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গাতীরের গাছের উপর বসে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠছ অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে।'

আমার পূজা কি বাইরের অনুষ্ঠানে? আমার তো বৃন্তচ্যুত ফুল দিয়ে পূজা নয়, আমার হৃৎসংলগ্ন রক্ত দিয়ে পূজা। আমি মন্দির কোথা পাব, এই দেহই আমার মন্দির। পূজা তো আমার বাইরের বসনে নয়, আমার মেদমজ্জায়। তাই আমার পূজাকে জীবনের সঙ্গে অনুস্যূত করে নিতে হবে। পূজা যদি জীবন থেকে বিযুক্ত হয় সে পূজা অর্থহীন। সে পূজা অপবিত্র। রক্ত যদি দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায় তবে সে রক্তে গতি-শক্তি কই, শুচিতা কই?

আসল হচ্ছে ভালোবাসা। শাখাপল্লব ছেড়ে দিয়ে-দিয়ে বারে-বারেই ফিরে আসতে হচ্ছে মূলে।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'ঈশ্বরের উপর ভালোবাসা এলে কেবল তারই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালোবাসে তার কথা শুনতে ও বলতে ভালো লাগে। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে-বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের সুখ্যাত করে তো অমনি বলবে, ওরে তোর খুড়োর জন্যে পা ধোবার জল আন।'

আবার জের টানলেন :

'যারা পায়রা ভালোবাসে, তাদের কাছে পায়রার সুখ্যাত করলে বড় খুশি। যদি কেউ পায়রার নিন্দে করে, তাহলে বলে উঠবে, তোর বাপ চৌদ্দ পুরুষ কখনো কি পায়রার চাষ করেছে?'

তুচ্ছ উপকরণই রাশীকৃত করছি। আমাদের যেটুকু পূজা সেটুকুও হয়তো ঐ উপকরণেরই লোভে। পূজা করছি পুণ্যার্জনের জন্যে এই লোভবুদ্ধি এসে ঢুকলেই পূজা প্রসাদহীন হবে। ভালোবাসার মধ্যে ঢুকবে এসে ব্যবসায়। উপাসনা তখন রূপা-সোনার নামান্তর হবে।

আধ্যাত্মিকতার সেই অপমৃত্যু থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমার ভালোবাসা সঞ্চয়ে নয় বিসর্জনে। বিনিময়ের ভালোবাসা নয়, বিনি-মূল্যের ভালোবাসা। তোমার আনন্দ যেমন অহেতুক, আমার ভালোবাসাও তেমনি।

তুমি হাতে-হাতে কিছু দেবে তাই তোমাকে ভালোবাসব এ তো হাটের হিসেব। তোমার কাছ থেকে কোনো মূল্যই নেব না অথচ তোমাকে

দেব এইখানেই তো আমার জয়। তুমি আমাকে কণ্টকে বিদ্ধ করবে আর আমি কণ্টকিত বৃন্তে একটি রক্তগোলাপ বিকশিত করব এইখানেই তো আমার ঐশ্বর্য।

॥ ৫৬ ॥

কিন্তু যাই বলো, সময় না এলে কিছু হবার নয়।

কখন যে কি করে সময় ঠিক আসে কেউ জানে না। কেউ জানে না হঠাৎ কোনদিন কি এক বিরল মুহূর্তে মন খারাপ করে বসবে! কবে কোন এক অজানা মুখকে মনে হবে বহু জন্মের পরিচিত। কবে আলোতে, না, অন্ধকারে, হঠাৎ বিশ্বাস করে বসব, আরেকজন কে আছে কাছে বসে।

সমস্ত অবিচারের পর কোথায় যেন একটা বিচার আছে। সমস্ত জমা-খরচের পর কোথায় যেন মিলবে জীবনের হিসেবের অঙ্ক। সমস্ত বিভেদ আর বিরোধের পর আছে কোথাও সামঞ্জস্য। সমস্ত বিতর্কের পর আছে কোথাও সমাধানের শান্তি। সমস্ত জটিল তত্ত্বের দুরূহতা কোথায় যেন একটি সহজ ব্যাখ্যায় তরল হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সেই সরল সময়টি আসা চাই।

তাই কৌতুকচ্ছলে বোঝাচ্ছেন রামকৃষ্ণ :

'ভক্তসঙ্গে কেউ-কেউ এখানে এসেছে নৌকো করে। তাদের ভারি বিষয়বুদ্ধি। তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভালো লাগছে না, কেবল ছটফট করছে। বার-বার ভক্ত বন্ধুটির কানে ফিসফিস করে বলছে, কখন উঠবে, কখন উঠবে? যখন দেখল বন্ধুটি কোনোরকমে উঠল না, তখন বিরক্ত হয়ে বললে, তবে তোমরা কথা কও, আমি নৌকোয় গিয়ে বসি।'

আবার বলছেন :

'যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নেই, তাদের আমি বলি, তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বোসো। অথবা বলি, যাও, বিল্‌ডিং দেখ গে।'

আমরাও এই বিল্‌ডিংই দেখছি। দেখছি ইট কাঠ চুন সুরকি। মেদ-মজ্জা মাংস চর্ম। ধন যশ প্রভাব প্রতিপত্তি। মন্দিরের দেবতাকে দেখি না। দেখি না তাঁকে যিনি প্রাণরূপে প্রতীয়মান, প্রাণরূপে প্রবহমান!

রূপের অন্তঃপুরে দেখি না সেই অপরূপকে। ব্যক্তের মাঝে সেই বচনাতীতকে। আমরা অকৃতার্থ। আমাদের দেখা স্থূলকে দেখা, স্থির-কে দেখা নয়। কিন্তু যাই দেখি, আধার যদি না বড় হয়, তবে কি বেশি জিনিস ধরাতে পারব? রেড়ির তেলের ম্যাড়মেড়ে বাতি হয়ে আলো করতে পারব কি রাজসভা?

যাকে যা দেবার তা কি ঈশ্বর আগে থেকেই ঠিক করে রাখেননি?

'ঠিক করে রেখেছেন।' বলেই একটি মজার গল্প ফাঁদলেন : 'একখানি সরার মাপে শাশুড়ি বৌদের ভাত দিত। তাদের তাতে পেট ভরতো না। একদিন সরাখানি হঠাৎ ভেঙে গেল। তাতে বৌদের ভারি ফুর্তি। তাই দেখে শাশুড়ি বলছে, নাচো কোঁদো বৌমা, আমার হাতের আটকেল ঠিক আছে।'

তোমার কাছে আরো পাব এই তো আমার প্রার্থনা নয়। তোমার কাছে যা পেয়েছি তাই তো আমার অন্তহীন। তবু আরো যদি কিছু চাই সে তোমাকে, তোমার হাতের পারিতোষিককে নয়। কর্ণধারকে, নয় কোনো সম্ভার-ভরা তরণী। নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে চাই তোমার সঙ্গে মহাতরঙ্গে দুলতে। তোমাকে যদি আরো চাই, তার মানে একলা ঘরের অন্ধকারে চাই না, চাই জগদ্ভাসক সূর্যের আলোতে, বিশ্বব্যাপী জীবের জনতায়।

কিন্তু যখনই চাই ঐ কামকাঞ্চনই চেয়ে বসি। রামকৃষ্ণ বললেন আরেকটি মজার কাহিনী :

'কেশব সেন একদিন এসেছিল। রাত দশটা পর্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ-কেউ বললে, আজ থেকে যাব। কেশব বললে, না, কাজ আছে, যেতে হবে। তখন আমি হেসে বললাম, আঁশ-চুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না? একজন মেছুনি মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল, মাছ' বিক্রি করে আসছে, চুপড়ি হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেকরাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। বাড়ির গিন্নি সেই অবস্থা দেখে বললে, কি গো, ছটফট কচ্ছিস কেন? সে বললে, কে জানে বাপু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না! আমার আঁশ-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো? তা হলে বোধহয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁশ-চুপড়ি আনাতে, জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে, ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল।'

একটি নিখুঁত হাসির গল্প। অথচ অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ।

আঁশ-চুপড়ি হচ্ছে কামকাঞ্চনের সংসার। পুষ্পবাস হচ্ছে সাধুসঙ্গ।

রসের সরোবর হচ্ছে সাধু। তরুণ চন্দনতরু। তৃষ্ণার দেশে কলস্বরা জলধারা।

সৎগ্রন্থ তো তবু জোটে, সাধুসঙ্গই দুর্লভ। ঈশ্বরের কথা বলে এমন লোক কজন? কজন তেমনি জ্বলন্ত তলোয়ার? সব কথা পুরোনো হয়ে গেল কিন্তু ঈশ্বরের কথার মাধুর্যস্রোত বেড়েই চলেছে। যার চোখের কালোতে ভালোবাসার আলো ফেললাম, সে কালোর আলো আর শেষ হবার নয়। সেই তো ভঙ্গুর দেহবল্লী, তবু এখনো সেই ব্যাকুলতার বাঁশিই বাজিয়ে চলেছে। সেই ব্যথার সুরে এখনো সেই আনন্দের সুরধুনী।

ভক্ত দেখে ভক্তের বড় আনন্দ।

'গাঁজাখোরকে দেখে গাঁজাখোরের যেমন আনন্দ। হয়তো বা কোলাকুলি করে বসে।'

কেশব সেন বললেন, 'আপনার কাছে এত লোক আসে কেন? একদিন কুটুস করে কামড়ে দেবেন, তখন পালিয়ে যেতে হবে।'

'কুটুস করে কেন কামড়াব? আমি তো লোকদের বলি এও কর ওও কর। সংসারও কর, ঈশ্বরকে ডাকো। সব ত্যাগ করতে বলি না।' বলে পরিহাসস্নিগ্ধ কাহিনী বললেন : 'কেশব সেন একদিন খুব লেকচার দিলে। বললে, হে ঈশ্বর, এই করো যেন আমরা ভক্তি নদীতে ডুব দিতে পারি, আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ি। মেয়েরা সব চিকের আড়ালে ছিল। আমি কেশবকে বললাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে? তা হলে ওঁদের দশা কী হবে? এক-একবার আড়ায় গিয়ে উঠো, আবার ডুব দিও, আবার উঠো।'

তাই তো বারে-বারে উঠে আসি। সাগর ছেড়ে আবার উঠে আসি মাটিতে। নোঙর খুলে দি একবার, আবার নিগড় পরি। তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন শক্তি কোথায়? তোমার সে যে সর্বস্বখোয়ানো প্রেম। তাই খেত বাঁচাবার জন্যে বেড়া বাঁধি। হায়, কত যত্ন করে এই খেতটুকু নির্মাণ করেছি। অন্তত এই খেতটুকু যেন বাঁচে। এখন দেখছি সেই বেড়াই খেতকে খেয়ে যাচ্ছে।

সংসারীদের দেখে তাই রামকৃষ্ণ বলছেন, 'এ একরকম বেশ। সারে

মাতে। সারও আছে মাতও আছে। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। নক্সা খেলা জানো? সতেরো ফোঁটার বেশি হলে জ্বলে যায়। একরকম তাশ খেলা। যারা সতেরো ফোঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি।'

আমরা খুব সেয়ানা। খুব চতুর। আমরা হচ্ছি, যাকে বলে "এনে দাও বসে মারি, তোর বাপের পুণ্যে নড়তে নারি"-র দল। যাকে রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আঠারো মাসে এক বৎসর।' কিন্তু বুদ্ধির দৌড় কতদূর?

॥ ৫৭ ॥

শুধু ষোলো আনা হলে চলবে না, পাঁচ-সিকে পাঁচ-আনা চাই। ভক্তি-বিশ্বাস এমন হওয়া চাই যেন পাত্র ছাপিয়ে যায়। ভক্তি ঈশ্বরের কিরূপ প্রিয়? রামকৃষ্ণ বললেন, 'খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়।'

ভক্তের স্বভাব কি জানো? ব্রাহ্মসমাজের বেচারাম আচার্যকে বলছেন রামকৃষ্ণ : 'আমি বলি তুমি শোনো। তুমি বলো আমি শুনি। তোমরা আচার্য, কত লোককে শিক্ষা দিচ্ছ! তোমরা জাহাজ, আমরা জেলে-ডিঙি।'

'ভক্তদের ঠিক গাঁজাখোরের মত স্বভাব। গাঁজাখোর যেমন গাঁজার কলকেতে ভরপুর এক দম লাগিয়ে কলকেটা অন্যের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে—অন্য গাঁজাখোরের হাতে ঐরূপে কলকেটা না দিতে পারলে যেমন তার একলা নেশা করে সুখ হয় না—ভক্তেরাও তেমনি একসঙ্গে জুটলে একজন ভাবে তন্ময় হয়ে ভগবানের কথা বলে আনন্দে চুপ করে ও অন্যকে আবার ঐ কথা বলবার অবসর দিয়ে শুনে আনন্দ পায়।'

যেন দুজনে এক বই পড়ে আনন্দ পেয়েছে, কিম্বা একই খেলা দেখে। শুধু দেখে আর পড়ে সুখ নেই। এখন চাই কিছু মুখরতা, চাই কিছু স্তব্ধতা। আমি উদ্বেল হয়ে বলি, তুমি শোন। তারপর তুমি বলো আমি শুনি রুদ্ধ নিশ্বাসে।

ভক্তি যদি একবার ধরে, তবে আনন্দরসে মাতাল করে রাখে। ভক্তির আরেক নাম হরিরসমদিরা। 'হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।' শোনা যায়, গিরিশ ঘোষকে রামকৃষ্ণ নিজের হাতে গ্লাশে মদ ঢেলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুই এ নেশা করছিস কেন না তুই আরেক নেশার

খবর পাসনি বলে। যখন তোকে সে নেশা পেয়ে বসবে তখন দেখবি এ নেশা কোন ছার!'

এবার একটি মজাদার কাহিনী জুড়লেন রামকৃষ্ণ যখন দেখলেন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার, যিনি বিজ্ঞানের বাইরে আর কোনো বিস্ময় আছে বলে মানতে রাজী নন, হরিনাম গান শুনে ভাববিভোর হয়েছেন।

'ছেলে বলেছিল, বাবা একটু মদ চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বলো তো ছাড়া যাবে। বাবা খেয়ে বললে, তুমি বাছা ছাড়ো আপত্তি নেই—কিন্তু আমি ছাড়ছি না।'

শুধু পুঁথি পড়ে কী হবে? ভক্তি চাই। চাই অন্তরের টান।

'লম্বা-লম্বা কথা বললে কী হবে?' তাই বলছেন রামকৃষ্ণ : 'বাণ-শিক্ষা করতে গেলে আগে কলাগাছ তাগ করতে হয়—তারপর শরগাছ—তার পর সলতে, তার পর উড়ে যাচ্ছে যে পাখি—'

সামাধ্যায়ী পণ্ডিত অনেক ব্যাখ্যার পর বললে, ঈশ্বর নীরস।

'একজন বলেছিল,' রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। গোয়ালে কি ঘোড়া থাকে?' তেমনি ঈশ্বরে কি থাকতে পারে নীরসতা?

কথাটা হচ্ছে, অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্।

বললেন রামলালকে, 'হ্যাঁরে রামলাল, হাজরা ওটা কি করে বলেছিল? অন্তস্ বহিস যদি হরিস? যেমন একজন বলেছিল মাতারং ভাতারং খাতারং—অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।'

শুধু শব্দের আড়ম্বর। পাণ্ডিত্যের জড়পিণ্ড।

'যত গোলমেলে কথা।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'শাস্ত্র পড়ার দোষই ওই, তর্ক-বিচার এনে ফেলে।' শশধর পণ্ডিত কাছেই ছিলেন। বললেন, 'আজ্ঞে উপায় কি কিছু নেই?'

'তুমি তো ছানাবড়া হয়ে আছ। এখন দু-পাঁচ দিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভালো, পরের পক্ষেও ভালো। দু-পাঁচ দিন।'

শশধর বললেন, 'ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে।'

'না, না, আরশুলার রঙ ধরেছে।'

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্বন্ধেও এই উক্তিই করেছিলেন রামকৃষ্ণ : 'আহা! শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে ফেলা ছানাবড়া!'

কিন্তু যাই হও, একটাতে দৃঢ় হও। হয় সাকারে নয় নিরাকারে।

হয় এ ভাবে নয় ও ভাবে। বিশ্বাসের যখন বায়ুবেগ তখন তা ব্যাকুলতা, আর ব্যাকুলতা যখন স্থির তখনই তা দৃঢ়।

বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জানো? 'সব ভাসা-ভাসা। যেমন,' মজাদার দৃষ্টান্ত দিলেন রামকৃষ্ণ : 'যেমন, খুড়ি-জেঠির কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, আমার ঈশ্বরের দিব্য, আর যেমন কোনো ফিটবাবু পান চিবুতে-চিবুতে স্টিক হাতে করে বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, ঈশ্বর কী বিউটিফুল ফুল করেছেন! কিন্তু বিষয়ীর এই ভাব ক্ষণিক, যেন,' এবার গম্ভীর উপমা দিলেন : 'যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।'

আমি ভাসব না, আমি ডুবে যাব তলিয়ে যাব। এক ডুবে রত্ন না পেলে রত্নাকরকে রত্নহীন ভাবব না। আমি সম্পূর্ণ নিজেকে ছেড়ে দেব, ঢেলে দেব, মেলে দেব। তিনিও কি দেননি মেলে, দেননি ঢেলে? তেমনি যেমন করে দিয়েছেন আমিও তেমনি করে দেব। কোনো ফাঁক রাখব না। একটি মুহূর্তের ধ্যানে তন্ময় না হয়ে সমস্ত জীবনকে একটি মুহূর্তে সংহত করে তাঁতেই আবিষ্ট, আবিদ্ধ হয়ে থাকব। যা ভাবছি তাঁর ভাবনাই ভাবছি, যা ভুগছি তাঁকেই ভোগ করছি, যা করছি সব তাঁরই করণীয়।

কেশব সেন বললে, 'মশায় যদি কেউ বিষয়-আশয় ঠিকঠাক করে ঈশ্বর চিন্তা করে—তা পারে না?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়ো, আত্মীয় কাল-সাপের মত বোধ হয়। তখন টাকা জমাবো, বিষয় ঠিকঠাক করবো এসব হিসেব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু এই চিন্তাই পেয়ে বসে।' বলে একটি গল্প ফাঁদলেন : 'একটি মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটি কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে—তারপর ওগো, আমার কী হল গো, বলে আছড়ে পড়লো, কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙে যায়।'

॥ ৫৮ ॥

তারপর সেই দুই বেয়ানের গল্প শোনো। ঘরের বেয়ান আর বাইরের বেয়ান।

"ঘরের বেয়ানের সঙ্গে বাইরের বেয়ান দেখা করতে এসেছে। ঘরের বেয়ান তখন সুতো কাটছিল, নানারকমের রেশমের সুতো। বাইরের বেয়ানকে দেখে তার আনন্দ আর ধরে না। বললে, 'তুমি এসেছ, আজ আমার কি আনন্দের দিন, যাই তোমার জন্যে কিছু জলখাবার আনিগে।' জলখাবার আনতে গেছে, সেই সুযোগে সুতো দেখে বাইরের বেয়ানের লোভ হয়েছে—রঙ-বেরঙের সুতো। কি করি, কি করি—হঠাৎ একতাড়া সুতো বগলে করে লুকিয়ে ফেললে। জলখাবার নিয়ে এসে ঘরের বেয়ান ঠিক বুঝতে পারল বাইরের বেয়ান সুতো সরিয়েছেন। তখন সে বললে, 'বেয়ান, অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে আজ দেখা। বড় আনন্দের দিন আজ। আমার ভারি ইচ্ছে করছে দুজনে নৃত্য করি।' তথাস্তু। দুই বেয়ানে নৃত্য করতে লাগল। তখন ঘরের বেয়ান বললে, 'এ নৃত্য ঠিক হচ্ছে না। এস হাত তুলে নাচি। হাত না তুলে নাচলে আবার নাচ কি!' বাইরের বেয়ান এক হাত তুলে নাচতে লাগল। আর এক হাতে বগল টেপা। ঘরের বেয়ান বললে, 'এও ঠিক হচ্ছে না। এস দু হাত তুলে নাচি। দু হাত তুলে নাচ না হলে আবার নাচ! এই দেখ আমি দু হাত তুলে নাচছি।' ঘরের বেয়ান দু হাত তুলে দিলেন। কিন্তু বাইরের বেয়ান বগল টিপে এক হাত তুলেই নাচতে লাগল, আর বললে, 'যে যেমন জানে ব্যান।'"

আমরাও যেমন জানি। বগলের নিচে যত পেরেছি চেপেছি প্রাণপণে। টাকা-কড়ি বাড়ি-গাড়ি লোক-লস্কর দলিল-দস্তাবেজ—রঙ-বেরঙের সুতো। আর এক হাত তুলে দিয়েছি তোমার দিকে। যে হাতে সুতো চেপেছি সে হাত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে বলে যে হাত তুলে দিয়েছি সে হাতও সঙ্কুচিত। অর্থাৎ পার্থিব সঞ্চয়ের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছি বলে তোমার দিকে সম্পূর্ণ প্রসারিত হতে পারি না। তোমাকে ধরবার একটা ভান করি মাত্র। আসল মন বগলের নিচে, সেই আড়ষ্ট অনড়, হাতের দৃঢ়তার দিকে। সেই কারণে অন্য হাতের উত্তোলনের মধ্যে ছলনাই ষোলো আনা। আর যা সব পুরেছি বগলের নিচে, বিদ্যা-বিত্ত, মান-যশ, পুত্র-কন্যা—কিছুই আমার নিজের নয়, সব চোরাই মাল!

তাই নাচতে যদি চাও, দু হাত ছেড়ে দিতে হবে। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বোঁচকা বেঁধেছিলে তাই খুলে এবার নৌকোয় পাল খাটাও।

'আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না।' বললে রামকৃষ্ণ : 'আমি দু হাত ছেড়ে দিয়েছি।'

এক হাত ছাড়লে এড়িয়ে বেড়াও। দু হাত ছাড়লেই জড়িয়ে ধরো।

কিন্তু আমরা 'কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর' হয়ে আছি।

'সে জানো না বুঝি?' বললেন রামকৃষ্ণ : 'বাড়িতে এক-একজন পুরুষ থাকে, মেয়েছেলেদের নিয়ে থাকে রাত দিন, আর বাইরের ঘরে বসে ভুড়ুর-ভুড়ুর করে তামাক খায়। নিষ্কর্মার শিরোমণি। তবে কখনো-কখনো বাড়ির ভিতর গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই ছেলেদের দিয়ে বলে পাঠায়, বড়ঠাকুরকে ডেকে আনো। কুমড়োটা দুখান করে দেবেন। তখন সে এসে কুমড়োটা দুখান করে দেয়। এই পর্যন্ত পুরুষত্ব। তাই নাম হয়েছে "কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর"।'

এমনি করেই কি অপদার্থ হয়ে থাকব? শুধু অসার কুমড়ো নয়, কাটতে পারি যে জন্মমৃত্যুবন্ধন তা দেখাব না?

'চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার কেউ ঈশ্বরকে জানতে পারে, তা হলে ওসব হাবজা-গোবজা জিনিস জানতে ইচ্ছে হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে, আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে, আমি এক জালা জল খাবো রে। বৈদ্য বলে, খাবি? আচ্ছা খাবি। এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে কি বলবে তারই জন্যে অপেক্ষা করে।'

পশুপতি বললে, 'আমাদের বিকার বুঝি চিরকাল থাকবে?'

'কেন ঈশ্বরেতে মন রাখো, চৈতন্য হবে।'

'আমাদের ঈশ্বরের যোগ ক্ষণিক। তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে।'

'তা হোক।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'ক্ষণকাল যোগ হলেও মুক্তি।'

সেই ক্ষণকালটিই শাশ্বত। শুভক্ষণ একটি প্রগাঢ় শুভদৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতেই সমস্ত জীবন আভাময় হয়ে উঠুক। প্রতিদিনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে থাক একটি অর্থময় পরিপূর্ণতা। আসলে মন নিয়ে কথা। যে রঙে ছোপাও সেই রঙে ছুপবে। যদি উন্মন হবার রঙটি একবার মনে লাগাও তাহলেই হল! ফুলকে যদি মন বলে সুন্দর, তা হলে মনও সুন্দর। যদি প্রভাতের আলোকে মন বলে আনন্দময়, তা হলে সে আনন্দ মনে।

রামকৃষ্ণ রসিকতা করলেন : 'মন ধোপা ঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজে ছোপাও সবুজ। দেখ না যদি একটু ইংরিজি পড় তো মুখে অমনি ইংরিজি কথা এসে পড়বে। ফুটফাট ইট-মিট। আবার পায়ে বুট জুতো, শিশ দিয়ে গান করা—এইসব এসে জুটবে। আবার পণ্ডিত যদি সংস্কৃত পড়ে, অমনি শোলোক ঝাড়বে।'

আবার বললেন, 'যে কালো পেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে নিধুবাবুর টপ্পা শুরু হয়েছে। রোগা লোকও যদি বুট জুতো পরে, শিশ দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ, কাগজ-টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস-ফ্যাস করে টান দিতে থাকে।'

তেমনি অন্তরে যদি ঈশ্বরসঙ্গের সুধা থাকে তবে বচনে-ব্যবহারে শুধু সেই স্বাস্থ্যের সৌরভ পড়বে ছড়িয়ে। সেই কান্তির মঙ্গল জ্যোতি।

কিন্তু যদি থাকে টাকার অহঙ্কার, তা হলে ঝাঁজ কিছুটা বেরিয়ে আসে।

'এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করত। বাইরে বেশ বিনয়ী। একদিন আমরা কোন্নগর গেছলুম, আমি আর হৃদে।' গল্প বলছেন রামকৃষ্ণ। 'নৌকো থেকে যাই নামছি দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে। হাওয়া খাচ্ছে বোধ হয়। আমাদের দেখে বলছে, কি ঠাকুর! বলি আছ কেমন? তার কথার স্বর শুনে হৃদেকে বললাম, ওরে হৃদে, এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এ রকম কথা। হৃদয় হাসতে লাগল।'

টাকা হয়েছে তো হোক না! মনে কোরো না এ তোমার ঐশ্বর্য। এ ভগবানের ঐশ্বর্য। এ ভগবানের কৃপা। অতএব আসক্তিশূন্য হও। তাঁকে পাওয়াই সব পাওয়া। তাঁর দেশই সব-পেয়েছির দেশ।

॥ ৫৯ ॥

বিশ্বম্ভরের মেয়ে, ছ-সাত-বছর বয়েস, প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে। বললে অভিমানের সুরে, 'আমি তোমায় নমস্কার করলুম, দেখলে না!'

'কই দেখিনি তো!' বললেন রামকৃষ্ণ।

'তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি।' বললে সেই বালিকা। 'দাঁড়াও, এ পা-টা করি।' রামকৃষ্ণ আভূমি মাথা নুইয়ে কুমারীকে প্রতিনমস্কার করলেন। বললেন, 'গান জানো? গান গাও।'

মেয়েটি বললে, 'মাইরি, গান জানি না।'

রামকৃষ্ণ আবার অনুরোধ করলেন।

'মাইরি বললে আর বলা হয়?'

নিজেই তখন গান শোনাতে বসলেন রামকৃষ্ণ। 'আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি। তোর ভাতার এলে বলবে কি।'

বালকস্বভাব আনন্দময় রামকৃষ্ণ।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দেখলেন সেবার। স্নান সেরে যাত্রাওয়ালারা রামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছে। যে ছেলেটি বিদ্যা সেজেছিল তার অভিনয় খুব ভালো লেগেছে রামকৃষ্ণের। বললেন, 'তোমার অভিয়নটি বেশ হয়েছে। যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে কি একটা কোনো বিদ্যাতে ভালো হয়, সে যদি চেষ্টা করে, শিগগিরই ঈশ্বর লাভ করতে পারে। তোমার কি বিয়ে হয়েছে? ছেলেপুলে?'

'আজ্ঞে একটি কন্যা গত। আরো একটি সন্তান হয়েছে।'

'এর মধ্যে হোল-গেল! তোমার এই কম বয়স। বলে, সাঁজ সকালে ভাতার মলো কাঁদিব কত রাত!'

পরে আবার বললেন, 'সংসারে সুখ তো দেখছ! যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া। যাত্রাওয়ালার কাজ করছ, তা বেশ! কিন্তু বড় যন্ত্রণা! এখন কম বয়স তাই গোলগাল চেহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে। যাত্রা-ওয়ালারা প্রায় ঐ রকম হয়। গাল-তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা—'

আবার বলছেন, 'অর্থই আবার অনর্থ। ভাই-ভাই বেশ আছ, কিন্তু হিস্যে জুটলেই গোল। কুকুররা গা-চাটাচাটি করছে, পরস্পর বেশ ভাব। কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত দুটি ফেলে দেয় তা হলেই কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যাবে।'

যেখানে লাভ করতে যাই সেইখানেই লোভ এসে পড়ে। যেখানে ভালো-বাসতে যাই সেখানে ত্যাগ। সূচ্যগ্রভূমি নিতে গেলেই শুরু হয় কুরুক্ষেত্র। আর যদি ভালোবাসা দিতে যাই হৃদয়ে-হৃদয়ে আসমুদ্র রাজ্যবিস্তার।

'কিসে কি হয় বলা যায় না।' বললেন মহেন্দ্র সরকার। 'পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরি কাশি। আমি দেখতে গেছলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না। শেষে জানতে পারলুম গাধা ভিজেছিল। যে গাধার দুধ সে মেয়েটি খেত—'

'কি বলে গো!' রামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন: 'তেঁতুল তলায় আমার গাড়ি গেছল—তাই আমার অম্বল হয়েছে।'

এই মহেন্দ্র সরকারকেই রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'শালা যেন গরুর জিভ

টিপলে!' অসুখের স্থানটি দেখতে চেয়েছিল ডাক্তার। তাই এই হাসি-মেশানো যন্ত্রণা-বেঁধা কথা।

ভগবান ডাক্তার বললে, 'তিনি বোধহয় ইচ্ছে করে এমন করেননি।'

'না, না, তা নয়, খুব ভালো করে দেখবে বলে টিপেছিল! কিন্তু শালা যেন গরুর জিভ টিপলে।' একটি যন্ত্রণার সঙ্গে একটি স্নেহ এসে মিশেছে। স্নেহ যখন মেশে তখন আর কাতরতা নেই, প্রসন্নতা।

নরেনকে বললেন, 'একটু গা না।'

নরেন বললে, 'ঘরে যাই অনেক কাজ আছে।'

'তা বাছা আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে সোনা, তার কথা আনা-আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না।'

'বলছেন যন্ত্র নেই, শুধু গান—' নরেন ফের আপত্তি করল।

'আমাদের বাছা যেমন অবস্থা। এইতে পারো তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত।'

এবার বলরামের একটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ।

'বলরাম বলে, আপনি নৌকো করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ি করে আসবেন। খ্যাঁট দিয়েছে, তাই আজ বিকেলে নাচিয়ে নেবে। এখান থেকে একদিন গাড়ি করে দিছলো—বারো আনা ভাড়া। আমি বললাম, বারো আনায় দক্ষিণেশ্বর যাবে? তা বলে, ও অমন হয়। গাড়ি রাস্তায় যেতে-যেতে একধার ভেঙে পড়ে গেল। আবার ঘোড়া মাঝে-মাঝে থেমে যায় একেবারে। কোনো মতে চলে না। গাড়োয়ান এক-একবার মারে, তখন এক-একবার দৌড়োয়। তারপর রাম খোল বাজাবে, তাতে আবার তালবোধ নেই। বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো।'

'বলরামের আয়োজন কি জানো? বামুনের গোড্ডি খাবে কম, দুধ দেবে হুড়হুড় করে। বলরামের ভাব, আপনারা গাও আপনারা বাজাও।'

তারপর ছবি দেখ জয়গোপাল সেনের :

'সে দিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া, মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতাল ফেরত দারোয়ান। আর এখানের জন্যে নিয়ে এল দুটো পচা ডালিম।'

শুধু রসিকতা নয়, নিপুণ কথাশিল্প।

কেশব-বিজয়ের ঝগড়া নিয়ে বলছেন : 'তোমাদের ঝগড়া বিবাদ, যেন শিব-রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধ হল, দুজনে ভাবও হল। কিন্তু

শিবের ভূত-প্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো—ওদের ঝগড়া-কিচকিচি আর মেটে না।' আবার বললেন, 'জানো, মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। মা'র মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল যেন আলাদা!'

মহিমাচরণকে দেখে বলছেন, 'এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! এমন জায়গায় ডিঙ্গি-টিঙ্গি আসতে পারে। এ যে একেবারে জাহাজ!'

বিদ্যাসাগরকেও বললেন ঐ কথা।

'আমরা জেলে ডিঙি। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ। কি জানি চড়ায় পাছে লেগে যায়!'

বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন : 'বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!' বঙ্কিম বললেন, 'আর মশায়! জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।'

'তুমি কি বুঝছ না মনের ভাব?' বললেন মহেন্দ্র সরকার : 'কত কষ্ট করে তোমায় এখানে দেখতে আসছি!'

'না গো, মূর্খের জন্যে কিছু বলো। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায়নি। বলেছিল, রাম, তোমাকে পেয়েছি, আবার রাজা হয়ে কি হবে! রাম বললেন, বিভীষণ, তুমি মূর্খদের জন্যে রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হল—তাদের শিক্ষার জন্যে রাজা হও।'

মহেন্দ্র সরকার প্রশ্ন করলেন : 'এখানে তেমন মূর্খ কই?'

বললেন রামকৃষ্ণ : 'নাগো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়িগুগলিও আছে।'

ডাক্তার দুটি গ্ল্যবিউল দিলেন রামকৃষ্ণকে। বললেন, 'এই দুটি গুলি দিলাম, পুরুষ আর প্রকৃতি।'

'হ্যাঁ, ওরা একসঙ্গেই থাকে।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'পায়রাদের দেখনি? তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ।'

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা গান গাইছে। 'তোমরা গান গাচ্ছিলে, ভালো হয় না কেন? কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল—এ তাই।'

'নটবর গোস্বামীর বাড়িতে ছিলাম। সেখানে রাত-দিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল-করতাল নিয়ে গেছে। "তাকুটি" "তাকুটি" করছে। রব উঠে গেল, সাতবার মরে সাতবার বাঁচে,

এমন এক লোক এসেছে। পাছে সর্দি-গরমি হয়, হৃদে টেনে নিয়ে যায় মাঠে। সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল-করতাল—তাকুটি, তাকুটি।

সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল আমরা বুঝি তাদের পাওনা-গণ্ডা নিতে এসেছি। দেখলে, আমি একখানা কাপড় কি একগাছা সুতোও নিই নাই। কে বলেছিল, ব্রহ্মজ্ঞানী। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিগগেস করলে, এর মালা-তিলক নেই কেন? তাদেরই একজন বললে, নারকোলের বেল্লো আপনা-আপনি খসে গেছে।'

জ্ঞান হলেই খসে যাবে উপাধি। প্রেম হলেই খসে যাবে আবরণ।

এই সব বর্ণনায় রামকৃষ্ণের যে প্রফুল্ল-নির্মল মনোমোহন মূর্তিটি দেখতে পাই এইটিই হচ্ছে তাঁর সরল-সাধনার পরিচয়। যে হাসতে জানে সেই বাঁচতে জানে—বাঁচাতেও জানে। তুলতে পারে তিক্ততার কাঁটা। উড়িয়ে দিতে পারে মনোমালিন্যের মেঘ। হাসির ছিটে দিয়ে শোধন করতে পারে মনের মণ্ডপ। মণ্ডপের সামনে মন্দির। হাসির দেউড়ি পেরিয়েই আনন্দ-ময়ের আয়তন।

॥ ৬০ ॥

যে সমন্বয় করেছে সেই লোক।

হাসির মধ্য দিয়েই মেলালেন রামকৃষ্ণ।

'বৈষ্ণবচরণকে অনেক সুখ্যাত করে আনালুম সেজবাবুর কাছে। সেজ-বাবু খুব খাতির-যত্ন করলে। রূপোর বাসন বের করে জল খাওয়ানো পর্যন্ত। তারপর সেজবাবুর সামনে বলে কি, আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না। সেজবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।'

আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি! একটি কৌতুককুশল পরিচ্ছন্ন মনের স্বাচ্ছন্দ্য।

'শ্রীমদ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐ রকম কথা আছে। কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, কুকুরের ল্যাজ ধরে পার হওয়াও তা।' একটু গম্ভীর হলেন কি রামকৃষ্ণ? 'সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই

বড় করে গেছে।' পরে একটি হাসির রসস্রোতে সবাইকে মিলিয়ে দিলেন, ভাসিয়ে দিলেন।

'শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন—শাক্তরা বলে, তা তো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী, তিনি কি আপনি এসে পার করবেন? ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্যে।'

সবাই হেসে উঠল।

'নিজের-নিজের মত নিয়ে আবার অহঙ্কার কত!' পরিহাসের ধারাটি ঠিক টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। 'শ্যামবাজারের তাঁতীদের মধ্যে অনেক বৈষ্ণব। তাদের লম্বা-লম্বা কথা। বলে, ইনি কোন বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু! ও আমরা ছুঁই না। কোন শিব? আমাদের আত্মারাম শিব। কেউ আবার বলছে, তোমরা বুঝিয়ে দাও না কোন হরি মানো? তাতে কেউ বলছে, না, আমরা আর কেন, ঐখান থেকেই হোক! এদিকে তাঁত বোনে, আবার এ সব লম্বা-লম্বা কথা।'

আমি সব মানি, সব টানি, সকলকে মিলিয়ে দিই।

আমার নিখিলের দরজায় কোথাও খিল পড়েনি। সর্বপথেই তিনি আমার পাথেয়, সর্বজীবনে তিনিই আমার নিশ্বাস-সমীর। বিশ্বের প্রাঙ্গণে তিনিই নানা বিশেষত্বের বৃক্ষচ্ছায়া। আমি আছি সমতায়, সামঞ্জস্যে। সমস্ত ছায়ার অন্তরালে একই সূর্যদীপ্তি তারই উজ্জ্বল উল্লেখে। যিনি পরিকীর্ণ হয়েছেন তিনিই পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। যিনি আগুন তিনিই কণা-কণা স্ফুলিঙ্গ। যিনি তরঙ্গ তিনিই বিন্দু-বিন্দু বুদ্বুদ। যিনি প্রাণস্বরূপ তিনিই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হৃৎস্পন্দন।

তাই যখন বিজনে আছি আছি তাঁর ধ্যানে, যখন সজনে থাকি আছি তাঁর স্নানস্পর্শে। যখন অন্তরে আছি আছি তাঁর স্মরণে, যখন বাইরে আসি থাকি তাঁর পাশে-পাশে, ছুটি তাঁর পিছু-পিছু। স্মরণেও তিনি অনুসরণেও তিনি। সীমানির্মাণেও তিনি, তাঁর নিবিড়তা; সীমালঙ্ঘনেও তিনি, তাঁর নির্মুক্তি। তিনিই একমাত্র অনতিক্রম্য। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সমস্ত মত্ততার পর তিনিই একমাত্র অপ্রমত্ত শান্তি। অব্যাহত সমন্বয়।

কিন্তু কে চেনে তোমাকে? আমরা সব বেগুনওয়ালা। হীরের মূল্য বুঝি এমন সাধ্য কই?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'বেগুনওয়ালাকে হীরের দাম জিগগেস করেছিল।

সে বললে, আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি। এর একটাও বেশি দিতে পারি না।'

ঈশ্বর অনন্ত হোন আর যাই হোন, তাঁর যা সারবস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে। তাই তিনি অবতার। অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা মেটে কই? জীবের প্রয়োজনে অবতার। পরিহাস-পরিচ্ছন্ন উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ। 'কি রকম জানো? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকেই ছোঁয়া হয় বটে। শিঙটা ছুঁলেও গাইকে ছোঁয়া, ল্যাজটা ছুঁলেও তাই। কিন্তু গরুর সারবস্তু হচ্ছে দুধ, সেটি আসে বাঁট দিয়ে।'

মহিমারঞ্জন বললে, 'দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে।'

'কিন্তু বাছুর প্রথম-প্রথম এদিক-ওদিক ঢুঁ মারে,' বললেন বিজয়কৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ বললেন শেষ কথা। 'আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ রকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়।'

তুমিই ধরিয়ে দাও তোমাকে। তুমি প্রকাশ, তুমিই প্রকাশিত হও আমার হয়ে। তুমি যদি না প্রকাশিত হও তবে এই প্রেম যে অকৃতার্থ হয়ে যাবে। তুমি যে শুধু নক্ষত্রদ্যুতিতে নও, আছ আমার নয়নদ্যুতিতে এই অনুভবটি জীবনে প্রদীপ্ত করে তোলো। তুমি অন্তরে আছ বলেই বাইরে তোমাকে দেখি, দাও সেই দৃষ্টির বিমুক্তি। তুমিই তোমাকে চিনিয়ে দাও। তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই কিছু নেই দাও সেই দ্বারহীন উদার উপলব্ধি।

'যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত তার ছুঁতে হয় না।'

তাই একটিমাত্র বিন্দুতেই অনন্তকে দেখি। একটি শিশিরবিন্দুতে পরিপূর্ণ নীলাম্বর। একটি অশ্রুবিন্দুতে তোমার আনন্দঘন মুখচ্ছবি। নির্জন দীর্ঘশ্বাসের মুহূর্তে একটি নিবিড় নৈকট্যের আশ্বাস।

রামকৃষ্ণ বললেন কেশবকে, 'কেশব, তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের বলছিলুম এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন।' কেশব হাসল। বললে, 'আপনি কতদিন এরূপ গোপন থাকবেন? ক্রমে এখানে লোকারণ্য হবে।'

'ও তোমার কি কথা! আমি খাই-দাই থাকি. তাঁর নাম করি। লোক

জড়ো করা আমি জানি না। কে জানে তোর গাঁইগ‍ুঁই, বীরভূমের বাম‍ুন ম‍ুই।'

'আচ্ছা আমি লোক জড়ো করব। কিন্তু আপনার এখানে সকলের আসতে হবে।'

'আমি সকলের রেণ‍ুর রেণ‍ু।' এইখানেই রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ : 'যদি দয়া করে আসবেন, আসবেন।'

আমি যদি দয়া করে তোমার কাছে আসি! কিন্তু তুমি যদি দয়া করে না টানো যাই কি করে? তোমার দয়া কি করে চাইতে হবে সেইট‍ুকুই শিখিয়ে দাও দয়া করে।

সাধ‍ুসঙ্গ না হলে জীবন নীরস লাগে! সেইটিই বলছেন সরস করে : 'গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্য লোক দেখলে মাথা নিচু করে চলে যায়, বা ল‍ুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ! হয়তো কোলাকুলি করে। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।'

কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরান‍ুরাগটি না থাকলে সবই তেতো।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'সাধ‍ুর কমণ্ডল‍ু চার ধাম ঘ‍ুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতোই থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে সব চন্দন হয়ে যায়। কিন্তু শিম‍ুল, অশ্বথ, আমড়া—এরা আর চন্দন হয় না।'

আগাছা হয়ে আছি, হয়তো বা এরণ্ড। তব‍ু তোমার মলয় পাহাড়ের হাওয়া আমার গায়ে লাগ‍ুক। আমি নিজে না চন্দন হই, চন্দন যে হওয়া যায় এ আনন্দের সংবাদটিতে অন্তত বিশ্বাস করি। অসার হয়ে আছি বলেই এবার নিঃসাড় হয়ে রইলাম। কিন্তু তোমার স্পর্শে, কে জানে, অঘটন ঘটে যেতে পারে। ঘর্ষণে যদি আগ‍ুন বেরোয়, স্পর্শনে কি সৌরভ জাগবে না? ধ‍ূলিম্লান হয়ে পড়ে আছি, কিন্তু তোমার পদধ‍ূলি যদি মাথায় নিতে পারি, যাবে না কি মালিন্য?

॥ ৬১ ॥

'আমি সংসার ত্যাগ করে চলল‍ুম। একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল।' বলছেন রামকৃষ্ণ। 'স্ত্রীটি একট‍ু জ্ঞানী। বললে, কেন তুমি ঘ‍ুরে-ঘ‍ুরে

বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও।'

ঘর তো ছাড়বে কিন্তু দেহ-গেহ ছাড়তে পারবে?

কিন্তু সংসারে যারা আছ তারাও তো কামিনীকাঞ্চনের অধীন। কত রঙ্গরসই করেছেন রামকৃষ্ণ :

'হ্যাঁ গা, লোকে বলে খেটে-খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে বসলে নাকি খুব আনন্দ হয়?' হাসলেন রামকৃষ্ণ : 'মা বলে ছেলের একটা গাছতলা করে দিলে বাঁচি। রোদে ঝলসাপোড়া হয়ে গাছতলায় বসবে।'

শুধু স্ত্রী নয়, বড়বাবুর আবার গোলাপী আছে।

'বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম, কিন্তু করে দিচ্ছে না। একজন বললে, গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম হবে। উমেদার তখন দেখা করে বললে, মা, তুমি এটি না করলে হবে না। ব্যস্, গোলাপী ধরলে বড়বাবুকে। আর যায় কোথা! পরদিনই বড়বাবুর আফিসে বেরুতে লাগল উমেদার। বড়বাবু বললে এ খুব উপযুক্ত লোক, এর দ্বারা আফিসের বিশেষ উপকার হবে।'

এ আবার একটি করুণ বর্ণনা :

'আবার কারু-কারু স্ত্রীকে আগলাতে-আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। পাঁড়ে জমাদার খোট্টা বুড়ো—তার চৌদ্দ বছরের বউ। বুড়োর সঙ্গে তার থাকতে হয়। গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে-খুলে লোকে দেখে। এখন মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে।'

সাধু কপনি নিয়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভার্যা নিয়ে।

'কিন্তু, খবরদার, মেয়েমানুষ যদি কেঁদে ভাসিয়েও দেয়, বিশ্বাস করবিনে। ঘোমটা দিয়ে শিকনি ফেলতে-ফেলতে কান্না, ওতে ভুলিসনে।'

সংসারে থাকা মানেই সাবধানে থাকা।

'অসৎ লোক দেখলেই আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, হুঁকোটুকো আছে? আমি বলি আছে। তারপর মাতাল। তাকে রাগিয়ে দিলে, তোর চৌদ্দ পুরুষ, তোর হেন-তেন, বলে গালাগাল করবে। তাকে যদি বলি, কি খুড়ো কেমন আছ? তা হলে খুব খুশি হয়ে কত রকম গল্প করবে, তামাক খাবে।'

ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন?

'লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক-ঠিক জিনিস দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি। ওজনে কম দিলে কিনা দেখে নিবি। আবার যে সব

জিনিসের ফাউ পাওয়া যায়, সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবি না।'

কামড়াবিনে, কিন্তু ফোঁস করবিনে কেন? ফোঁস করবি।

'আবার গেরুয়া কেন?' গেরুয়াধারী সন্নেসীকে বললেন, 'একটা কি পরলেই হল? একজন বলেছিল চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী। আগে চণ্ডীর গান গাইতো এখন ঢাক বাজায়।'

আমার অহঙ্কার দূর করো। 'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' হাতের জলাঞ্জলি ফেলে দিয়ে রিক্ত করব হাত। ঐ রিক্ততাই আমার প্রতীক্ষা। সেই প্রতীক্ষার দীপটির নাম রামনামমণিদীপ। বাতাসে এ বাতি বাধা পায় না বরং জ্বলে। অহঙ্কারের বাতি নিবিয়ে এবার প্রেমের বাতি জ্বেলেছি। তাই আর নেববার নাম নেই। এবার দেখব কার বেশি জোর? তোমার ঔদাস্যের, না, আমার ঔৎসুক্যের? তোমার দাঁড়িয়ে থাকার, না, আমার বসে থাকার?

ভক্তের বর্ণনা দিচ্ছেন। 'ভক্তের ভিতর একটানা নয়। জোয়ার-ভাঁটা খেলে। হাসে কাঁদে নাচে গায়। কখনো ডোবে কখনো ওঠে কখনো সাঁতার কাটে। যেন জলের ভিতর বরফ টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর করে।'

এ কি শুধু রসিকতা? কথাশিল্প নয়?

নৈরাশ্যের রাশীকৃত মৃতপত্র উড়িয়ে দেবার মত নয় কি এ মর্মর-মুখর চঞ্চলবায়ু? অনাবৃষ্টির খরতাপের পর নয় কি এ শ্যামলবিমল স্নিগ্ধতা?

তারপর দেখ এবার ভাষার শক্তি :

'যে গরু বাছকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু গাব-গাব করে খায় সে হুড়-হুড় করে দুধ দেয়।' বুঝিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ : 'উত্তম ভক্ত হুড়-হুড় করে দুধ দেয়।' এই ভক্তিকেই আবার বলেছেন, 'উৎপেতে ভক্তি।'

মহিমাচরণ ফোড়ন দিল : 'তবে দুধে একটু গন্ধ হয়।'

'হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়।' রামকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে চলে গেলেন গভীরে। 'একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তা হলে আর গন্ধটা থাকবে না।'

ঈশ্বর দয়াময়। বলছিল কেউ-কেউ।

'কিসে দয়াময়?' জিগগেস করলেন রামকৃষ্ণ।

'কেন, তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, ধর্ম অর্থ সব দিচ্ছেন, আহার জোগাচ্ছেন।'

রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠলেন : 'যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খবর, তাদের খাওয়াবার ভার বাপে নেবে না তো কি বামুন-পাড়ার লোকে এসে নেবে?'

সে কি? ঈশ্বর কি তবে দয়াময় নন?

'তা কেন গো! ও একটা বললুম।' রামকৃষ্ণ এবার পরিহাসচ্ছলে অন্তরঙ্গ হলেন। 'তিনি যে বড় আপনার লোক। তাঁর উপর জোর চলে। আপনার লোককে এমন কথা পর্যন্ত বলা যায়, দিবি নারে শালা!'

একেই বলে ডাকাতে ভক্তি। শত্রুতাতে চিত্তবিনোদ। নিন্দা করে স্তব-স্তুতি। রুদ্ররূপে প্রসন্নতা!

তুমি আমার আপনার চেয়েও আপন এ কথাটি বুঝতে দাও। আমার যা কিছু আছে তাও তুমি, যা কিছু নেই তা-ও তুমি। যা পেয়েছি তোমাকেই পেয়েছি যা পাইনি তাও তোমাকেই পাওয়া। ইতি বা নেতি, সমস্ত কিছু তোমারই আবরণ, তোমারই আলিঙ্গন। ঢেউ হয়ে আছড়ে ফেলছ, আবার পালে বাতাস লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছ সেই ঢেউয়েরই উপর দিয়ে। যখন চলি তখনও তুমি আমার সঙ্গী। যখন থামি তখনও তুমি আমার সহচর। তুমি অনবরত আমাতে লেগে আছ। আমার কিছুতে মুক্তি নেই। বিনাশও নেই। তোমাতে আমার নিত্য প্রকাশ।

'মানুষগুলো দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারো ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারকেল-ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।' বলেই অপরূপ ছবি আঁকলেন। মহৎ কথাশিল্পীর নিপুণ তুলিকায়। 'সত্ত্বগুণ কিরকম জানো? বাড়িটি এখানে ভাঙা, ওখানে ভাঙা, মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগছে। উঠোনে শ্যাওলা পড়েছে, হুঁস নেই। আসবাবগুলো পুরোনো, ফিটফাট করবার চেষ্টা নেই। কাপড় যা তাই একখানা হলেই হল। হয়তো মশারির ভিতর ধ্যান করে। সবাই জানছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয়নি, তাই দেরি হচ্ছে উঠতে। শরীরের উপর আদর পেটচলা পর্যন্ত। শাকান্ন হলেই হল—'

আর রজোগুণের লক্ষণ—ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই-তিনটি আংটি।

বাড়ির আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোনো বড়মানুষের ছবি। নানা রকমের ভালো পোশাক, চাকরদেরও পোশাক। হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে, কিন্তু সেই মালার মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পরে পূজা করে।

আর যার ভক্তির তমঃ হয়, তার জ্বলন্ত বিশ্বাস। ঈশ্বরের কাছে জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। মারো কাটো বাঁধো। ডাকাতপড়া ভাব! কি! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ!'

সজীব ভাষায় উত্তপ্ত বর্ণনা। অথচ সহজ, প্রাণস্পর্শী।

মানুষকে কি অপরিসীম মর্যাদা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'আমি জানি যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, তেমন ডাকাতরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ! কি বলো গো? সকলেই নারায়ণ!'

কার কি আদ্যোপান্ত পরিচয় জানি! যে ডাকাত তার ডাকাতিটাই দেখি, হয়তো সে মাতৃভক্ত, দেখি না তার মাতৃভক্তি, হয়তো সে পরোপকারী দেখি না তার পরোপকার, হয়তো সে মহানুভব দেখি না তার মহানুভবতা! কত প্রলোভনের সঙ্গে নীরব সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল সে, তার খোঁজ রাখি না। তার এক মুহূর্তের স্খলনকেই দেখি বড় করে। স্খলনকেই শাসন করব, দমনকে প্রণাম করব না? সুতরাং, বিচার নয় স্বীকার। প্রত্যাহার নয় প্রতিস্থাপন!

কেউ অশ্রদ্ধেয় নয় কেউ অপাঙক্তেয় নয়—সবাইর মধ্যে ঈশ্বরসত্তা, উজ্জীবন ও উদ্ঘাটনের প্রতিশ্রুতি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সেই চির-মানব সেই মহামানবের অস্তিত্ব। দীপ আলাদা, শিখা এক, দীপের সীমাকে উল্লঙ্ঘন করেই তার দীপ্তি। মানুষের মধ্যে তিনিই মনুষ্যত্ব। মনের মাঝখানে তিনিই মনের মানুষ।

'মানুষ কি কম গা? ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে।' বললেন রামকৃষ্ণ।

অহংবুদ্ধির সংকীর্ণ সীমা থেকে চলে যেতে পারে বৃহতের উপলব্ধিতে। প্রাত্যহিকতার অভ্যাস থেকে ভূমার আনন্দলোকে। শাশ্বত সত্যের মত একটি চরম আনন্দের স্বীকৃতি যদি না থাকত সৃষ্টিতে, তবে প্রাণধারণের উত্তেজনা আসত কি করে?

'মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো।'

তবু মানুষ ভুলে আছে আত্মপরিচয়। নিজের কৌলীন্যগর্ব।

'মাথায় মানিক রয়েছে তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে।' কি সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ। অমৃতের পুত্র হয়ে পড়ে আছি অকিঞ্চিৎকর জীব-সীমায়। মুক্তি কোথায়? মানুষকে মুক্তি দিয়েই মানুষের মুক্তি।

আর সেই মুক্তি নিজেকে প্রকাশিত করে। নিজের মধ্যে সে মহত্তম সত্তাকে প্রমাণিত করে।

॥ ৬২ ॥

তুমি সব পথ হেঁটে-হেঁটে এসেছ। দীর্ঘ, জটিল, উপলবন্ধুর পথ। কিন্তু এসে উঠলে কোথায়? উঠলে এসে সংসারে। সমস্ত স্রোত ঠেলে সংসারই তোমার উত্তরণের ঘাট। এই সংসারের নিকেতনেই তোমার সাধনার ঘট।

তাই সংসারে যখন থাকি তখন তোমাকেই পাশে নিয়ে থাকি। থাকি তোমার প্রতিবেশিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে। তোমার হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই সংসারে স্বর্গরচনা করব, ক্ষণিকের খেলাঘরকে নিয়ে যাব অমৃতের নিত্যধামে। তুমি এস আমাদের মাঝখানে। আমাদের আধি-ব্যাধি জরামৃত্যু শোক-বিচ্ছেদের কারাবাসে। তুমি এস একটি শান্ত-শুভ্র মঙ্গলরশ্মির মত। প্রাণ-ঢালা প্রেম-ঢালা সরলতার মত। সমস্ত স্বার্থ আর ঔদ্ধত্য, ভীরুতা আর দারিদ্র্য মার্জিত হোক। দাও একটি অমোঘ সন্তোষ যা রাজৈশ্বর্যকেও ম্লান করে দেবে। দাও একটি অমূল্য দৃষ্টি যাতে ঘোরতর দুর্দিনেও দেখতে পারি তোমার প্রেমমুখের প্রসন্নতা। এই শরীর মন তোমার প্রসাদধারণের পবিত্র পাত্র করে তোলো। পূর্ণ করবার আগে শূন্য করে নাও। অনুরাগী করবার আগে নিঃসম্বল করো। তোমার উপস্থিতির অবিরাম আনন্দ আমার সমস্ত অস্তিত্বে সঞ্চারিত হোক। তোমার স্পর্শে আমরাও কবি হব, প্রীতিতে মৈত্রীতে প্রসারিত হব সর্বভূতে, আপনার মাঝে নিহিত ও সমাহিত যে পরমাত্মা, তাকে প্রকাশিত করব অস্তিত্বের অবারিত আনন্দে।

এই প্রকাশের মন্ত্রটি প্রেম। আর এই প্রেমই মহাকবির শাশ্বত কাব্য। মনের মাধুর্য প্রাণের আরাম আত্মার প্রশান্তি॥

আপনার 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' জনসাধারণকে গভীরভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনার লেখার নিপুণতা ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি বাংলার জনসাধারণের আগ্রহকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার 'শরৎস্মৃতি' বক্তৃতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রতি সকলকে যেরূপ আকৃষ্ট করিয়াছে তাহা সত্যই অতুলনীয়। ঠাকুর যথার্থই তাঁহার ভাবপ্রচারের জন্য আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন।...**স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতা ২৬**

তোমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরই সাহায্য করিতেছেন নতুবা লেখনী হইতে এমন অমৃতধারা নিঃসৃত হইত না। তোমার 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বইয়ের দুইটি ভাগ আমি বহুবার পড়িয়াছি এবং পড়িব। তুমি অমৃতবর্ষণ করিতেছ। আমি খুব কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়িয়াছি, কোনও ঘটনা তোমার স্বকপোল-কল্পিত নহে। সবই পূর্বে নানা গ্রন্থে ও মাসিকপত্রিকায় প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি ঘটনা ও কথাবার্তা বেশ সাজাইয়া লিখিয়াছ। ভাষা অপূর্ব। তুমি যে অমৃত পরিবেশন করিতেছ তাহাতে তুমি অমরত্ব অর্জন করিবে। সরল প্রাণে ভক্তিপ্রেমের দান বৃথা যায় না।...**কুমুদবন্ধু সেন, ১ ডোভার লেন, কলকাতা**

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' পড়ে ভারি চমৎকার লাগলো। পড়তে পড়তে মনের মধ্যে ঠাকুরের দিব্যজীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি সব যেন দেখতে পেলুম। মনে হল চোখের সামনেই সব ঘটছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র বিশেষ কৃপা না হলে এটি সম্ভব হত না। এই বই রচনায় মনশ্চক্ষে কল্পনায় যা দেখলেন বাস্তবজীবনে আপনার কাছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির অপার্থিব জ্যোতিঃপ্রকাশে সে সব রূপায়িত হয়ে উঠুক।...**স্বামী বেদানন্দ, ১৯বি রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা**

এইমাত্র 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' পাঠ করা শেষ করিলাম। শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণের সেবা অন্য দশজনের মত শুধু ফুলে শুধু জলে এমন কি নন্দন-কাননজাত পারিজাত দ্বারা আপনি শেষ করেন নাই। আপনার পূজার উপচার লৌকিক নয়। আপনি তন্ত্রের মন্ত্র দ্বারা পূজা করেন নাই সত্য কিন্তু 'মন তোর' দ্বারা যে পূজা করিয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব। এখানে থাকিয়া পত্রিকার মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া অনেক বই কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি কিন্তু এবার জিতিয়াছি।...**হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী, জামালপুর, মৈমনসিংহ**

বিজ্ঞানের ছাত্র আমি। চিত্ত শুষ্ক। ভক্তি কাকে বলে জানি না তবু আপনার অন্তরের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আমারও মনে যেন সংক্রামিত হল। আপনার শুধু ভক্তি আছে তা নয় আপনার অনুভূতি আছে।...**প্রমোদরঞ্জন গুপ্ত, হুগলী কলেজ, চুঁচুড়া**

সাহিত্যিক খ্যাতি তরুণ বয়েসেই আপনি লাভ করিয়াছেন, আপনার অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু বর্তমানে ভক্ত সাহিত্যিক-রূপে যে খ্যাতিলাভ আপনার ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাহার তুলনা নাই। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আপনার 'পরম পুরুষের' কথা ও তাহার প্রশংসায় লোক শতমুখ। আপনার সাহিত্যসাধনা সার্থক হইয়াছে।...**নরেন্দ্রনাথ বসু, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা**

নমস্কার। 'পরমপুরুষ'-এর মুগ্ধ অভিভূত পাঠক হিসাবে অতলান্তিকের পূর্ব উপকূলের এক সহর হইতে বন্ধুর অভিনন্দন গ্রহণ করুন। সাহিত্যিকের সোনার কাঠি দিয়া কত মনে দোলা দিবার ক্ষমতা ও জাগরণীর শক্তি আপনি আনিলেন। কয়েক মাস পূর্বে যখন ভারতবর্ষ ছাড়ি তখনও বই প্রকাশিত হয় নাই। গত সপ্তাহে আমার স্ত্রী কন্যা এখানে আসিবার সময় আপনার বই নিয়া আসিয়াছে।...**বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনরোভিয়া, লাইবেরিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা**

আপনার 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের' সমাদর আমাদের ঈর্ষার বস্তু হয়েছে। এত ভালো লেখা আর এতো তার চাহিদা! আপনি বাস্তবিক যাদুকর। সেই তো বাংলা ভাষা আর শব্দ। কিন্তু কী চমৎকার পরিবেশন-ক্ষমতা আপনার, কি সুন্দরই না চিরপুরাতন বাংলা শব্দের নতুন ব্যবহার হলো আপনার হাতে। পড়ি আর মুগ্ধ হই। এতো ভালো, বিশ্বাস হয় না।...**কাজি আফসারউদ্দীন আহমদ, রমনা, ঢাকা**

আপনার 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' আদ্যোপান্ত বহুবার পড়িয়াছি। এখনও দৈনিক প্রায়ই পড়িয়া থাকি। বইখানি পড়িয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। বলিতে কি ইহা আমার জীবনসন্ধ্যায় একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।...**বিশ্বনাথ গুহ রায়, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা**

আপনার 'পরমপুরুষ' থেকে খানিকটা সেদিন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়কে পড়ে শোনাচ্ছিলাম। খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, 'অচিন্ত্যবাবু পঞ্চাশ পেরিয়েছেন নিশ্চয়ই, না হলে এমন হৃদয়ঙ্গম হয় না। আর হৃদয়ঙ্গম না হলে এমন জিনিস কলম দিয়ে বেরুতে পারে না।' সত্যি বয়স আপনার যাই হক, এই বই লেখার পর আপনার বনে না গিয়ে উপায় নেই। ...**রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া**

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি খণ্ডের দাম ৪৲